সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

নিবন্ধ

সম্পাদকীয়

ফতোয়া: একটি তাত্ত্বিক নিবন্ধ

প্রসঙ্গ ফতোয়া: সুশীল সমাজ ও মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া

ফতোয়া

ঈমান-আকীদা

১. কি কি বিষয়ে ঈমান আনা আবশ্যক?
২. ঈমান বিধ্বংসী আকীদা-বিশ্বাস ও আমলগুলো কি কি?
৩. বিদ'আতের কোনো প্রকার আছে কি? থাকলে তা কী কী?
৪. বিদ'আতের শ্রেণী বিন্যাস গ্রহণযোগ্য কি না?
৫. প্রচলিত মিলাদের সূচনা কবে হয়েছে এবং তাতে কিয়াম করার হুকুম কী?
৬. প্রচলিত গায়ে হলুদের বিধান কি?
৭. যদি কোনো শিয়া বা হিন্দু বিসমিল্লাহ বলে পশু জবাই করে তাহলে তার হুকুম কি?
৮. বুযুর্গানে দীনের উসিলা দিয়ে দু'আ করার বিধান কী?
৯. হাদীসে বর্ণিত কোনো জামে' দু'আ আছে কি না?
১০. পদচুম্বন সংক্রান্ত গ্রহণযোগ্য শরঈ বিধান কি?
১১. কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণের বিধান কি?
১২. মৃত ব্যক্তির বাড়িতে আয়োজিত ভোজ সভায় অংশগ্রহণের বিধান কি?
১৩. মসজিদে সমবেত স্বরে জিকির করার বিধান কি?
১৪. খতমে খাজেগানা পাঠের বিধান কি?
১৫. আযানের আগে দুরূদ পাঠের বিধান কি?

পবিত্রতা

১৬. শরীয়তের বিধি নিষেধের শ্রেণী বিন্যাস কি?
১৭. অপবিত্রতা কত প্রকার ও কি কি?
১৮. শরীর বা কাপড়ে লেগে থাকা নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপায় কি?
১৯. নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীতে নাপাকি লাগলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি কি?
২০. উঠোন বা ফ্লোরে নাপাকি লাগলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি কি?
২১. খাদ্যদ্রব্য পবিত্র করার পদ্ধতি কি?

২২. হাউজ বা ট্যাঙ্কিতে নাপাকি পড়লে তা পবিত্র করার পদ্ধতি কি?
২৩. নলকূপে নাপাকি পড়লে তা পবিত্র করার পদ্ধতি কি?
২৪. ওযু কত প্রকার ও কি কি?
২৫. ওযুর ফরজগুলো কি ?
২৬. ওযুর সুন্নতগুলো কি?
২৭. ওযুর মুস্তাহাবগুলো কি?
২৮. কি কি কারণে ওযু মাকরুহ হয়?
২৯. কি কি কারণে ওযু ভেঙ্গে যায়?
৩০. গোসল কত প্রকার ও কি কি?
৩১. গোসলের ফরজগুলো কি?
৩২. গোসলের সুন্নতগুলো কি?
৩৩. গোসলের মুস্তাহাবগুলো কি?
৩৪. গোসলের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মাকরুহ?
৩৫. গোসল ফরজ হওয়ার কারণগুলো কি?
৩৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ফরজ গোসল সম্পন্ন করতেন?
৩৭. কি কি কারণে তায়াম্মুম করা যায়?
৩৮. তায়াম্মুমের আবশ্যকীয় শর্তগুলো কি?
৩৯. তায়াম্মুমের ফরজগুলো কি?
৪০. তায়াম্মুমের সুন্নতগুলো কি?
৪১. কি কি পদার্থ দ্বারা তায়াম্মুম করা যায়?
৪২. কি কি কারণে তায়াম্মুম মাকরুহ হয়ে যায়?
৪৩. কি কি কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়?
৪৪. হায়জের সংজ্ঞা ও বিস্তারিত বিধান কি?
৪৫. ইস্তেহাযার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং বিধান কি?
৪৬. নেফাসের সংজ্ঞা ও বিস্তারিত বিধান কি?
৪৭. মসজিদে প্রবেশ, কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে ঋতুমতি ও প্রসূতি নারীদের বিধান কি?
৪৮. মোজা কত প্রকার ও তার বিধান কি?
৪৯. মোজা মাসেহের শর্তগুলো কি?
৫০. মোজা মাসেহের ফরজগুলো কি?
৫১. মোজা মাসেহের সুন্নতগুলো কি?
৫২. মাসাহ ভঙ্গের কারণগুলো কি?
৫৩. মোজা মাসেহের সময় সীমা কি?
৫৪. মাসেহের পদ্ধতি কি?

৫৫. গোসলের পর কি আবার ওযুর প্রয়োজন রয়েছে?
৫৬. রোজা অবস্থায় রক্ত দেখার পর আর সে মাসে রক্ত না এলে তার বিধান কি?
৫৭. সিজারের পর প্রবাহিত রক্ত নিফাস কি না?
৫৮. পাক কাপড় ধৌত করা পানির বিধান কি?
৫৯. বালতিতে পতিত ওযুর পানি বাথরুমের কমোডে ফেলা যাবে কি না?
৬০. বাথরুমে ওযুর ক্ষেত্রে ওযুর দু'আ পড়া যাবে কি না?
৬১. সর্দির কারণে নাক দিয়ে জমাট রক্ত বের হলে ওযু ভেঙ্গে যাবে কি না?
৬২. কেরোসিন তেল, মোবিল, আলকাতরা ইত্যাদি পাক কি না?
৬৩. মহিলাদের জন্য মিসওয়াক করার বিধান কি?
৬৪. পেশাবের পর ঢিলা বা টিস্যু ব্যবহার না করে শুধু পানি ব্যবহার করার বিধান কি?
৬৫. ফরজ গোসল ব্যতীত অন্য গোসলের পূর্বে ওযু করা সুন্নত কি না?
৬৬. প্লাষ্টিকের পাত্রে তরল নাপাকি লাগলে তা পবিত্র করার বিধান কি?
৬৭. মহিলাদের হায়জ অবস্থায় তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি পাঠ করার বিধান কি?
৬৮. যমযমের পানি দ্বারা ওযু ইস্তেঞ্জা করার বিধান কি?
৬৯. শরীরের কোনো অংশে সাদা কালি লাগলে ওযু হবে কি না?
৭০. ওযুতে গর্দান মাসাহ করার বিধান কি?
৭১. ফরজ গোসল করার সময় ছিটকে পড়া পানির বিধান কি?
৭২. নাপাক কাপড় ধৌত করার সময় কাপড় থেকে ছিটকে পড়া পানির বিধান কি?
৭৩. কাপড়ে নাপাকি লাগার স্থান নির্দিষ্ট করা না গেলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি কি?
৭৪. ওযু করার পর অঙ্গসমূহ মোছার ব্যাপারে সুন্নাত পদ্ধতি কি?
৭৫. এক দুই মাস গর্ভ স্থির থাকার পর গর্ভপাতোত্তর রক্তের বিধান কি?

আযান

৭৬. আযানের সুন্নতগুলো কি?
৭৭. ইকামাতের সুন্নতগুলো কি?
৭৮. আযানের শর্তগুলো কি?
৭৯. ইকামতের শর্তগুলো কি?
৮০. আযান ইকামাতের মুস্তাহাব বিষয়গুলো কি?
৮১. আযান ইকামাতের জবাব দেয়ার বিধান কি?
৮২. মসজিদে আযান দিয়ে অন্যত্র গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের বিধান কি?
৮৩. চার দিক থেকে আযানের শব্দ ভেসে এলে কোন আযানের জবাব দিবে?
৮৪. ইকামত শুরু হলে ইমাম ও মুক্তাদি কখন দাঁড়াবে?

৮৫. কুরআন হাদীসের ক্লাস অথবা কুরআন তিলাওয়াতকালীন আযান শুরু হলে জবাব দেয়ার বিধান কি?
৮৬. মহিলাদের জন্য আযানের জবাব দেয়া জরুরী কি না?
৮৭. অশুদ্ধ কিংবা অস্পষ্ট আযান দেয়া হলে পুনরায় আযান দেয়া জরুরী কি না?
৮৮. নবজাতকের কানে আযান ইকামাতের বিধান এবং পদ্ধতি কি?
৮৯. اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك হাদীসে বর্ণিত এ দু'আটি পড়ার সময় কখন?
৯০. মুয়াযযিন যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলে তখন এর জবাবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা যাবে কি না?
৯১. জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব দেয়া যাবে কি না?

নামায

৯২. মসজিদে প্রবেশকালীন সুন্নতগুলো কি?
৯৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় সুন্নতগুলো কি?
৯৪. নামাজের ফরজ কয়টি ও কি কি?
৯৫. নামাজের ওয়াজিব কয়টি ও কি কি?
৯৬. নামাজে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কয়টি সুন্নত?
৯৭. নামাজে কিরাতের ক্ষেত্রে কয়টি সুন্নত?
৯৮. নামাজে রুকুর ক্ষেত্রে কয়টি সুন্নত?
৯৯. নামাজে সিজদার ক্ষেত্রে কয়টি সুন্নত?
১০০. নামাজে বসার ক্ষেত্রে কয়টি সুন্নত ও কি কি?
১০১. নামাজ আদায়ের পরিপূর্ণ পদ্ধতি কি?
১০২. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ফরজ সময় কি কি?
১০৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মুস্তাহাব সময় কি?
১০৪. নামাজের হারাম সময় কি?
১০৫. নামাজের মাকরুহ সময় কি?
১০৬. নামাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণগুলো কি?
১০৭. নামাজের মাকরুহ বিষয়গুলো কি?
১০৮. জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব কতটুকু?
১০৯. জামাত পরিত্যাগের গ্রহণযোগ্য ওজরগুলো কি?
১১০. হাদীসের আলোকে বিতর নামাজ আদায়ের সুন্নাহ পদ্ধতি কি?
১১১. অন্তরে এক নামাজের নিয়ত আর মুখে অন্য নামাজের নিয়ত করলে কোন নামাজ আদায় হবে?
১১২. তাহাজ্জুদের সময় বিতর পড়ার নিয়তে ঘুমিয়ে পড়ার পর সময়মত উঠতে না পারলে কিভাবে বিতর আদায় করবে?
১১৩. শুধু মহিলাদের নিয়ে তারাবীহের জামাত করার বিধান কি?

১১৪. ঈশা এবং বিতির পড়ার পর ঈশার নামাজ হয় নি বলে জানতে পারলে বিতরও কি পুনরায় পড়তে হবে?
১১৫. ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব তরক করলে এনামাজের বিধান কি?
১১৬. ইমামের পূর্বে সালাম ফিরিয়ে দেয়া হলে সে নামাজের বিধান কি?
১১৭. সেজদায়ে তিলাওয়াত করে উঠে ভুলে সূরায়ে ফাতেহা পড়ে ফেললে এনামাজের বিধান কি?
১১৮. সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার পর তা আদায় করতে ভুলে গেলে করণীয় কি?
১১৯. মাটিতে কপাল ও নাক না রেখে সেজদা করার বিধান কি?
১২০. কানটুপি পরিধান করার কারণে কপাল আবৃত থাকা অবস্থায় সেজদা করলে সেজদা হবে কি না?
১২১. মাসবুক তার প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতে ইমামের সাথে বৈঠককালে তাশাহহুদ পাঠ করবে কি না?
১২২. চার রাকাত নফলের নিয়ত করে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিলে বাকি দুই রাকাত কাযা করতে হবে কি না?
১২৩. চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে প্রথম বৈঠক ছুটে গেলে সে নামাজের বিধান কি?
১২৪. চার রাকাত বিশিষ্ট সুন্নত নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা ইখলাস পড়ে ফেললে বাকি রাকাতগুলোতে কি কি সূরা পড়বে?
১২৫. কিয়ামুল লাইল নামাজ দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম না বসে পড়া উত্তম?
১২৬. স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে মসজিদমুখী রাস্তা থেকে কাতার শুরু হলে ইকতিদা সহীহ হবে কি না?
১২৭. আলোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অন্ধকারে নামাজ আদায়ের বিধান কি?
১২৮. এক পায়ের উপর ভর করে নামাজ আদায়ের বিধান কি?
১২৯. অপবিত্র অবস্থায় নামাজ পড়া কিংবা কুরআন তিলাওয়াতের বিধান কি?
১৩০. নামাজে কিরাতের প্রথম তিন আয়াতে কিরাত ভুলে গেলে কিংবা জড়িয়ে গেলে অন্য সূরা শুরু করার বিধান কি?
১৩১. মাদরাসা থেকে ৪৮ মাইল তথা ৭৮ কি.মি. এর চেয়ে কম দূরত্বে তাবলীগে গেলে সেখানে কসর করা হবে কি না?
১৩২. সুদ গ্রহণকারী ইমামের পেছনে নামাজের বিধান কি?
১৩৩. নামাজের ভিতরে বাম হাত ছেড়ে দিয়ে কোনো কাজ করা যাবে কি না?
১৩৪. নামাজরত অবস্থায় মাথা থেকে টুপি পড়ে গেলে করণীয় কি?
১৩৫. নামাজরত অবস্থায় পরিধেয় লুঙ্গি খুলে গেলে করণীয় কি?
১৩৬. মাসবুক ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে দিলে তার নামাজের বিধান কি?
১৩৭. কয়েক বছরের কাযা নামাজ আদায়ের পদ্ধতি কি?

১৩৮. নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার প্রয়োজন হলে কতটুকু দূর দিয়ে অতিক্রম করবে?
১৩৯. নামাজরত ব্যক্তির সামনে বসে থাকা ব্যক্তি সেখান থেকে সরে যেতে পারবে কি না?
১৪০. শেষ বৈঠকে সালাম না ফিরিয়ে সুন্নতসহ ছয় রাকাত পড়ে সহু সেজদা দেয়া হলে এনামাজের বিধান কি হবে?
১৪১. জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নতে প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় ইকামাত শুরু হয়ে গেলে করণীয় কি?
১৪২. সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার পর সিজদায়ে সাহু না করে ভুলে সালাম ফিরিয়ে দিলে করণীয় কি?
১৪৩. কখন ইকতিদা করলে তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সওয়াব পাওয়া যাবে?
১৪৪. মাদরাসার হলরুম পাঞ্জেগানা নামাজের জন্য ব্যবহৃত হলে তা মসজিদ বলে গণ্য হবে কি না?
১৪৫. মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করার বিধান কি?
১৪৬. জীব জন্তুর ছবি বিশিষ্ট মুদ্রা সাথে রাখা বা তা নিয়ে নামাজ আদায় করার বিধান কি?
১৪৭. শুদ্ধ তিলাওয়াতে অক্ষম ইমামের পেছনে শুদ্ধ তিলাওয়াতে সক্ষম মুক্তাদি দাঁড়ালে সকলের নামাজ কি নষ্ট হয়ে যাবে?
১৪৮. ইমামের জন্য পাগড়ি পরিধান করে নামাজ পড়ানোর বিধান কি?
১৪৯. চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে তিন রাকাত পড়ে ভুলে সালাম ফিরিয়ে দিলে সে নামাজের হুকুম কি হবে?
১৫০. একই সূরা একাধিক রাকাতে তিলাওয়াতের বিধান কি?
১৫১. তিন বা চার রাকাত নামাজে প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে গিয়ে পরক্ষণেই আবার বসে পড়লে এনামাজের বিধান কি হবে?
১৫২. জুমু'আর নামাজে শেষ বৈঠক পেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর জুমু'আর দু রাকাত পড়বে না যোহর নামাজ পড়বে?
১৫৩. মাঝে মাঝে নামাজ পরিত্যাগ করে কিন্তু কিরাত শুদ্ধ-এমন ব্যক্তির পেছনে নামাজ পড়ার বিধান কি?
১৫৪. কুরআন স্পর্শ করার জন্য ওযু করলে সে ওযু দ্বারা নামাজ আদায় করা যাবে কি না?
১৫৫. ইমাম এবং মহিলা মুক্তাদির মাঝে অন্তরায় থাকাবস্থায় শুধু ইমাম চকিতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে এনামাজের বিধান কি হবে?
১৫৬. প্রথম রাকাতে ভুলে বৈঠক করে আবার দাঁড়িয়ে সাহু সেজদার মাধ্যমে দু রাকাত শেষ করা হলে সে নামাজের বিধান কি?

১৫৭. তাকবীরে তাহরিমার সময় হাতের আঙ্গুল এবং তালু কিভাবে রাখতে হবে?
১৫৮. সালাতুত তাসবীহের মধ্যে তাসবীহ কম বেশি হয়ে গেলে করণীয় কি?
১৫৯. ফরজ নামাজের পর মাসনুন দু'আ, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি সুন্নতের পূর্বে পড়া উত্তম না কি সুন্নতের পরে পড়া উত্তম?
১৬০. তাশাহহুদ পড়ার ক্ষেত্রে যদি দু একটি শব্দ ছুটে যায় তাহলে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?
১৬১. সালাতুত তাসবীহ জামাতের সাথে আদায় করার বিধান কি?
১৬২. ফরজের তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকাতে সূরা মিলালে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?
১৬৩. নামাজরত অবস্থায় রাকাত সংখ্যা ভুলে গেলে করণীয় কি?
১৬৪. পাখির কণ্ঠে সেজদার আয়াত শুনলে সেজদা ওয়াজিব হবে কি না?
১৬৫. প্রথম দু রাকাতের কোনো রাকাতে সূরা ফাতিহা একাধিকবার তিলাওয়াত করা হলে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?
১৬৬. চলন্ত ট্রেনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া কিংবা কেবলা পরিবর্তন করা সম্ভব না হলে কিভাবে নামাজ আদায় করবে?
১৬৭. এক মুষ্টির চেয়ে কম দাড়ি বিশিষ্ট ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করার বিধান কি?
১৬৮. সহ শিক্ষা চালু আছে এমন স্কুলের শিক্ষকের পেছনে নামাজ পড়ার বিধান কি?
১৬৯. চোখ বন্ধ করে নামাজ আদায়ের বিধান কি?

সিজদায়ে তিলাওয়াত

১৭০. নাবালেগের সেজদায়ে তিলাওয়াতের বিধান কি?
১৭১. নামাজে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সাথে সাথে সিজদা না করে এক পৃষ্ঠা পড়ার পর সেজদা করার বিধান কি?
১৭২. রুকু সেজদার ভিতরে সেজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করার বিধান কি?
১৭৩. সেজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য দাঁড়ানো জরুরী কি না?

তারাবীহ নামাজ

১৭৪. দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক না করে এক সালামে চার রাকাত তারাবীহ পড়ার বিধান কি?
১৭৫. ঈশার সুন্নত পড়ার পূর্বেই যদি তারাবীহ শুরু হয়ে যায় তাহলে সুন্নত পড়বে না তারাবীহতে শরীক হবে?
১৭৬. নফল নামাজে জামাত করার বিধান কি?

মুসাফিরের নামাজ

১৭৭. ৭৮ কি. মি. দূরবর্তী কোনো এলাকায় গিয়ে স্থানীয় লোকদের নিয়ে চার রাকাত নামাজ আদায় করলে সকলের কি বিধান?
১৭৮. মাদরাসায় পড়া অবস্থায় মাঝে মাঝে বাড়িতে গেলে সেখানে কসর পড়তে হবে কি না?
১৭৯. চাকুরীজীবিগণ নিজ নিজ কর্মস্থলে পরিবার নিয়ে বসবাস করলে কর্মস্থল তাদের ওয়াতনে আসলী হয়ে যাবে কি না?
১৮০. মাদরাসা ছাত্রদের জন্য ওয়াতনে আসলী কি না?
১৮১. পনের দিনের বেশি থাকার নিয়ত করে ৭৮ কি. মি. দূরত্বে সফর করলে সফররত অবস্থায় কসর করতে পারবে কি না?
১৮২. মাদরাসা ছুটি অবস্থায় কোনো ছাত্র মাদরাসায় এসে তিন দিন থেকে চলে গেলে সে এতিন দিন মুকিম হবে না মুসাফির?
১৮৩. একই এলাকায় একেক মসজিদে ১৫ দিনের বেশি সময় কাটিয়ে দেয়া হলে কি কসর করা যাবে?
১৮৪. বাস নামাজের সময় না থামালে যাত্রীদের ওযু থাকা না থাকা উভয় অবস্থায় করণীয় কি?
১৮৫. মুসাফিরের উপর সফরের হুকুম কখন থেকে প্রযোজ্য হবে?
১৮৬. মুসাফির ইমাম যদি মুকিম মুক্তাদীদের নিয়ে চার রাকাত পূর্ণ করে ফেলে তবে সে নামাজের বিধান কি?
১৮৭. বাস বা ট্রেনে সফররত অবস্থায় নামাজের সময় হয়ে গেলে গাড়িতে বসে নামাজ আদায় করতে পারবে কি না?
১৮৮. ট্রেনে সফররত অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া সম্ভব না হলে পরবর্তীতে তা কাযা করতে হবে কি না?

জুমু'আ ও ঈদ

১৮৯. কি কি শর্ত সাপেক্ষে জুমু'আর নামাজ ওয়াজিব হয়?
১৯০. কি কি শর্ত পাওয়া গেলে জুমু'আ শুদ্ধ হবে?
১৯১. খতুবা চলাকালীন শ্রোতাদের করণীয় কি?
১৯২. জুমু'আর খুতবা আরবী ভাষায় দেয়া জরুরী কি না?
১৯৩. ঈদের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি কি শর্ত প্রযোজ্য?
১৯৪. ঈদের নামাজ আদায়ের সুন্নাহ পদ্ধতি কি?
১৯৫. ঈদের নামাজের খুতবার বিধান কি?
১৯৬. যদি এক ব্যক্তি জুমু'আর খুতবা পাঠ করে আর অপর ব্যক্তি নামাজ পড়ায় তাহলে তা জায়েজ আছে কি না?
১৯৭. জুমু'আর পূর্বে বাংলায় খুতবা পাঠ করে জুমু'আর নামাজ আদায় করলে এ নামাজ পুনরায় পড়তে হবে কি না?

১৯৮. খুতবার ভিতরে আংশিক হলেও অন্য ভাষা ব্যবহারের সুযোগ আছে কি না?
১৯৯. কেউ ঈদের এক রাকাত না পেলে সে উক্ত নামাজ কিভাবে আদায় করবে?
২০০. ঈদ ও বিবাহের খুতবা শ্রবণের বিধান কি?
২০১. আইয়ামে তাশরীক কয় দিন ও কোন কোন দিন?
২০২. খুতবার সময় হাতে লাঠি রাখার বিধান কি?
২০৩. কোনো ওযরবশত বসে খুতবা পাঠের সুযোগ আছে কি না?
২০৪. খুতবার মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম এসে গেলে দুরূদ পাঠ করতে হবে কি না?
২০৫. জুমু'আর নামাজের পর সুন্নতে মুয়াক্কাদা কয় রাকাত?
২০৬. ঈদের জামাত না পেলে একাকী ঐ নামাজ পড়তে পারবে কি না?
২০৭. জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আর নামাজ পড়বে নাকি যোহরের নামাজ পড়বে?
২০৮. কোনো মহিলা মসজিদে গিয়ে জুম'আ আদায় করলে তাকে কি যোহরের নামাজ পড়তে হবে?
২০৯. জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররাম এর বর্তমান খতীব মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেবের পেছনে নামাজ পড়ার বিধান কি?
২১০. বর্তমানে খুতবার পূর্বে যে বয়ান করা হয় তার বিধান কি?

জানাযা

২১১. মৃত মহিলাকে কাফন পরানোর পর খাটিয়ায় রেখে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া না দেয়ার বিধান কি?
২১২. কোনো কারণে বক্সে লাশ দাফন করার সুযোগ আছে কি না?
২১৩. গোসল দেয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির নিকটে বসে কুরআন তিলাওয়াতের বিধান কি?
২১৪. কোনো কারণবশত জানাজা না পড়িয়ে মাইয়িতকে দাফন করা হলে কবরের উপর জানাযা পড়া যাবে কি না?
২১৫. পুরাতন কবরে মাটি দেওয়া জায়েয আছে কি না?
২১৬. কবরের চারপাশে দেওয়াল তৈরি করার বিধান কী?
২১৭. পোস্ট মর্টেমের জন্য কবর থেকে লাশ উত্তোলন করার বিধান কী?
২১৮. মৃত ব্যক্তিকে দেখার বিধান কী?
২১৯. মাইয়্যেতকে কবরস্থ করার পর অদূরে দাঁড়িয়ে দু'আ করার বিধান কি?
২২০. যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তারা কি শরীয়তের দৃষ্টিতে শহিদ বলে গণ্য হবেন?
২২১. শহীদের ক্ষেত্রে বান্দার হক্বও কি মাফ হয়ে যায়?
২২২. মৃত ব্যক্তির নখ বা চুল কাটার বিধান কী?
২২৩. মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম করতে গিয়ে তার বাড়ির কোনো কিছু খাওয়া বা পান করা জায়েয আছে কি না?

২২৪. কোনো হিজড়া মারা গেলে তার জানাযার নামায পড়ার বিধান কি? জানাযা নামায পড়তে হলে কী দু'আ পড়বে?
২২৫. মৃত ব্যক্তিকে বরই পাতার পানি দ্বারা গোসল দেওয়ার তাৎপর্য কী?
২২৬. জানাযা নামাযে এক কাতার অপর কাতারের সাথে মিলে মিলে দাঁড়াবে না কি উভয় কাতারের মাঝে পরিমাণমত ফাঁকা রাখতে হবে?
২২৭. জানাযার নামাযের কাতার বেজোড় হওয়া জরুরি কি না? এবং বেজোড় হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ফযীলত আছে কি না?
২২৮. মৃত ব্যক্তির খাট ঢেকে দেয়ার চাদরে কালিমা বা কুরআনের আয়াত ইত্যাদি লেখার বিধান কী?
২২৯. জানাযার সাথে কবরস্থানে যাতায়াতকালে উচ্চস্বরে তাকবীর বা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে পারবে কি না?
২৩০. জানাযার নামাজে দু এক তাকবীর চলে যাওয়ার পর উপস্থিত হলে কখন নামাজে শরীক হবে?
২৩১. শোক পালনার্থে সাময়িক নীরবতা পালনের বিধান কি?
২৩২. জানাজা নামাজের ইমাম হওয়ার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ওয়াসিয়ত পালন করা জরুরী কি না?
২৩৩. মসজিদে জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে কি না?
২৩৪. যদি কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তাহলে তার জানাযার নামায পড়া যাবে কি না?
২৩৫. নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরের অনেক লাশ একত্রে উপস্থিত হলে জানাযা নামায কীভাবে আদায় করতে হবে?
২৩৬. কবরস্থানে যাওয়ার সময় লাশ বহনকারী ব্যক্তিদের উঁচু আওয়াজে কালিমা বা কুরআন তিলাওয়াতের বিধান কি?
২৩৭. গায়েবানা জানাযা নামায পড়ার বিধান কী?
২৩৮. বিশেষ সংখ্যার সূরা পাঠ করে দু'আ করার ব্যাপারে মৃত ব্যক্তির করা ওয়াসিয়ত কার্যকর করা জরুরী কি না?
২৩৯. মৃত ব্যক্তির বাড়িতে খানা পাঠানোর হুকুম কী?
২৪০. মৃত্যু সংবাদ প্রচারের জন্য মাইকিং করার বিধান কি?
২৪১. জানাযা নামাযের সালাম ফিরানোর পর হাত উঠিয়ে দু'আ করার বিধান কী?

কবর

২৪২. কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার হুকুম কি?
২৪৩. কোনো মহিলা মারা গেলে তার স্বামী তাকে কবরে রাখতে পারবে কি না?
২৪৪. মহিলারা কি কবর যিয়ারত করতে পারবে?
২৪৫. জন্ম দাতা পিতাকে হত্যাকারী ছেলের জনাযা পড়া যাবে কি না?

২৪৬. কবরস্থানের পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দু'আ করার বিধান কি?

রোজা

২৪৭. রোজা কত প্রকার ও কি কি প্রত্যেক প্রকারের বিধান কি?
২৪৮. কি কি কারণে রোজা ভেঙ্গে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয়?
২৪৯. কি কি কারণে রোজা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়?
২৫০. কি কি কারণে রোজা মাকরূহ হয়ে যায়?
২৫১. রোজার কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি কি?
২৫২. রোজার ফিদয়ার বিধান এবং পরিমাণ কি?
২৫৩. শাওয়ালের বিশেষ ছয় রোযার মধ্যে কাযা রোযার নিয়ত করা হলে উভয়টি আদায় হবে কি না?
২৫৪. রমাযান মাসে শিশু সন্তানকে দুগ্ধ দানকারিণী মহিলার জন্য রমাযানের রোযা রাখা জায়েয হবে কি না?
২৫৫. রমাযান মাসের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফের হুকুম কী?
২৫৬. রোযা রাখা অবস্থায় রক্ত গ্রহণ করলে কি রোযা ভেঙে যাবে?
২৫৭. রমাযান মাসে যে মহিলার রোযা রাখা নিষিদ্ধ সে মহিলা কি পানাহার করতে পারবে?
২৫৮. গোসল ফরয অবস্থায় সাহরী খাওয়ার হুকুম কী?
২৫৯. যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসের কারণে রোযা ভাঙ্গার বিষয়টি না জেনে স্ত্রী সহবাস করে ফেলে তাহলে তার বিধান কি?
২৬০. অসুস্থতার কারণে রোজা রাখতে অক্ষম হয়ে মারা গেলে তার ছুটে যাওয়া রোজার ফিদয়া দেয়া ওয়াজিব কি না?
২৬১. কোনো অমুসলিম রমাযান মাসে যোহরের পর মুসলমান হলে তার ঐদিনের রোজা কাযা করতে হবে কি না?
২৬২. ফিদয়া কখন কিভাবে দিতে হয় এবং এর পরিমাণ কত?
২৬৩. রমাযান মাসে রোযা রাখার নিয়তে সাহরী খেয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ওযর ছাড়াই রোজা না রাখলে তার হুকুম কি?

ই'তিকাফ

২৬৪. ই'তিকাফ কি ও কত প্রকার এবং এর জন্য কি কি শর্ত প্রযোজ্য?
২৬৫. কি কারণে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যায়?
২৬৬. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হয়ে কোনো কথাবার্তা বললে ই'তিকাফের কোনো ক্ষতি হবে কি না?
২৬৭. রোযাবিহীন ই'তিকাফ করা ও মসজিদে থাকা খাওয়ার হুকুম কি?
২৬৮. ই'তিকাফকারী ব্যক্তি জানাযা নামাজ পড়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হলে তার ই'তেকাফের কি বিধান?

২৬৯. দিনের বেলা চাকুরিতে যোগদান করে রাতের বেলা মসজিদে অবস্থান করলে ই'তেকাফ সহীহ হবে কি না?
২৭০. ই'তিকাফকারী যদি জানাযার নামায পড়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হয় তবে তার ই'তিকাফের হুকুম কি?

হজ অধ্যায়

২৭১. হজের বিধান কি এবং কোন শ্রেণীর মানুষের উপর হজ ফরয?
২৭২. হজের ফরযসমূহ কি কি?
২৭৩. হজের ওয়াজিবসমূহ কি কি?
২৭৪. হজের সুন্নতসমূহ কি কি?
২৭৫. হজের মুস্তাহাবসমূহ কি কি?
২৭৬. হজ কত প্রকার ও কি কি এবং কোন প্রকার হজ পালন করা তুলনামূলক উত্তম?
২৭৭. ইহরাম এবং এসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি কি?
২৭৮. ইহরাম অবস্থায় কি কি বিষয় নিষিদ্ধ?
২৭৯. ইহরাম অবস্থায় কি কি বিষয় মাকরূহ?
২৮০. সায়ী এবং এসংক্রান্ত জরুরী বিষয়াবলি
২৮১. তওয়াফের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি
২৮২. উমরার ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়াবলি
২৮৩. বদলী হজের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি
২৮৪. বদলী হজ্জের শর্তাবলি কি?
২৮৫. সংক্ষেপে হজের কার্যক্রম
২৮৬. হজ ফরজ হওয়ার পর স্বামী অনুমতি না দেয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে হজ আদায়ের বিধান কি?
২৮৭. মাথা মুণ্ডনকারীর জন্য হালাল হওয়া জরুরী কি না?
২৮৮. হজের রুকন আদায়ে অক্ষম অসুস্থ ব্যক্তির জন্য বদলি হজ করানো সহীহ কি না?
২৮৯. দম দেয়ার জন্য কোনো সময় বা স্থান নির্দিষ্ট আছে কি না?
২৯০. হায়েয, নেফাস বা জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করার কারণে কি ধরনের দম ওয়াজিব হয়?
২৯১. আরাফার ময়দানে মুকিম অবস্থায় কসর পড়া এবং যোহর আসর এক সাথে পড়ার বিধান কি?
২৯২. হজ ফরজ পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর হজের সময় আসার পূর্বেই সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে হজ কাযা করা ওয়াজিব কি না?

২৯৩. স্ত্রীর উপর হজ ফরজ হওয়ার পর স্বামী নিজের টাকা খরচ করে স্ত্রীকে হজ করালে স্ত্রীর হজ আদায় হবে কি না?

২৯৪. অনেকে বলে কা'বা শরীফ দেখলে হজ্জ ফরজ হয়ে যায়। কথাটা কতটুকু সত্য?

২৯৫. বদলি হজ করার পর নিজ খরচে হজ আদায়ে সামর্থবান হলে পুনরায় হজ আদায় করতে হবে কি না?

যাকাত ও সদকায়ে ফিতর

২৯৬. কি কি সম্পদ কি পরিমাণ থাকলে যাকাত ফরয হয়?

২৯৭. যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে কি কি শর্ত প্রযোজ্য?

২৯৮. যাকাত প্রদানের খাতগুলো কি কি?

২৯৯. সদাকাতুল ফিতর সম্বন্ধে বিস্তারিত বিধান

৩০০. সব শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রেই কি একই মানের সদকাতুল ফিতর প্রযোজ্য?

৩০১. নেশাকারীকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে কি না?

৩০২. আপন ভাইকে যাকাতের টাকা প্রদান করা হলে যাকাত আদায় হবে কি না?

৩০৩. নেসাব পরিমাণ টাকা ঋণ দেয়ার এক বছর পর এক তৃতীয়াংশ টাকা পরিশোধ করা হলে এটাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

৩০৪. একজনের কাছে তিন লাখ টাকা পাবো। সে দিচ্ছি দিচ্ছি করে দিচ্ছে না। এটাকার জাকাত দিতে হবে কি না?

৩০৫. যাকাতের টাকা দিয়ে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কোনো শিশুকে বৈধ খেলনার কোনো বস্তু কিনে দেওয়া হলে যাকাত আদায় হবে কি না?

৩০৬. যাকাত গ্রহীতাকে যাকাত দেওয়া হচ্ছে একথা জানানো জরুরি কি না?

৩০৭. ইমাম মুয়াজ্জিনকে বেতন ভাতার পরিবর্তে জাকাত দিলে জাকাত আদায় হবে কি না?

৩০৮. সৎ মাকে যাকাতের টাকা প্রদান করা হলে যাকাত আদায় হবে কি না?

৩০৯. যাকাতের টাকা দিয়ে মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড় ক্রয় করে দেয়া হলে যাকাত আদায় হবে কি না?

৩১০. ভাইকে যাকাতের টাকা দেয়া হলে যাকাত আদায় হবে কি না?

৩১১. স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে কি না?

৩১২. মা তার সন্তানকে যাকাত দিতে পারবে কি না?

৩১৩. মসজিদের ইমাম-মুয়াযযিনকে যাকাত এবং সদকাতুল ফিতর প্রদান করা যাবে কি না?

৩১৪. জনৈক ব্যক্তিকে নিসাব হতে কিছু পরিমাণ কম যাকাত দেয়ার পর সে তা দান করে দিলো। এব্যক্তিকে কি আবার যাকাত দেয়া যাবে?

৩১৫. গাছ বিক্রি হলে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ায় মালিকের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

৩১৬. ছোট শিশুদের নামে জমাকৃত টাকা নেসাব পরিমাণ হয়ে গেলে তাদের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে কি না?

দান হেবা

৩১৭. প্রতিবেশীকে হেবা করা মাল হেবাকারীর জন্য পুনরায় ফেরত নেয়া জায়েয আছে কি না?

৩১৮. অন্যান্য ওয়ারিস থাকা সত্ত্বেও নিজের একমাত্র কন্যা সন্তানকে পূর্ণ সম্পত্তি হেবা করে দেয়া জায়েজ আছে কি না?

৩১৯. মেয়েদেরকে পূর্ণ সম্পত্তি হেবা করে দেয়া জায়েজ আছে কি না?

বিবাহ

৩২০. কুফুর বিস্তারিত বিধান কি?

৩২১. ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে এ বিবাহ শুদ্ধ হবে কি না?

৩২২. ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে হিলা বিবাহের হুকুম কি?

৩২৩. জিন এবং মানুষের মাঝে বিবাহ জায়েয আছে কি না?

৩২৪. দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করার হুকুম কী?

৩২৫. বিবাহের সর্বনিম্ন দেনমহরের কোনো পরিমাণ আছে কি না? থাকলে কত?

৩২৬. নিজের দুধমাতার ননদ তথা দুধফুফুকে বিবাহ করা জায়েয আছে কি না?

৩২৭. এ জারজ সন্তানের নসব (জন্মসূত্র) যিনাকারী ব্যক্তি থেকে গণ্য হবে কি না?

৩২৮. আপন ভাগ্নির মেয়ে এবং আপন নানীর বোনকে বিবাহ করা জায়েয আছে কি না?

তালাক

৩২৯. যিহার কাকে বলে? এর দ্বারা তালাক পতিত হয়ে যায় কি না?

৩৩০. তুমি যদি আমাকে তোমাদের বাড়িতে যেতে বলো তবে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে না বললে তালাক হবে কি না?

৩৩১. স্ত্রীর বোনের সাথে যেনা করলে স্ত্রী কি হারাম হয়ে যাবে?

৩৩২. যদি জোরপূর্বক এই মর্মে তালাক নিয়ে নেয় যে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম তাহলে কি তালাক পতিত হবে?

৩৩৩. স্বামী স্ত্রীর মাঝে শারীরিক সম্পর্ক কিংবা নির্জন বাস না হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্ত্রী মোহর পাবে কি না? পেলে কতটুকু পাবে?

৩৩৪. 'তুমি যদি তোমার মামা বাড়ি যাও তবে তুমি তালাক' লেখা পত্র পৌঁছার পূর্বেই স্ত্রী তার মামা বাড়ি গেলে তালাক পতিত হবে কি না?

৩৩৫. স্বামীকে তুমি আমার বাবার মত বলা হলে তার বিধান কি?

৩৩৬. 'আমার বাড়ির সীমানার বাহিরে গেলে তালাক' বলে মনে মনে স্ত্রীর বাবার বাড়ি উদ্দেশ্য নেয়া হলে তালাক পতিত হবে কি না?
৩৩৭. স্ত্রীকে বোন বলে এবং স্বামীকে ভাই বলে সম্বোধন করার বিধান কি?
৩৩৮. ইদ্দত চলাকালীন স্ত্রকে দেখা যাবে কি না?
৩৩৯. ইদ্দত পালন না করে বিবাহের পর সহবাস করে আবার অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে কি নতুন ইদ্দত পালন করতে হবে?
৩৪০. সৎ মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে সে সৎ মা পিতার জন্য হালাল হবে কি না?

পর্দা

৩৪১. কোনো মহিলা তার সৎ মেয়ের জামাইয়ের সাথে দেখা দিতে পারবে কি না?
৩৪২. যেসব নারীরা বেগানা পুরুষদের সাথে উঠা-বসা করে তাদের সাথে কি পর্দাকারিণী নারীর পর্দা করতে হবে?
৩৪৩. চাচি ও মামির সাথে পর্দা করা জরুরি কি না?
৩৪৪. যদি মাহরামের থেকে ফেতনার আশঙ্কা হয় তাহলে তার সাথেও কি পর্দা করতে হবে?
৩৪৫. মহিলাদের জন্য মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা জরুরি কি না এবং মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত কি না?
৩৪৬. মহিলাদেরকে শরঈ পর্দার সাথে একত্রিত করে ওয়াজ নসীহত করা জায়েজ আছে কি না?

কুরবানী ও আকিকা

৩৪৭. কুরবানীর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং এর বিধান কি?
৩৪৮. কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব?
৩৪৯. কোন প্রজাতির পশু দ্বারা কুরবানী করা যায় এবং সেসব পশুর ক্ষেত্রে কি কি গুণাগুণ থাকা আবশ্যক?
৩৫০. কোন ধরনের পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েজ নেই?
৩৫১. কুরবানীর পশু জবাই সংক্রান্ত শরঈ বিধি বিধান কি?
৩৫২. অংশিদারীর ভিত্তিতে কুরবানী করার ক্ষেত্রে শরয়ী নীতিমালা কি?
৩৫৩. কুরবানীর গোস্ত সম্বন্ধে শরয়ী বিধান কি?
৩৫৪. কুরবানীর পশুর চামড়া সম্বন্ধে শরয়ী বিধিমালা কি?
৩৫৫. কুরবানীর পশুর লোম কাটা হলে সে লোম কি নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবে?
৩৫৬. গরুর সাত ভাগের এক ভাগে কুরবানী ওয়াজিব নয় এমন কয়েকজন অংশগ্রহণ করলে কুরবানী সহীহ হবে কি না?
৩৫৭. যিলহজ মাসের ১২ তারিখ দিবাগত রাত্রে কুরবানী করা যাবে কি না?

৩৫৮. কুরবানীর শেষ সময় কোন পর্যন্ত?
৩৫৯. কুরবানীর জন্য মান্নত করা গাভী কুরবানী না করে পরবর্তী বছর বাছুর রেখে শুধু গাভীটি কুরবানী করলে মান্নত আদায় হবে কি না?
৩৬০. মরহুম পিতার নামে করা কুরবানীর গোস্ত ছেলে মেয়েরা খেতে পারবে কি না?
৩৬১. কুরবানীর জন্য মান্নত করা বকরি কুরবানী করা হয় নি। পরে মরণাপন্ন হলে জবাই করে দেয়া হয়। এবকরির গোস্তের হুকুম কি?
৩৬২. ভাড়া দেয়া গাড়ি বাড়ির মূল্য হিসাব করে কুরবানী করা ওয়াজিব কি না?
৩৬৩. কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে এমন ব্যক্তি হজে গেলে হজের কুরবানী ছাড়াও তার জন্য আলাদা কুরবানী করতে হবে কি না?
৩৬৪. আকীকা সপ্তম দিনে করা জরুরী কি না?

জবাই

৩৬৫. বন্দুক দ্বারা পাখি শিকার করার পূর্বে জবাই করার নিয়ত করে গুলি করার পর পাখিটি মারা গেলে এপাখিটি খাওয়া যাবে কি না?
৩৬৬. মুরগি জবাই করার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলা এবং দক্ষিণ দিকে মুরগীর মাথা রাখা জরুরি কি না?

লেন দেন, ব্যবসা বাণিজ্য

৩৬৭. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুদের টাকা তোলা যাবে কি না?
৩৬৮. ব্যাংক থেকে লাভের টাকা গ্রহণ করা জায়েজ হবে কি না?
৩৬৯. ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে কম-বেশি করে বিক্রি করা জায়েয আছে কি না?
৩৭০. ভিন দেশী মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত মূল্য বিধি মেনে চলা জরুরী কি না?
৩৭১. যাট হাজার টাকা নিয়ে প্রতি বছর ধানের দুই মৌসুমে পাঁচ হাজার টাকা করে প্রদান করা জায়েজ আছে কি না?
৩৭২. সুদের টাকা হাতে এসে গেলে তা গরীব মিসকীনকে দান করা জায়েজ আছে কি না?
৩৭৩. বর্তমানে প্রচলিত বীমা পদ্ধতি জায়েয আছে কি না?
৩৭৪. ভাড়া বাসার পানির ট্যাপ কিংবা ব্যাসিন ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেলে তা মেরামত করার দায়িত্ব কার?
৩৭৫. রক্ত বিক্রি করা জায়েয আছে কি না?
৩৭৬. ইজাব কবুল ব্যতীত ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে যে লেন দেন হয় তা জায়েজ আছে কি না?
৩৭৭. গোবর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে কি না?

৩৭৮. চোরাই মার্কেট থেকে জেনেশুনে কোনো জিনিস ক্রয় করা জায়েয আছে কি না?
৩৭৯. কাউকে তার নাম ঠিকানা ব্যবহার করে পণ্য ক্রয় করে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করার শর্তে প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়া জায়েজ কি না?
৩৮০. জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালী করে টাকা গ্রহণ করা হালাল হবে কি না?
৩৮১. লাইসেন্স ক্রয়-বিক্রয় করে বিনিময় গ্রহণ করার হুকুম কি?
৩৮২. কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার হুকুম কি?
৩৮৩. ওষুধের ওয়ার্ডার দেয়া হলে ডাক্তার বলে আমাকে ৩০০ টাকা দিলে আপনার ওষুধ এনে দেব। এভাবে লাভ করা জায়েজ হবে কি না?
৩৮৪. আমানতের টাকা ব্যবসায় খাটানোর অনুমতি দিয়ে তার থেকে লাভ গ্রহণ করা জায়েজ আছে কি না?
৩৮৫. নির্ধারিত পরিমাণ ধানের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া জায়েজ আছে কি না?

মানত কসম কাফফারা

৩৮৬. আমার গরুটি যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে এটাকে কুরবানী করব। এতটুকু বলার দ্বারাই কি মানত ওয়াজিব হয়ে যাবে?
৩৮৭. কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে মানত করলে তা অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে কি না?
৩৮৮. মানত করা ছাগলের পরিবর্তে তার মূল্য আদায় করে দিলে তা জায়েজ হবে কি না?
৩৮৯. আমার ভাইয়ের সাথে কথা বলব না বলে শপথ করলে তার হুকুম কি?
৩৯০. মসজিদের নামে মানত মানা জায়েয আছে কি না?
৩৯১. খাসি আকীকা করার মানত করলে তা না আদায় করার কোনো সুযোগ আছে কি না?
৩৯২. কুরআনের নামে অথবা কুরআন স্পর্শ করে কসম করলে কি কসম সংঘটিত হবে?
৩৯৩. কসম করে 'আপনার মেয়ে ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করবো না' বলে অন্যকে বিবাহ করলে তার বিধান কি?
৩৯৪. তিন দিন রোজা রাখার মানত করলে সে রোজা কি ধারাবাহিক রাখা জরুরী?

মাতা পিতার হক

৩৯৫. মাতা পিতাকে কষ্ট দেয়ার পর তারা মারা গেলে কষ্ট দেয়ার গুনাহ থেকে পরিত্রানের উপায় কি?
৩৯৬. মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে সন্তান জিহাদে যেতে পারবে কি না?

সালাম

৩৯৭. যে ব্যক্তি কোনো ফাসেকী কাজে লিপ্ত তাকে সালাম দেওয়া যাবে কি না?

৩৯৮. অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি কারো মাধ্যমে সালাম পৌছায় তাহলে সালাম প্রাপ্ত ব্যক্তি কীভাবে সালামের জবাব দেবে?
৩৯৯. সালামের জবাব দেওয়ার বিধান কি এবং শুনিয়ে জবাব না দিলে কোনো গোনাহ হবে কি না?
৪০০. কোনো ব্যক্তিকে উযূ করা অবস্থায় সালাম দেওয়া যাবে কি না এবং কেউ দিয়ে ফেললে তার হুকুম কি?
৪০১. কোনো হিন্দু ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া এবং তার দেওয়া সালামের উত্তর দেওয়ার হুকুম কি?
৪০২. গায়রে মাহরাম মহিলাকে সালাম দেওয়ার হুকুম কি?
৪০৩. মসজিদে প্রবেশকালে ইবাদতরত মুসল্লীদের লক্ষ্য করে উঁচু আওয়াজে সালাম দিলে তার বিধান কি?
৪০৪. উদ্দেশ্যমূলক সালাম দেয়া হলে সে সালামের জবাব দেয়া জরুরী কি না?
৪০৫. পরস্পরকে সালাম দেয়া হলে কে সালামের জবাব দিবে?
৪০৬. আমরা শুনে থাকি মুয়ানাকা একবার করতে হয়; তিনবার নয়। মাসআলাটি মূলত কতটুকু দলীলসমৃদ্ধ?

মসজিদ ওয়াকফ

৪০৭. জোরপূর্বক দখলকৃত জমিতে নির্মিত মসজিদে নামায আদায় করা এবং ইমামতি করা জায়েয আছে কি না?
৪০৮. মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত অতিরিক্ত জমিতে মাদরাসা করা যাবে কি না?
৪০৯. মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত অর্থ দ্বারা জানাযার খাটিয়া ক্রয় করা জায়েয আছে কি না?
৪১০. ওয়াকফ জমি এবং সরকারি খাস জমির সম্মিলিত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা কি জায়েয আছে?
৪১১. মসজিদের জন্য ক্রয়কৃত ইট বিক্রি করা যাবে কি না?
৪১২. মসজিদে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করার হুকুম কি?
৪১৩. কোনো মসজিদের একপার্শ্ব বৃদ্ধি করা হলে মিহরাব স্থানান্তর করা যাবে কি না?
৪১৪. মসজিদের মাইক দ্বারা হারানো বিজ্ঞপ্তি বা কোনো শোক সংবাদ অথবা অন্য কোনো ই'লান দেওয়া ঠিক হবে কি না?
৪১৫. মসজিদে পড়ে থাক অব্যবহৃত কিতাবাদি নিয়ে আসা যাবে কি না?
৪১৬. মসজিদের আসবাবপত্র ধার নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?
৪১৭. কবরস্থানের গাছ বিক্রি করে কবরস্থানের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না?
৪১৮. কবরস্থানের গাছের ফল খাওয়া যাবে কি না?

৪১৯. মসজিদে রাত্রি যাপন করা এবং আহার করার শরঈ বিধান কি?
৪২০. এক মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত জায়গা অন্য মসজিদের জন্য ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?
৪২১. অতি পুরাতন কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করার বিধান কি?
৪২২. ক. তাবলীগের মেহনত কি হক? খ. মসজিদ কি শুধু নামাজের জন্য?...
৪২৩. ত্যাজ্যপুত্র করা ছেলে বাবার মিরাছ পাবে কি না?
৪২৪. স্বামীর মৃত্যুর পর ব্যাংক একাউন্টে স্ত্রীর নামে নমিনী করা টাকার বিধান কি?
৪২৫. দরিদ্র ছেলের নামে সম্পদ লিখে দেয়ার বিধান কি?

বিবিধ

৪২৬. মক্কা বিজয়ের সময় যে সকল কাফেরের ব্যাপারে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়েছিল তাদের সবাইকে কি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল?
৪২৭. কবর বা সমাধিতে ফুল দেয়ার বিধান কি?
৪২৮. দাফন করার পর কবরের উপর পানি ছিটানোর বিধান কি?
৪২৯. ইসলামে দাঁড়িয়ে পেশাব করার হুকুম কি?
৪৩০. গোবর দ্বারা উঠান লেপা হলে তা কি নাপাক হয়ে যায়?
৪৩১. খতনা করানোর হুকুম কি? যদি কোনো ব্যক্তি খতনা না করেই বালেগ হয়ে যায় তাহলে এখন তার করণীয় কি?
৪৩২. গায়রুল্লাহর নামে যিকির করা জায়েয আছে কি না? যদি কেউ করে তবে তার হুকুম কি?
৪৩৩. শরীয়তের দৃষ্টিতে হিন্দুরাও কি শহীদ হতে পারে?
৪৩৪. দাড়ি কমপক্ষে এক মুষ্টি রাখতে হবে, এক মুষ্টির ভিতরে হলে কাটা যাবে না। এটা কোনো শরঈ দলীল দ্বারা প্রমাণিত?
৪৩৫. সম্পদ আত্মসাৎ করে পরবর্তীতে মালিকের সম্পদের সাথে মিশিয়ে চলে আসলে দায় মুক্তি হবে কি না?
৪৩৬. পুরুষের জন্য লাল কাপড় পরিধানের হুকুম কি?
৪৩৭. কোনো ভণ্ড পীরের বিরিয়ানী খাওয়া জায়েয আছে কি না?
৪৩৮. স্ত্রী যদি কৌশলে স্বামীকে ঋণ দিয়ে সুদ নেয় এবং পরবর্তীতে তাকে দিয়ে দেয় তবে তা জায়েজ আছে কি না?
৪৩৯. মহিলাদের জন্য মুরিদ হওয়া জায়েয আছে কি না?
৪৪০. ফুটবল খেলা জায়েয আছে কি না?
৪৪১. বালেগা মেয়ের মাথার চুল কাটার হুকুম কি?
৪৪২. বাজি ধরা ব্যতীত কেরামবোর্ড খেলা জায়েয আছে কি না?
৪৪৩. কাঁচা পিঁয়াজ খাওয়া জায়েয আছে কি না?
৪৪৪. কাঁচা ডিম খাওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি না?

৪৪৫. হিন্দু শিক্ষককে রক্ত দেওয়া যাবে কি না?
৪৪৬. পুরুষ, মহিলার জন্য লোহার আংটি ব্যবহারের বিধান কি?
৪৪৭. বিড়ি, সিগারেট, পান, সুপারি, জর্দা ইত্যাদি খাওয়া জায়েয আছে কি না?
৪৪৮. পান জর্দা খাওয়া জায়েয থাকলে বিড়ি সিগারেট খাওয়া জায়েয নেই কেন?
৪৪৯. হিন্দু বন্ধু বান্ধবদের সাথে একত্রে বসে খানা খাওয়া যাবে কি না?
৪৫০. পড়ার অযোগ্য কুরআন শরীফ হিফাজতের পদ্ধতি কি?
৪৫১. পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করার হুকুম কি?
৪৫২. 'যে ব্যক্তি তোমার সামনে তোমার প্রশংসা করবে তুমি তার মুখে থুথু মেরে দিবে' -এ কথাটি কতটুকু সত্য?
৪৫৩. কোনো ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করে ভুলে গেলে তার শাস্তি কি এবং তার করণীয় কি?
৪৫৪. গান গাওয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার হুকুম কি?
৪৫৫. গিরগিট মারা সংক্রান্ত হাদীসটি কতটুকু সঠিক?
৪৫৬. কত বৎসর বয়সে খতনা করানো উচিত এবং খতনা করানোর উত্তম সময় কোনটি?
৪৫৭. কোনো সুদখোরের বাড়িতে দা'ওয়াত গ্রহণ করা এবং খাওয়া বৈধ আছে কি না?
৪৫৮. কাকড়া জ্বালিয়ে ওষুধ তৈরি করা এবং তা ব্যবহার করার বিধান কি?
৪৫৯. পুরুষের জন্য রৌপ্য ব্যবহার জায়েয আছে কি না? জায়েয থাকলে তার পরিমাণ কতটুকু?
৪৬০. ব্যক্তি যদি গুনাহগারও হয় তবুও কি নিয়মিত সূরা মুলক পড়ার কারণে তার কবরের আযাব মাফ হবে?
৪৬১. বাদ ফজর সম্মিলিতভাবে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করার বিধান কি?
৪৬২. শুকাতে দেয়া জালে পাখি পড়লে সে পাখির মালিক কে হবে?
৪৬৩. দাইয়ূস কাকে বলে এবং তার হুকুম কি?
৪৬৪. জান্নাতে পুরুষরা হুর পাবে কিন্তু মেয়েরা কি পাবে?
৪৬৫. রুহের জগতে কি শুধু মানুষেরই রুহ ছিল না কি অন্যান্য প্রাণীরও রুহ ছিল?
৪৬৬. তওবার কি কি জন্য শর্ত?
৪৬৭. হারাম সম্পদ ভক্ষণ করা তওবা কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক কি না?
৪৬৮. আল্লাহ রাসূলের নাম লেখা কাগজ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলে কি করণীয়?
৪৬৯. বর্তমানে দেখা যায়, ছেলে-মেয়েরা হাতের নখ লম্বা রাখে। এরূপ নখ লম্বা রাখার হুকুম কি?

৪৭০. কোনো জীব-জন্তুর ছবি ফ্রেমে বাঁধাই করে তার পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয আছে কি না?
৪৭১. যদি কোনো অমুসলিম মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে এবং পথিমধ্যে মারা যায় তাহলে তার হুকুম কি?
৪৭২. যদি কেউ উলামায়ে কেরামকে গালি দেয় তাহলে তার হুকুম কি?
৪৭৩. হিন্দুদের মেলায় যাওয়ার বিধান কি?
৪৭৪. হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে চাঁদা দেয়ার বিধান কি?
৪৭৫. মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্রের জন্য হারাম টাকা দিয়ে ব্যবসাকারী ভাই থেকে খরচ গ্রহণ করা জায়েজ কি না?
৪৭৬. প্রকৃতি আঁকার পেশা গ্রহণ করা জায়েজ কি না?
৪৭৭. পুরুষ লোক কি মেহেদী ব্যবহার করতে পারবে?
৪৭৮. আবাসিক হোটেল নির্মাণ করে ভাড়া দিয়ে অর্থোপার্জন জায়েয আছে কি না?
৪৭৯. কুরআন তিলাওয়াতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম এলে তৎক্ষণাত কি করা উচিৎ?
৪৮০. দাড়িতে খুর চালানো নবীজির কলিজায় খুর চালানোর শামিল। এ কথাটি কি হাদীস?
৪৮১. দুর্নামকারী ব্যক্তি অতিথি হয়ে এলে মেজবানের জন্য কি করণীয়?
৪৮২. অকাল গর্ভপাত করানোর পর যে রক্ত দেখা দেয় তার বিধান কি?
৪৮৩. কোনো হিন্দু ব্যক্তির সাথে দেখা হলে নমস্কার বা আদাব বলে সম্ভাষণ করা যাবে কি না?
৪৮৪. মিথ্যা কসম খেলে কাফফারা ওয়াজিব হয় কি না?
৪৮৫. শিশুদের খাতনা করানোর বিধান কি?
৪৮৬. কোনো মুসলিমের জন্য হিন্দুদের সাথে মুসাফাহা করা জায়েজ আছে কি না?
৪৮৭. দাড়ি কাটা বা মুণ্ডানোর হুকুম কি?
৪৮৮. কোন পশমকে দাড়ি বলা হয়? গালের পশম কি দাড়ি? এ পশম কাটার হুকুম কি?
৪৮৯. শিশুদেরকে কত বছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করাতে পারবে? এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মত কোনটি?
৪৯০. দুগ্ধ পান করার বয়স অতিক্রম করার পরও দুধ পান করানোর বিধান কি?
৪৯১. বন্ধকি জমি ভোগ করা এবং তা জায়েজ করার জন্য কর্তন পদ্ধতি গ্রহণ করার বিধান কি?
৪৯২. জমি বন্ধক রেখে তার পরিবর্তে স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রাখা জায়েজ কি না?
৪৯৩. মহিলাদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?

৪৯৪. অবৈধ উপায়ে উপার্জিত টাকা-পয়সা মসজিদ মাদরাসায়া দান করা যাবে কি না?
৪৯৫. হাঁচির জবাব প্রদান করা কি ওয়াজিব? এ জবাব নিম্নস্বরে দিলেও কি যথেষ্ট হবে না শুনিয়ে দিতে হবে?
৪৯৬. সেন্ট বা পারফিউম পাক না নাপাক? এগুলো কাপড়ে ব্যবহার করে নামায আদায় করা যাবে কি না?
৪৯৭. ইসলামে দত্তক নেয়ার বিধান কি?
৪৯৮. ইসলামী শরীয়তে বিধর্মীদের সাথে মুসাফাহা করার কোনো অবকাশ আছে কি?
৪৯৯. মরদেহের উপর ফুল দেয়া জায়েয আছে কি না?
৫০০. কাঁচা মাছ খাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের বিধান কি?

সম্পাদকীয়

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া একটি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয় মা'হাদের আনুষ্ঠানিক পথচলা। মা'হাদের পরিকল্পিত শিক্ষা কার্যক্রম অনেক ব্যাপক। তবে দীনী গুরুত্ব বিবেচনায় প্রাথমিক অবস্থায় শুধুমাত্র ইফতা কোর্স চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পরিকল্পিত অন্যান্য বিভাগগুলোও চালু করা হবে ইনশা-আল্লাহ। দাওরায়ে হাদীস/ কামিলের শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষায় ন্যূনতম প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ নবীন আলেমগণ দু' বছরের জন্য মা'হাদের ইফতা কোর্সে ভর্তি হন এবং উস্তাদদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ফতওয়া-মাসায়েল বিষয়ে কঠোর অধ্যবসায় ও গবেষণায় রত থাকেন। মা'হাদের প্রথম ব্যাচের তুলেবে ইলমগণ দু' বছরে ঈমান-আকীদা, তুহারাত, নামায, রোজা, হজ, যাকাত, লেন-দেনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ছয়শতাধিক ফতোয়া অনুশীলন করেছিলেন। তাদের সেই ছয় শতাধিক ফতোয়ার মধ্য হতে নির্বাচিত ফতোয়া সংকলন হলো এই গ্রন্থটি। যা প্রথমে মা'হাদের মুখপত্র 'বাতায়ন' এর তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় তা বই আকারে প্রকাশের দাবী উঠেছিল গুণীজন থেকে। তাই প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন সহ পাঠক সমীপে গ্রন্থটি তুলে ধরা হলো।

মূলতঃ বাতায়নে প্রকাশিত ফতওয়াগুলো ছিল মানুষের বিক্ষিপ্ত কিছু প্রশ্নের উত্তরমালা। যার কারণে বিভিন্ন বিষয়ের অনেক প্রয়োজনীয় মাসায়েল তাতে সন্নিবেশিত হয় নি। তবে বর্তমান গ্রন্থটিতে প্রতিটি অধ্যায়ের জরুরী মাসায়েলও সংযোজন করা হয়েছে। অনেক শ্রম-সাধনায় এ গুরুভার কাজটি সম্পাদন করেছেন মা'হাদের শিক্ষাসচিব মুফতী হাফীজুর রহমান সাহেব (আল্লাহ তা'আলা তাকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমীন।) আর একাজে তাঁকে সহায়তা করেছেন মা'হাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাচের তুলেবে ইলমগণ(আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইলমে, আমলে পরিপক্বতা নসীব করে জাতির রাহবার রূপে কবূল করুন। আমীন!)

দক্ষ প্রুফ রিডার দ্বারা প্রুফ দেখানোসহ সার্বিক বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে গ্রন্থটি মানসম্মত ও নির্ভুল করতে সহায়তা করেছেন মা'হাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মুহতারাম ড.আব্দুল হাননান সাহেব। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এবং যাঁরা গ্রন্থটির প্রুফ দেখেছেন তাঁদের সবাইকে জাযায়ে খায়র নসীব করুন। আমীন!

গ্রন্থটি প্রকাশের গুরুভার দায়িত্বটি গ্রহণ করেছেন বিশ্বসাহিত্য ভবন এর স্বত্বাধীকারী জনাব তোফাজ্জল সাহেব। আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং গ্রন্থটি প্রকাশে আরো যারা সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন!

সবশেষে পাঠক সমীপে বিনীত আরয হলো, প্রয়োজন পরিমাণ দীনী ইলম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। ঈমান আকীদা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতই শুধু নয়; বরং যে যেই পেশায় বা কাজে কর্মরত সে পেশা বা কাজের জরুরী মাসআলা মাসায়েল জানাও তার জন্য ফরয। এ ফরয তরক করা কবীরাহ গুনাহ। আর একটি কবিরা গুনাহই মানুষকে জান্নাত থেকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই আসুন, আমরা অতীত উদাসীনতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করি এবং এখন থেকেই ফরয পরিমাণ ইলম শিক্ষা করা শুরু করি।

আমার মায়ের ভাষা বাংলায় যারা কথা বলেন সবার সাথেই রয়েছে আমাদের হৃদয়ের সম্পর্কে। তাই বাংলাভাষী সকল মানুষ যেন ফরয পরিমাণ ইলম হাসিল করে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে যেতে পারে সে লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রকাশনা। গ্রন্থটি নির্ভুল করতে আমারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও ত্রুটির সম্ভাব্যতা উড়িয়ে দেয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাই গ্রন্থটিতে কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। পরবর্তীতে আমরা সংশোধন করে নেব ইনশা-আল্লাহ। মহান রব্বুল আলামীন গ্রন্থটিকে সদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করুন এবং একে আমাদের সকলের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

মাহমূদুল আমীন
২৯.০৩.২০১৪
সকাল ৭.১৪ মি.

ফতোয়া : একটি তাত্ত্বিক নিবন্ধ

মুফতী হাফীজুর রহমান

ফতোয়া ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উম্মাহ ও এর সদস্যদের বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত নানামুখী প্রশ্নের সঠিক ও সময়োচিত সমাধানে এটি একটি চলমান ব্যবস্থা। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উম্মাহর বিশেষজ্ঞগণ তাদের মেধা, প্রজ্ঞা ও গবেষণার আলোকে জীবন চলার পথে নানারকম সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা প্রতিকারের মাধ্যমে জাতির স্বাভাবিক চলার পথকে করে তোলেন স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল।

ফতোয়া শব্দের ধাতুগত বিশ্লেষণ

ফতোয়া; এটি একটি আরবি শব্দ। এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ হলো ফতওয়া। বহুবচন ফাতাওয়া। ফতওয়ার ভিন্ন আরেকটি উচ্চারণ হলো ফুতইয়া। হাদীস গ্রন্থগুলোতে ফুতইয়া একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। ফতওয়ার ব্যবহার সেখানে তুলনামূলক কম।– ইবনে মানযুর আলমিসরী (৭১১ হি.), লিসানুল আরব ১৫/১৪৫।

ফুতইয়া উচ্চারণে ফতোয়া শব্দটি বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে বাইহাকী সুগরা, সুনানে বাইহাকী কুবরা, সুনানে নাসাঈ কুবরা, মুস্তাদরাকে হাকেম, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মু'জামে তাবারানী আওসাত, মু'জামে তাবারানী কাবীর, আল মুনতাকা লিইবনিল জারুদ, মুআত্তা ইমাম মালেক, সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে দারিমী, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযাইমা, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু আওয়ানা, মুসনাদে ইবনে জা'দ, মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী, মুশকিলুল আসার লিত্তহাবী এবং মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের মতো জগৎখ্যাত হাদীস গ্রন্থগুলোতে একাধিকবার এসেছে।

পক্ষান্তরে ফতওয়া উচ্চারণটি সুনানে বাইহাকী কুবরা, মুস্তাদরাকে হাকেম, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, মুআত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আবি ইয়ালা এবং মুসনাদে আহমদ হাদীস গ্রন্থে একাধিকবার এসেছে।

ফতওয়া শব্দটি মূল ক্রিয়া। এর মূল ধাতু হলো, فاء تاء ياء (ফা তা ইয়া)। অর্থ, তারুণ্যে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভ করা, তারুণ্য, বদান্যতা, দানশীলতা।– আল মু'জামুল ওয়াসিত ৬৭৭, ইবনে ইমাদ, আল মুহীত ফিল্লুগাহ ২/৩৮২, আহমদ আলফাইউমী, আলমিসবাহুল মুনীর ২/৪৬২।

ফতওয়া শব্দটি বস্তুত আরবি فتى (ফাতান) শব্দ হতে নির্গত। আরবি ফাতান অর্থ নবীন, তরুণ। এর ক্রিয়াগত অর্থ, সে সদ্য তারুণ্যে পদার্পণ করেছে এবং শক্তিধর

হয়ে উঠেছে। ফতওয়াটা যেন উদ্ভূত বিষয়ের সমস্যাটাকে বর্ণনার মাধ্যমে দূরীভূত করে শক্তিময় করে তোলে। افتى المفتى (আফতা আলমুফতী) মানে মুফতী মহোদয় নতুন করে একটি বিধান প্রণয়ন করলেন।– ইবনে মানজুর আলমিসরী (৭১১ হি.), লিসানুল আরব ১৫/১৪৫, মুরতাযা আয যাবিদী, তাজুল আরুস ১/৮৫৩১।

অভিধান গ্রন্থ আল মুগরিবে বলা হয়েছে, ফতওয়া শব্দটি আরবি فتى (ফাতান) শব্দ হতে নির্গত। (আর ফাতান অর্থ নতুন যুবক, নবীন, তরুণ)। কারণ ফতওয়া অর্থ নতুন কোনো বিষয়ে উত্তর প্রদান করা, নতুন কোনো বিধান প্রণয়ন করা, সমস্যাপূর্ণ কোনো বর্ণনাকে শক্তিময় করে তোলা।– ২/১২২।

ফতোয়ার আভিধানিক অর্থ

ফতোয়ার আভিধানিক অর্থ, কোনো প্রশ্নের জবাব দেওয়া, কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা বা পরামর্শ দেওয়া। প্রশ্ন বা বিষয়টি শরীয়তের কোনো বিধান বিষয়ক হতে পারে অনুরূপ পার্থিব কোনো বিষয়েরও হতে পারে। কুরআনের ভাষায়: ياايهاالملأ افتونى فى روياى ان كنتم للرويا تعبرون হে সভাসদবর্গ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জেনে থাকো তবে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাও।– সূরা ইউনুস ৪৩

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, ياايهاالملا افتونى فى امرى ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون বিলকিস বলল, হে পরিষদবর্গ! আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।– সূরা নামল ৩২

ফতোয়ার পারিভাষিক অর্থ

ইবনে ইমাদ রাহ. বলেন, কোনো অস্পষ্ট বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাই হলো ফতোয়া।– আলমুহীত ফিল লুগাহ ২/৩৮২।

মুনাবী রাহ. বলেন, প্রশ্ন কর্তার প্রশ্নকৃত বিধান বলে দেওয়াই হলো ফতোয়া।– আত তাওফীক ১/৫৫০।

আল্লামা জাওহারী রাহ. বলেন ফিকহ বিশেষজ্ঞ কোনো ব্যক্তিকে উদ্ভূত কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো; আর তিনি সে বিষয়ে উত্তর দিলেন- এর নামই ফুতইয়া কিংবা ফতওয়া।– আসসিহাহ ৮/৩৮২।

আরবি ভাষার নির্ভরযোগ্য প্রাচীন অভিধান গ্রন্থ আল কামুসুল মুহীত, মাজদুদ্দীন ফাইরুযাবাদী ১/১৭০২ ও লিসুনুল আরব, ইবনে মানজুর আফ্রিকী ১০/২৯২ তে ফতোয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, الفتوى ما افتى به الفقيه অর্থ, কারো প্রশ্নের উত্তরে ফিকহ ও ফতোয়া-বিশেষজ্ঞ শরীয়তের যে বর্ণনা দেন তাই ফতোয়া।

আহমদ আল ফাইউমী রাহ. বলেন, কারো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে ফতোয়া বিষয়ক প্রাজ্ঞ আলেমের বর্ণিত বিধানের নাম হলো ফতোয়া।– আল মিসবাহুল মুনীর ২/৪৬২।

বাংলাদেশ এশিয়া সোসাইটি প্রকাশিত, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলা পিডিয়ায় (নেট সংস্করণ) ফতোয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'ফতোয়া বা ফতওয়া

(আরবি الفتوى বহুবচন ফাতাওয়া আরবি الفتاوى) হলো, বিধান ও সমাধান, যা কোনো ঘটনা বা অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামী শরীয়তের দলীলের আলোকে মুফতী বা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ প্রদান করে থাকেন। যখন কোনো ব্যক্তি সরাসরি কুরআন ও হাদীস কিংবা ফিকহের আলোকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান বের করতে অপারগ হন তখন তিনি মুফতীর কাছে এই বিষয়ে সমাধান চান। এটিকে ইসলামের পরিভাষায় ইসতিফতা (আরবি استفتاء) বলে। মুফতী তখন ইসলামী শরীয়তের আলোকে সমস্যার সমাধান জানিয়ে দেন। এ সমাধান প্রদান করাকে ইসলামের পরিভাষায় ইফতা (আরবিতে افتاء) বলে। এবং প্রদত্ত সমাধান বা বিধানটিকে ফতোয়া বলে।'

সারকথা, ফতোয়া হলো সমসাময়িক মানব সমাজে উদ্ভূত নিত্য নতুন সমস্যা সম্পর্কে সে যুগের মুজতাহিদ আলেম কর্তৃক কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে ও পূবসূরি বিদগ্ধ সত্যাশ্রয়ী আলেমগণের অনুসৃত নীতির আলোকে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করা। সংক্ষেপে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক জিজ্ঞেসিত বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনা কি তা অবহিত করণকেই ফতোয়া বলে।

ফতোয়ার শ্রেণী বিন্যাস

(ক) ফতোয়া প্রথমত তিন প্রকার: ১. বিধানগত ফতোয়া ২. ফিকহ বিষয়ক ফতোয়া ৩. বিচ্ছিন্ন ফতোয়া।

বিধানগত ফতোয়া

সরাসরি বিধানদাতা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রণীত বিধানই হলো বিধানগত ফতোয়া। ফতোয়ার এ প্রকারটি প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশ কুরআনিক আয়াত-প্রবচন অথবা পরোক্ষ প্রত্যাদেশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহরূপে কোনো সমস্যার সমাধানে প্রবর্তিত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশ বিষয়ক বিধানিক ফতোয়া: ১. আল্লাহ তা'আলা বলেন, يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن অর্থ নারীদের ব্যাপারে তারা তোমার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, আমি নারীদের ব্যাপারে ফতোয়া দেব।– সূরা নিসা ১২৭।

২. অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج অর্থ : তারা তোমাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও চাঁদ মানুষ এবং হজব্রতের জন্য একটি সময়সূচী।– সূরা বাকারা ১৮৯।

পরোক্ষ প্রত্যাদেশ বিষয়ক বিধানিক ফতোয়া: ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমার মা জননী হজের মানত করেছিলেন। কিন্তু মানত পূর্ণ করার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এখন কি আমি তার পক্ষ থেকে মানতের হজ পালন করতে পারব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, পারবে। তুমি তোমার আম্মার পক্ষ থেকে হজ আদায় করে দাও।– সহীহুল বুখারী ২/৬৫৬/১৭৫৪। এ ধরনের বিধানগত ফতোয়ায় কুরআন, হাদীস পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

ফিকহ বিষয়ক ফতোয়া

শরঈ মূলনীতির আলোকে মৌলিক কোনো বিধানের শাখা বিধান নির্ণয় কালে একজন বিজ্ঞ মুফতীর হৃদয়পটে যে বিষয়গুলো উদ্ভাবিত হয় তাই হলো ফিকহ বিষয়ক ফতোয়া। ফিকহী মাসআলা প্রণয়নকারী প্রাজ্ঞ ফকীহদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বিপুল পরিমাণ শাখাগত মাসআলার রূপ দান করেন। যে মাসআলা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। তবে তারা এসব মাসআলা শরঈ দলীল-প্রমাণের আলোকেই উদ্ভাবন করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম তাহলে এর বিধান কি হবে? অথচ বিষয়টি সম্বন্ধে এ যাবৎ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি।

বিচ্ছিন্ন ফতোয়া

কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে কিংবা কোনো ঘটনা ঘটে গেলে তদ্বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে সম্মানিত মুফতী যে ফতোয়া প্রদান করেন তাই হলো বিচ্ছিন্ন ফতোয়া।

উদাহরণস্বরূপ জনৈক ব্যক্তি বাবা মা স্ত্রী পুত্র রেখে ইন্তেকাল করল। এখন প্রশ্ন করা হলো, মৃত এই ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি তার ওয়ারিসদের মাঝে কি নিয়মে বণ্টন করা হবে? এ ধরনের ফতোয়ার ক্ষেত্রে ইফতা শব্দটি তুলনামূলক বেশি ব্যবহৃত হয়।– জাস্টিস আল্লামা তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু ৮/১১।

(খ) ইমাম আবু হানীফা রা. এর নীতিমালা অনুসারে প্রদত্ত ফতোয়াসমগ্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. যাওয়াহিরুর রিওয়ায়াহ। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ.– এই ইমামত্রয় থেকে বর্ণিত ফতোয়াসমগ্র। এই ফতোয়া সমষ্টিকে মাসাইলুল উসূল, এবং যাওয়াহিরুর রিওয়ায়াহ নামে অভিহিত করা হয়। এই ফতোয়াগুলো ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর গ্রন্থ ষষ্ঠক মাবসূত, যিয়াদাত, জামে সগীর, সিয়ারে সগীর, জামে কাবীর, সিয়ারে কাবীরে সংকলিত হয়েছে। এগুলোকে যাওয়াহিরুর রিওয়ায়াহ (সুস্পষ্ট বর্ণনা) নামে নামকরণের কারণ হলো, এগুলো মুহাম্মদ রহ. থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনায় বর্ণিত হয়ে এসেছে।

২. গাইরু যাওয়াহিরির রিওয়ায়াহ। ইমামত্রয় থেকে বর্ণিত ফতোয়াসমগ্র। তবে এগুলো মুহাম্মদ রহ. এর কিতাব ষষ্টকে স্থান পায় নি। বরং মুহাম্মদ রহ. থেকে সংকলিত কাইসানিয়্যাত, হারুনিয়্যাত, জুরজানিয়্যাত এবং রক্কিয়্যাত প্রভৃতি ফতোয়া গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এগুলোকে গাইরু যাওয়াহিরুর রিওয়ায়াহ বলা হয়। কারণ এগুলো ইমাম মুহাম্মদ রহ. থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনায় বর্ণিত হয়ে আসে নি।

৩. ফাতাওয়া ওয়াকিয়াত। যেসব মাসআলা বিভিন্ন জন থেকে প্রার্থনার প্রেক্ষিতে পরবর্তী মুজতাহিদগণ উদ্ভাবন করেছেন এবং যে ব্যাপারে পূর্বসূরি ফকীহদের থেকে সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই।– আল্লামা জাস্টিস তাকি উসমানী, উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু ১১২।

ফতোয়া সংশ্লিষ্ট শব্দাবলি এবং তার সংজ্ঞা

১. ইফতা

আল্লামা ক্বালআজী রহ. বলেন, ১. ইফতা অর্থ, জটিল কোনো বিষয়ের সমাধান প্রদান করা। ২. কোনো হস্তক্ষেপের ব্যাপারে শরঈ বিধান বর্ণনা করা। Deliverance of formal legal opinion।– মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা ১/৮০।

মুনাবী রহ. বলেন, ইফতা অর্থ, নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তার বিধান বর্ণনা করা।– আত্তাওকীফ ১/৭৯।

২. মুফতী

মুফতী শব্দটি ইফতা মূল ক্রিয়ার কর্তা বিশেষ্য। সে মতে এর অর্থ ফতোয়া প্রদানকারী। পারিভাষিক অর্থে মুফতী বলা হয়, ফিকহ ফতোয়ায় পারদর্শী এমন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি ফিকহী বিধানাবলি প্রকাশ করেন অথবা প্রশ্নকারীদের শরীয়তের বিধানাবলি শিক্ষা দেন। Mufti- expounder of the law।– মুহাম্মদ ক্বালআজী, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা ১/৪৪৫

মুফতীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রসিদ্ধ আরবি অভিধান আল মুনজিদে বলা হয়েছে, মুফতী হলেন ফিকহ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যিনি ফতোয়া প্রদান করেন এবং শরীয়ত সংশ্লিষ্ট যে সব মাসআলা তার উপর আরোপিত হয় তার উত্তর প্রদান করেন।– আল মুনজিদ ফিল লুগাহ ৫৬৭।

John Milton cowan মুফতীর অর্থ করেছেন deliveror of formal legal opinions, official expounder of Islamic law।

অর্থাৎ বিধিবদ্ধ আইনি অভিমত প্রদানকারী, ইসলামী আইনের অফিসিয়াল বা দায়িত্বশীল ব্যাখ্যা প্রদানকারী।– ইন্টারনেট ব্লগ

সারকথা, মুফতী ফিকহ ফতোয়া বিশেষজ্ঞ এমন একজন আলেম যিনি প্রশ্নকর্তার উদ্দেশে তার প্রার্থিত বিষয়ে অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে নয়; বরং গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাথে স্বচ্ছ বিচার বোধকে কাজে লাগিয়ে শরিয়ার বিধিবিধান সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন।

৩. ইস্তিফতা

ইস্তিফতা অর্থ ফতোয়া জিজ্ঞেস করা। হুবহু এ শব্দটি পবিত্র কুরআনে এসেছে। يستفتونك في النساء অর্থ তারা তোমাকে নারীদের ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে।– সূরা নিসা ১২৭।

অভিধান গ্রন্থ আল মু'জামুল ওয়াসিতে বলা হয়েছে, استفتاه– سئله رأيه في مسئلة অর্থাৎ ইস্তিফতা অর্থ হলো, কোনো ফকীহকে কোনো মাসআলার ব্যাপারে তার মতামত জিজ্ঞেস করা।– ৬৭৩।

আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাতে বলা হয়েছে, ইস্তিফতা অর্থ, জটিল কোনো বিষয়ে সমাধান চাওয়া।– ৩২/২০।

৪. মুস্তাফতী

মুস্তাফতী ইস্তিফতা মূল ক্রিয়ার কর্তা বিশেষ্য। সে মতে এর অর্থ ফতোয়া জিজ্ঞেস কারী, কোনো মুফতীর কাছে কোনো জটিল বিষয়ে সমাধান প্রার্থনাকারী।– পূর্বোক্ত ৩২/২০।

বাংলা পিডিয়ায় বলা হয়েছে, 'যখন কোনো ব্যক্তি সরাসরি কুরআন ও হাদীস কিংবা ফিকহের আলোকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান বের করতে অপারগ হন তখন তিনি মুফতীর কাছে এ বিষয়ে সমাধান চান। এটাকে ইসলামের পরিভাষায় ইস্তিফতা (আরবিতে الاستفتاء) বলে। আর যিনি সে বিষয়ে সমাধান কামনা করেন তাকে মুস্তাফতী (আরবিতে المستفتي)।

৫. দারুল ইফতা

দার (আরবিতে دار) অর্থ গৃহ, ভবন, নিকেতন, প্রতিষ্ঠান, কার্যালয়, আবাস ইত্যাদি। আর ইফতা অর্থ ফতোয়া প্রদান করা। পারিভাষিক অর্থে, যে প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করে তাকে দারুল ইফতা বলা হয়।

৬. মাসআলা

মাসআলা, এটা একটি আরবি মূল ক্রিয়া। এর অর্থ প্রশ্ন করা, জানতে চাওয়া। বহুবচন মাসাইল। এ অর্থে মাসআলা ফতোয়ার সমর্থক। উপরোক্ত ফতোয়ার দ্বিতীয় বিভক্তিটি ফতোয়ার মূলনীতি গ্রন্থে মাসাইলু যাওয়াহিরির রিওয়ায়াহ, মাসাইলু গাইরু যাওয়াহিরির রিওয়ায়াহ শিরোনামে বিবৃত হয়েছে। আমরা উপরে সেগুলোকে ফতোয়া শিরোনামে বিভক্ত করেছি। কারণ ফতোয়া এবং মাসআলার মাঝে মৌলিকভাবে কোনো পার্থক্য নেই। ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া এবং ফাতাওয়ায়ে শামী প্রভৃতি বিখ্যাত ফতোয়া গ্রন্থগুলোর ফতোয়াগুলো সবই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত উত্তরমালা নয়। অতএব ফতোয়া এবং মাসআলার মাঝে মৌলিকভাবে পার্থক্য নেই। যদিও ইলমী পরিবেশে প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত উত্তরকে ফতোয়া এবং ফিকহের গ্রন্থগুলোতে সংকলিত ফিকহী বিধানাবলিকে মাসআলা নামে অভিহিত করা হয়।

ফতোয়ার অপরিহার্যতা

ফতোয়া ইসলামী বিধানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ইসলাম থেকে ফতোয়াকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। মুসলমানের ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনের সর্বত্রই ফতোয়ার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। কারণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যেখানে জীবন যাপন করতে হয় আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধান অনুযায়ী। এজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিধান কী তা জানা আবশ্যক। প্রতিটি বিষয়ের বিধান জ্ঞান যেহেতু সবার থাকে না তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তাকে জিজ্ঞেস

করে জেনে নিয়ে তদানুযায়ী আমল করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি কোনো বিষয়ে তুমি অবগত না হও তবে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নাও।– সূরা আন নাহল ৪৩।

কুরআন অবতীর্ণ কালে কোনো বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হলে ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ নিজেই ফতোয়া দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, লোকেরা আপনাকে নারীদের ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন আল্লাহই তাদের ব্যাপারে ফতোয়া দিচ্ছেন।– সূরা নিসা ১২৭।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।– সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৪৬১।

ফতোয়া একটি ধারাবাহিক চলমান প্রক্রিয়া। মানব সমাজ যতো দিন থাকবে ফতোয়ার প্রয়োজনীয়তাও তত দিন থাকবে। কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে কিংবা কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিলে তার সমাধান ও সংশয় নিরসনের জন্য অন্যকে জিজ্ঞেস করা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। সাধারণ মানুষ তো বটেই ক্ষেত্র বিশেষে আদালতও কোনো বিষয়ে স্পষ্ট হওয়ার জন্য 'এমিকাস কিউরী' নিয়োগ করে তাদের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে থাকেন।

একজন মুমিন বা বিশ্বাসী মানুষ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানব জীবনের এমন কোনো পর্যায় নেই যেখানে তিনি তাঁর আনুগত্যশীল থাকার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত। তিনি বিশ্বাস করেন– কারো সামনে যদি মাথা নত করতে হয় তিনি হলেন একমাত্র আল্লাহ। কারণ সৃষ্টিকুলের অধিপতি এবং হুকুমের এখতিয়ার তারই। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ এবং রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।– সূরা নিসা ৫৯

যারা আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধানকে পাশ কাটিয়ে মানব রচিত মতবাদ থেকে ফয়সালা অনুসন্ধান করেন তাদের ঈমান প্রশ্নোত্তীর্ণ নয়। যদিও তারা নিজেদের মুমিন বলে মনে করে। জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে যে সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্রেক হয় ইসলামে উপস্থাপিত জীবন দর্শন থেকে দ্বিধা সংকোচমুক্ত মনে তার সমাধান গ্রহণ করা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। প্রথম যুগে মুসলিমদের জন্য তা যেমন অপরিহার্য ছিল আজকের মুসলিমদের জন্যও তা সমভাবে অপরিহার্য। সে যুগে মুসলিমদের অপরিহার্যতা পূরণের জন্য আল্লাহ নিজেই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দেওয়া বিধান ব্যাখ্যা ও জারি করার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত সাহাবীগণ অত্যন্ত সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে ক্রমবর্ধনশীল মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণে

ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে ফতোয়ার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় পদ্ধতিগত ভিন্নতার কারণে গড়ে উঠেছে মাযহাব শিরোনামে বিভিন্ন মত দর্শন। তাই আজও ফতোয়ার অপরিহার্যতা ও প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। কাল থেকে কালান্তরে কিয়ামত পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ফতোয়ার আধিকারিক কে?

আল কুরআনে সূরা নিসার ১২৭ ও ১৭৬ নাম্বার আয়াতদ্বয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সমকালীন মুসলমানদের ফতোয়া প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ তা'আলা নিজেই ফতোয়া প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় আল্লাহ তা'আলা ফতোয়ার স্বত্বাধিকারী। আল্লাহর এ ঘোষণা ফতোয়ার মাহাত্ম্য ও মুফতীর মর্যাদাকে অতি উঁচু মর্গে উন্নীত করেছে। কার্যত আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত মুফতী, ফতোয়ার মূল আধিকারিক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এটা ছিল তাঁর রিসালাতের সুমহান দায়িত্ব। সূরা নাহলের ৪৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বলেন, আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশে ঐসব বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করেন। এবং যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।

এ আয়াতে 'তুবাইয়িনা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাখ্যা করে বুঝানোর অর্থে। ফুকাহায়ে কেরাম ফতোয়াকে এ শব্দের বিশেষ্য পদ দিয়েই সংজ্ঞায়িত করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে যারা ফতোয়া দিয়েছেন, এখনো দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে দিবেন তারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দায়িত্ব পালনে তাঁর প্রতিনিধি। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জনতাকে তাঁদের কাছ থেকে জেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমরা জেনে না থাকো তাহলে যাদের কুরআনের জ্ঞান আছে তাদের থেকে জেনে নাও।– সূরা নাহল ৪৩।

এ ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি হলো, যাকে ইলমের অমূল্য নেয়ামতে ভূষিত করা হয়েছে তিনি তা গোপন করবেন না। আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে নির্দেশ দিচ্ছেন, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের কাছ থেকে গৃহীত অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিন। তাতে বলা হয়েছিল, তোমরা অবশ্যই মানুষের মাঝে কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করবে। এবং তা গোপন করতে পারবে না।– সূরা আলে ইমরান ১৮৭।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, 'আপনি বলুন, নিঃসন্দেহে আমার রব প্রকাশ্য ও গোপন সকল অশ্লীলতা, পাপ পঙ্কিলতা, সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি, তোমাদের দ্বারা আল্লাহর সাথে অংশীদার নিরূপণ যার স্বপক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ পাঠাননি এবং তার নামে তোমাদের এমন কোনো কথা বলা, যা তিনি বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই নিষিদ্ধ করেছেন।'– সূরা আ'রাফ ৩৩।

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ সাহাবী আবু হুরায়রা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া প্রদান করবে তদজনিত পাপ তার উপরই বর্তাবে'।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৬৫৭।

তিনি আরো বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি এমন কথা আরোপ করল যা আমি বলিনি সে যেন দোযখকে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১০৭।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাওযী রহ. কোনো কথা আল্লাহ তা'আলার কি না তা না জেনে তাঁর নামে চালিয়ে দেওয়াকে এর ভয়াবহতা বিবেচনা করে শিরকের চেয়েও ধ্বংসাত্মক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ ধরনের কথাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকারের প্রতি দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।– ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন ১/৩৮।

মুফতীর শর্তাবলি

একজন মুফতীর মাঝে কি কি শর্তের উপস্থিতি আবশ্যক আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যায় তার একটা পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। তাতে মুফতীর সাতটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

১. ইসলাম। মুফতী যিনি হবেন তার জন্য ইসলামের পবিত্র ধর্ম বিশ্বাসে দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী কারো ধর্মীয় অভিমত ফতোয়া বলে বিবেচিত হবে না।

২. বয়সের পরিপক্বতা। একজন মুফতীকে অবশ্যই যথোপযুক্ত প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হতে হবে। অপ্রাপ্ত কিংবা অপরিপক্ব বয়সী কারো ফতোয়া গৃহীত ফতোয়ার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবে না।

৩. জ্ঞান বুদ্ধি। একজন মুফতীকে সুস্থ, স্বচ্ছ জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। সুতরাং জ্ঞানবুদ্ধিতে অস্বচ্ছতা, অপরিপক্বতা কিংবা প্রতিবন্ধিতা আছে এমন কারো ফতোয়া ফতোয়া হিসেবে গৃহীত হবে না।

৪. ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠতা। একজন মুফতীকে যথেষ্ট ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। সুতরাং অন্যায়াশ্রয়ী কোনো পাপ পঙ্কিলতায় অভ্যস্ত ব্যক্তি মুফতীর সুমহান আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না।

৫. ইজতিহাদ। ইজতিহাদ অর্থ, সর্বসম্মত গৃহীত দলীল প্রমাণের আলোকে শরঈ বিধান সম্বন্ধে ধারণা লাভ ও তা উদ্ভাবনের উদ্দেশে ফকীহের সবটুকু সাধ-সাধ্য ও শ্রম-সাধনা ব্যয় করা। একজন মুফতীর প্রধানতম শর্ত হলো, ইজতিহাদ। ইমাম শাফী রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলার দীনের ব্যাপারে শুধু এমন ব্যক্তির জন্যই ফতোয়া প্রদান বিধিত যিনি কুরআনের নাসেখ-মানসুখ (রহিতকারী এবং রহিত কৃত আয়াত-প্রবচন), মুহকাম- মুতাশাবিহ (দ্ব্যর্থহীন এবং দ্ব্যর্থবোধক আয়াত প্রবচন), তাওয়ীল-তানযীল

(কুরআনের মূল পাঠ এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) এবং এতদোভয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রজ্ঞাবান হবেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের নাসিখ মানসুখ সম্বন্ধে গভীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন, কুরআন বিষয়ে যে পরিমাণ পাণ্ডিত্বের প্রয়োজন হাদীস বিষয়েও সে পরিমাণ পাণ্ডিত্বাধিকারী হবেন, ভাষা জ্ঞান, কাব্য জ্ঞান তথা কুরআন-সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে যেসব শাস্ত্রের প্রয়োজন সে সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করবেন, এগুলো সুবিচার বোধের আলোকে প্রয়োগ করবেন, দেশজ সার্বিক রীতিনীতির আবর্তন-বিবর্তন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রাখবেন এবং এসবের সাথে সাথে প্রখর মেধা সম্পন্ন হবেন। সুতরাং কারো মাঝে যদি এসব জ্ঞান গুণের সমাবেশ হয় তবে কেবল তিনিই ফতোয়া ফারায়েজ সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার লালন করবেন এবং হালাল হারাম সম্বন্ধে ফতোয়া দিতে পারবেন। আর যিনি জ্ঞান-গুণের এ উচ্চতায় পৌঁছুতে পারবেন না তার জন্য ফতোয়া প্রদানের অধিকার অনুনুক্ত।– খতীবে বাগদাদী, আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ৩০৯, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যায় ইমাম শাফেয়ী রা. এর মুফতীর শর্তাবলি উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয়েছে, এটাই হলো, ইজতিহাদের বস্তুনিষ্ঠ অর্থ।– ৩২/২৮ তবে আল্লামা তুমুরতাশী রহ. বলেন, মুফতীর জন্য ইজতিহাদটা হলো প্রাধান্য শর্ত। ইবনে আবিদীন রাহ. বলেন, এর অর্থ হলো মুজতাহিদের উপস্থিতিকালে তিনিই মুফতী নিয়োগের ব্যাপারে প্রাধান্য পাবেন।– রদ্দুল মুহতার ৫/৪৯৮, ৫০৫ ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. হুবহু একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।– আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৩২/২৮।

৬. উন্নত প্রতিভাশক্তি। এর অর্থ একজন মুফতীকে বিপুল পরিমাণ নির্ভুলতা ও যথার্থতার প্রমাণ দিতে হবে। এবং তার মাসআলা উদ্ভাবন শক্তি বিশুদ্ধ ও গতিময় হতে হবে। সুতরাং অনুন্নত মেধার অধিকারী এবং যাদের ত্রুটিবিচ্যুতির পরিমাণটা তুলনামূলক বেশি তাদের জন্য ফতোয়া প্রদানের অধিকার অরক্ষিত।

৭. বিচক্ষণতা ও সচেতনতা। একজন মুফতীর মাঝে বিচক্ষণতা ও সচেতনতাবোধ থাকা আবশ্যক। ইবনে আবিদীন রহ. বলেন, মুফতীর জন্য গভীর বিচক্ষণ ও চৌকস হওয়া আবশ্যক। যাতে তারা নীতিহীন মানুষের চক্রান্ত ও ছলচাতুরী অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। কারণ অনেক মানুষ ছলচাতুরী, প্রবঞ্চনা ও জালিয়াতিপ্রসূত কথার মারপ্যাচে মিথ্যাকে সত্য করার ব্যাপারে বেশ সিদ্ধহস্ত। এক্ষেত্রে মুফতী মহোদয় অসচেতন হলে বড়ো ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।– ইবনে আবিদীন, রদদুল মুহতার ৪/৩০১

ফতোয়ার বিধান

যোগ্য মুফতীর জন্য ফতোয়া প্রদান ফরযে কেফায়া। সুতরাং অঞ্চল বিশেষে যদি একাধিক মুফতী বিদ্যমান থাকে তাহলে তাদের একজন এ দায়িত্ব পালন করলে অন্যরা এর দায়ভার থেকে মুক্তি পাবেন। তবে কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে ফতোয়া প্রদান করা ফরযে আইন বলে বিবেচিত। যথা,

১. কোথাও যদি কেবলমাত্র একজন মুফতী থাকেন তাহলে সে মুফতীর জন্য ফতোয়া প্রদান করা ফরযে আইন হয়ে পড়ে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয় যে সকল লোক আমার নাযিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনাবলি ও হিদায়তকে গোপন করে যদিও আমি কিতাবে তা মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত বর্ষণ করেন এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীরাও অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।– সূরা বাকারা-১৫৯

২. ফতোয়া প্রার্থীর যদি দ্রুত ফতোয়ার প্রয়োজন হয় এবং ফতোয়া প্রদান না করা হলে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়া কিংবা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগের প্রবল আশঙ্কা হয় তাহলে এক্ষেত্রে মুফতী মহোদয়ের জন্য ফতোয়া প্রদান করা ফরযে আইন।

৩. প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদি ফিকহ ফতোয়ায় বিশেষজ্ঞ কোনো ব্যক্তিকে মুফতী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তখন তার উপর ফতোয়ার দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো। নির্দেশ মান্য করো রাসূলের, তোমাদের মধ্যে যারা প্রশাসক তাদের।– সূরা নিসা ৫৯।

ইমাম নববী রহ. বলেন, ফতোয়া প্রার্থীদের ফতোয়া প্রদান করা ফরযে কেফায়া। আর যদি সেখানে কেবলমাত্র একজন মুফতী থাকেন তবে সেক্ষেত্রে ফতোয়া প্রদান ফরযে আইন হয়ে পড়ে।– আল্লামা জাস্টিস তাকি উসমানী, উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু ২৮৬, ইমাম নববী, আলমাজমু ভূমিকাংশ ১/২৭।

আল্লামা মাহাল্লী রহ. বলেন, তাত্ত্বিক প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করা, দীনি বিষয়ে সমস্যার সমাধান প্রদান করা, সংশয় সন্দেহ বিদূরিত করা, তাফসীর হাদীস এবং ফিকহ বিষয়ক শরঈ জ্ঞান অর্জন করা– এসবই ফরযে কিফায়া। এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে যেন বিচারক এবং মুফতী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। কারণ ধর্মীয় অঙ্গনে এ দু'টির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। রাষ্ট্রের ভিতরে সর্বজন বিদিত যোগ্যমান নির্দিষ্ট সংখ্যক মুফতী থাকা আবশ্যক। যাতে করে মানুষ তাদের ধর্মীয় সমস্যাবলি নিয়ে তাদের শরণাপন্ন হতে পারে। নামায কসর করা যায় এই পরিমাণ দূরত্বের মাঝে একজন করে মুফতী থাকা আবশ্যক বলে মত দিয়েছেন শাফী মাসলাকের উলামায়ে কেরাম।– জালালুদ্দীন মাহাল্লী, শরহু মিনহাজিত তালিবীন ৬/৩২৪।

ফতোয়ার নিষিদ্ধ বিধান

একজন মুফতী মানে সমাজে অবিসংবাদিত নেতা। সমাজের ধর্ম বিষয়ক যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেওয়া একজন মুফতীর গুরু দায়িত্ব। ক্ষেত্র বিশেষে বিষয়টা তার জন্য ফরযে আইন হয়ে পড়ে। তবে কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে ফিকহ ফতোয়ার নীতিমালার আলোকে মুফতীর জন্য ফতোয়া দেওয়া নিষিদ্ধ।

১. মুফতী মহোদয় যথা নিয়মে ফতোয়া প্রদানে যোগ্য। কিন্তু প্রার্থিত মাসআলা বিশেষের বিধান সম্বন্ধে তার ধারণা নেই। এবং তড়িত গতিতে মূলনীতির আলোকে এর বিধান উদ্ভাবন করাও তার পক্ষে আপাতত সম্ভব নয়। অথবা সংশ্লিষ্ট মাসআলার দলীল প্রমাণের ব্যাপারে সে দ্বিধান্বিত এবং প্রমাণগুলোর মাঝে প্রাধান্য বিধান করা তার জন্য কষ্ট সাধ্য। এক্ষেত্রে মুফতীর জন্য ফতোয়া প্রদান বিধিত নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিচারক তিন প্রকৃতির। তার মধ্য থেকে এক প্রকৃতির বিচারক জান্নাতে যাবে। আর বাকি দুই প্রকৃতির বিচারক জাহান্নামে যাবে। জান্নাতী বিচারক হলো সেই বিচারক যিনি সত্য জানেন এবং তদানুযায়ী রায় প্রদান করেন। আর যে বিচারক সত্য জানে কিন্তু অবিচার করে এবং বিচারের ক্ষেত্রে জুলুমের আশ্রয় নেয় এবং তেমনিভাবে যে বিচারক না জেনে মানুষের মাঝে বিচারিক রায় প্রদান করে এরা উভয় জাহান্নামী।– সুনানে আবু দাউদ ৩/৩২৪/৩৫৭৫ বিচারকের এ বিভাজনের ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থা এবং ফতোয়ার মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে মুফতী মহোদয় ফতোয়া সেবা দান থেকে নিবৃত্ত থাকবেন। চূড়ান্ত বিধান নিরূপনের জন্য সময় নেবেন। নতুবা ফতোয়া প্রার্থীকে অন্য কোনো বিজ্ঞ মুফতীর কাছে সোপর্দ করবেন। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, যখন তাঁর বিদূষিতা সম্বন্ধে আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আবু বকর রা. আয়েশা রা.-এর মাথায় চুমু খেলেন। তখন আয়েশা রা. বললেন, আপনি আমার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আমার বিদূষিতার কথা বললেন না কেন? তখন আবু বকর রা. বললেন, যে ব্যাপারে আমার নিশ্চিত ধারণা নেই সে ব্যাপারে মন্তব্য করলে কোন আকাশ আমাকে ছায়া দিবে? কোন জমিন আমাকে বহন করবে?– ইমাম বাইহাকী, আল মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা ১/১৬৭/৬৪৭, নুরুদ্দীন হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/১৮৮/১৫৩০২।

২. মুফতী যদি আশঙ্কা বোধ করে, ফতোয়া প্রার্থী এ ফতোয়া পত্র নিয়ে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে অথবা তার প্রবল ধারণা হয়, এ ফতোয়া প্রকাশিত হলে সমাজে চরম বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিবে তবে এসব ক্ষেত্রে মুফতী মহোদয় ফতোয়া প্রদান থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কারণ বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে শান্তিময় পরিবেশ বজায় রাখা উত্তম।

আল্লামা আজুররী রহ. বলেন, যদি কোনো বিজ্ঞ মুফতীকে কোনো বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয় আর সে জানে যে এ মাসআলার সাথে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিপর্যয়, অশান্তি জড়িত। এবং এ মাসআলা প্রকাশিত হলে মানুষের মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে পারে তবে এক্ষেত্রে সে প্রার্থিত মাসআলার উত্তর প্রদান করবে না। বরং ফতোয়া প্রার্থীকে হিতৈষী মনোভাব নিয়ে তার জন্য উপযোগী কোনো পথ পন্থা বলে দিবে।– আল্লামা আজুররী, আখলাকুল উলামা ১/৪৩।

৩. যেসব প্রশ্নের জবাবে কোনো ধরনের উপকারিতা নেই সেসব অনর্থক প্রশ্নের উত্তর মুফতী মহোদয় প্রদান করবেন না। ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো সম্প্রদায়কে দেখি নি। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাত্র তেরটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; এর মাঝেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধান হয়ে যায়। আর সবগুলো বিষয়ই ছিল কুরআন বিষয়ক। যেসব প্রশ্নের উত্তরে তারা লাভ দেখতেন শুধু সেসব বিষয়েই তারা প্রশ্ন করতেন।– ইমামা দারিমী, সুনানুদ দারিমী ১/৫১, আল্লামা জাস্টিস তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু ২৮৬-২৯১।

ফতোয়া জিজ্ঞাসার বিধান

জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়াদির বিধান সম্বন্ধে যে অবগত নয় তার জন্য ফতোয়া জিজ্ঞেস করা আবশ্যক। কারণ শরীয়তের বিধান মতে ইমপ্লিমেন্টেশন তথা আমল করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য জরুরি।

ইমাম নববী রহ. বলেন, কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হলে তার জন্য সে বিষয় সম্বন্ধে বিধান জেনে নেয়া আবশ্যক। সুতরাং তার এলাকায় যদি যোগ্যমান মুফতী না থাকে তবে সফর করে হলেও বিজ্ঞ মুফতীর শরণাপন্ন হওয়া তার জন্য আবশ্যক। আমাদের পূর্বসূরিদের অনেকেই একটি মাত্র মাসআলার জন্য রাত দিন সফর করতেন।– আল্লামা শাতিবী, আল মুওয়াফাকাত ৫/৩৭১, ইমাম নববী, আলমাজমু'১/৫৪।

ফতোয়ার সংবেদনশীলতা

ফতোয়া চরম জটিল, কঠিন স্পর্শকাতর একটি বিষয়। ফতোয়া ব্যবহারে সামান্য অসতর্ক হলে দীন-দুনিয়ার চরম বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। কারণ ফতোয়া হলো আল্লাহর বিধান। আর মুফতী হলো সে বিধান বর্ণনায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্বকারী। একটি মাসআলা বলা বা তাতে স্বাক্ষর করার অর্থই হলো, তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি হয়ে মাসআলা বলছেন কিংবা স্বাক্ষর করছেন। তাইতো বলা হয় মুফতী হলো, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হয়ে স্বাক্ষরকারী।– আল্লামা তাকি উসমানী, উসূলুল ইফতা ১৩।

সুতরাং ফতোয়া ব্যবহারে বিষম যত্নশীল হতে হবে এবং গভীর বিচক্ষণতা নিয়ে ফতোয়ার লেনদেন করতে হবে। যাতে আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মিথ্যা আরোপ না হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করাকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন যে সম্পর্কে তোমাদের অবগতি নেই।– সূরা আল ইমরান-৩৩।

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, যেসব বস্তু সম্পর্কে তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা রচনা করে সে সম্পর্কে বলো না এটা হালাল এবং এটা হারাম। কারণ এর অর্থ হবে, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছো। নিশ্চিত জেনো যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তারা সফলকাম হয় না।– সূরা আন নাহল ১১৬।

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা রা. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তিকে না জেনে ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে তার যাবতীয় পাপের দায়ভার ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে যে না জেনে তাকে ফতোয়া প্রদান করেছে।– সুনানে আবূ দাউদ ৩/১৫৭২/৩৬৫৭।

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে ফতোয়ার ব্যাপারে যে বেশি দুঃসাহসী সে জাহান্নামের ব্যাপারে বেশি দুঃসাহসী।– সুনানে দারিমী ১/৫৭।

ইবনে আবি লাইলা রা. বলেন, প্রত্যেক সাহাবীই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আগ্রহ করতেন যে তার অন্য ভাই তার জন্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট হবেন। তেমনিভাবে তারা ফতোয় দানের ব্যাপারেও আগ্রহ প্রকাশ করতেন যেন তাদের অন্য ভাইরা তাদের জন্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট হয়ে যান।– সুনানে দারিমী ১/২৪৮।

সুফইয়ান ইবনে উয়াইনাহ এবং সাহনুন রহ. বলেন, ফতোয়ার ব্যাপারে অতিশয় ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী খুব স্বল্প মেধার অধিকারী। সুতরাং বিজ্ঞ মুফতীদের জন্য ফতোয়া দানের ব্যাপারে সীমাহীন সতর্ক ও সংবেদনশীল হওয়া উচিত। যেসব বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর বিধান স্পষ্ট এবং সর্বসম্মত শুধু সেসব বিষয়েই ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে। এছাড়া যেসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত-পথ ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং বিধানে বেশ প্রচ্ছন্নতা রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে খুব সতর্কতার সাথে পথ চলবে।

ইমাম মালেক রা.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, অনেক ক্ষেত্রে তাকে পঞ্চাশটি মাসআলা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হতো; কিন্তু তিনি একটি মাসআলারও উত্তর দিতেন না। বরং তিনি বলতেন, যিনি উত্তর দিবেন, উত্তর দেওয়ার পূর্বে তার কর্তব্য হলো জান্নাত জাহান্নামের সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপন করা, সাথে সাথে জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে কি করে নিষ্কৃতি মিলবে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। এরপর যেন সে উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

আসরাম রা. বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রা. কে অসংখ্যবার বলতে শুনেছি 'আমি জানি না'।– ইমাম নববী, আলমাজমু ১/৪০-৪১, আলমাউসুআ ৩২/২৪

ইমাম আবূ হানীফা রা. বলেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যদি ইলম উঠিয়ে নেয়ার আশঙ্কা না হতো তাহলে আমি কাউকে ফতোয়া দিতাম না, ফতোয়া প্রার্থীর জন্য হবে যেটা আনন্দঘন বিষয় আর আমার উপর হবে ঝুঁকিপূর্ণ এবং ভয়ংকর এক বোঝা।– উসূলুল ইফতা ১৬।

ফতোয়ার পরিধি

ফতোয়া ব্যবহারের কোনো সীমা রেখা নেই। পৃথিবীর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সামগ্রিক বিষয়ে ফতোয়ার রাজত্ব সদর্পে বিদ্যমান। এ ফতোয়া ইসলামী

জীবন ব্যবস্থার অন্যতম একটি অনুষঙ্গ। মুসলমানের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক এবং অর্থনৈতিক লেনদেনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান জানা ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা আবশ্যক। আর এসবই ফতোয়ার আওতাভুক্ত। সুতরাং ফতোয়া বিশ্বাসিক, ব্যবহারিক, দায়িত্বগত ও গঠনগত বিধানাবলিসহ মানব জীবনের যাবতীয় বিধানাবলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ফতোয়ার মর্যাদা

ফতোয়ার মর্যাদা অপরিসীম। নিম্নে কয়েকটি পয়েন্টে ফতোয়ার মর্যাদার দিকটি সংক্ষেপে উপস্থাপিত হলো।

১. স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের ফতোয়ার উত্তর দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, লোকেরা আপনাকে নারীদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ নিজেই নারীদের সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন।– সূরা নিসা ১২৭।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, লোকেরা আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদের কালালা (পিতামাতাহীন ও নিঃসন্তান উত্তরাধিকারী) সম্বন্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন।– সূরা নিসা ১৭৬।

২. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় ফতোয়া প্রদানের এ মহান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর এটা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের অন্যতম বিষয়। আল্লাহ তা'আলা নিজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ গুরু দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি। যাতে আপনি লোকদেরকে অবতীর্ণ বিষয়াবলি ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দেন। এবং যাতে তারা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।– সূরা নাহল ৪৪।

সুতরাং একজন মুফতী ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের পরে তাবিয়ীন পর্যায়ক্রমে ফতোয়া প্রদানের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩. ফতোয়ার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো আল্লাহ তা'আলার বিধান বর্ণনা করা এবং তা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা। প্রকারান্তরে এটা আল্লাহরই বাণী। তিনি ফতোয়া প্রার্থীকে বলছেন তোমার জন্য এ কাজ করা আবশ্যক, তোমার জন্য একাজ করা নিষিদ্ধ। এ কারণে আল্লামা কারাফী রহ. মুফতীকে আল্লাহর উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যাদাতা দুভাষী বলে অভিহিত করেছেন। আর আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. মুফতীকে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারী মন্ত্রীর সাথে তুলনা করেছেন। ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ হয়ে স্বাক্ষরকারী মন্ত্রীর মর্যাদা এতটাই মূল্যবান ও সমুন্নত একটি পদ যার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এটা একটা

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা। তাহলে এ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের অধিপতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে স্বাক্ষরদাতার পদ মর্যাদার মাহাত্ম্য কী পরিমাণ হবে তা বলাই বাহুল্য।– ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন ১/১০, আল মাজমু ১/৪০।

ইবনুল মুনকাদির রহ. বলেন, আলেম হলো আল্লাহ এবং তার সৃষ্টির মাঝে সেতুবন্ধ। সুতরাং সে যেন গভীরভাবে ভেবে দেখে যে, সে এই দু পক্ষের মাঝে কি করে দায়িত্ব পালন করবে?– ইমাম নববী, আল মাজমু' ১/৭৩।

ফতোয়া এবং বিচার ব্যবস্থা

বিচার হলো বাদী-বিবাদীর মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দ্বকে আইনানুগ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করে দেওয়া। বিচারকে আরবি ভাষায় কাযা বা হুকুম বলা হয়। এবং বিচারককে বলা হয় কাজী বা হাকিম। বিচার ব্যবস্থা অনেকটা ফতোয়া বিধানের মতোই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দু'টির মাঝে ব্যবধান রয়েছে।

১. ফতোয়া হলো শরঈ বিধান বলে দেওয়া বা বর্ণনা করা। আর বিচার হলো বাদী বিবাদীর মাঝে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি করে দেওয়া।

২. ফতোয়ার বিধান প্রতিপালনে ফতোয়া প্রার্থী কিংবা অন্য কারো জন্য সৃষ্টির পক্ষ থেকে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা নেই। ইচ্ছে করলে সে এই ফতোয়া বিধান পালন করতে পারে আবার নাও করতে পারে। এবং এক্ষেত্রে সে অন্য মুফতীর শরণাপন্নও হতে পারে। পক্ষান্তরে বিচারিক বিধান হলো একটি বাধ্যগত বিষয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাদমান দুটি পক্ষের কোনো একটি পক্ষ যদি অপর পক্ষের বিরুদ্ধে কোনো মুফতীর দারুল ইফতায় মামলা দায়ের করে তাহলে মুফতী বিবাদী পক্ষকে দারুল ইফতায় হাজির হতে বাধ্য করতে পারবে না। অন্যদিকে সে যদি আদালতে মামলা দায়ের করে তাহলে বিবাদী পক্ষকে মামলার নির্দিষ্ট তারিখে আদালতে হাজির হতে হবে। এবং বিচারক মহোদয়ও তাকে কোর্টে হাজির হতে বাধ্য করতে পারবে। কারণ বিচারপতিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে দুটি পক্ষের মধ্যকার বিবাদকে নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে।– আল্লামা যারকাশী, আল বাহরুল মুহীত ৪/৪০১, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন ১/৩৬।

৩. মুফতী ফতোয়া প্রদান করেন আভ্যন্তরীণ বিষয়াদির নিরিখে এবং ফতোয়া প্রার্থীকে সত্যবাদী বলে ধারণা করেন। অন্যদিকে বিচারপতি বাস্তবতার নিরিখে বিচার কার্য পরিচালনা করেন। ইবনে আবিদীন রহ. বলেন, এর উদাহরণ হলো, জনৈক ব্যক্তি এক মুফতী সাহেবের কাছে এসে বলল, আমি মিথ্যা মনে করে আমার স্ত্রীকে বলেছি তুমি তালাক। এক্ষেত্রে মুফতী মহোদয় ফতোয়া দিবেন, আপনার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয় নি। পক্ষান্তরে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালে বিচারপতি রায় দিবেন আপনার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয়ে গিয়েছে।– রদ্দুল মুহতার ৪/৩০৬

৪. বিচারপতির বিচার হলো একটি বিচ্ছিন্ন বিষয়। বিচারিক রায় দণ্ডপ্রাপ্ত কিংবা রায় প্রাপ্ত পক্ষ ছাড়া অন্য কারো উপর প্রয়োগ হবে না। অন্যদিকে মুফতীর ফতোয়া একটি

ব্যাপক ভিত্তিক শরঈ বিধান। এটা ফতোয়া প্রার্থী ছাড়া অন্যান্যদের উপরও প্রয়োগ হতে পারে। সুতরাং বিচারক বিশেষ কোনো ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে নির্দিষ্ট কোনো রায় প্রদান করেন। আর মুফতী সর্বজনীন বিধান হিসেবে ফতোয়া প্রদান করেন।– ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন ১/৩৮।

৫. বিচার প্রক্রিয়া কেবলমাত্র বক্তব্য ভাষ্যেই সম্পন্ন হয়। আর ফতোয়া লিখিত, কর্ম সম্পাদন এবং ইশারা ইঙ্গিতেও সম্পন্ন হতে পারে।– আল্লামা কারাফী, আলফুরুক ১/১১, আল ইহকাম ১৯৫, আলমাউসূআ ৩২/২১।

অনেক বিজ্ঞ আলেম একই সাথে মুফতীও ছিলেন এবং বিচারপতিও ছিলেন। বিচারপতি হিসেবে তার প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল। তবে তিনি বিচারপতির এজলাস থেকে যেসব সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন কেবল সেসব সিদ্ধান্তই বিচারিক রায় হিসেবে গণ্য হতো। পক্ষান্তরে তিনি যখন জনসাধারণের প্রশ্নের উত্তরে ধর্মীয় অভিমত ব্যক্ত করতেন তখন তা নন-বিচারপতি মুফতীদের ফতোয়ার মতো নিছক ফতোয়া হিসেবে গণ্য হতো। তবে বিচারকের বিচার বিধির একটি স্বীকৃত নীতি হলো, বিচারপতি যদি বিশেষজ্ঞ আলেম না হন তাহলে তাকে শরীয়তের বিধান জানার জন্য মুফতীর শরণাপন্ন হতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইফতা এবং বিচার উভয় দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। প্রথম দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেসব বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন তা ফতোয়া হিসেবে গণ্য। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেসব সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তা কাযা বা বিচার বলে গণ্য।

ইবনুত্তল্লা (৪৯৭ হি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিচারিক ফয়সালাসমূহের একটি সংকলন প্রস্তুত করেছেন। যার শিরোনাম হলো اقضية رسول الله ﷺ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিচারিক রায়সমূহ)। এতে শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিচারিক রায়সমূহ উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যা কিছু বলেছেন তা ফতোয়া, আছার ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে। মুফতী সাধারণত দীন ও শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন। তার কোনো প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকে না। বিচার করা কিংবা কোনো শাস্তি কার্যকর করার অধিকারও তার নেই। এমন কি কোনো আলেমকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মুফতী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলেও তিনি শুধু শরীয়তের বিধান বর্ণনা করারই অধিকার লাভ করেন। বিচার কিংবা শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার তার থাকে না। কারণ বিচার হচ্ছে বিচারকের কাজ আর শাস্তি কার্যকর করা রাষ্ট্রের অনুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজ। মুফতীর ফতোয়ার আইনি দিক হলো, তিনি শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেন। আর প্রত্যেক মুসলিম শরীয়তের বিধান প্রতিপালনের জন্য শরঈ আইন মতে আদিষ্ট। সুতরাং নিজের ঈমানের দাবিতে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির ভয়ে ফতোয়া অনুযায়ী আমল

করতে বাধ্য। তবে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান যদি ফতোয়া প্রতিপালনে রুল জারি করে তবে ইহকালীন বিচারে সে তা প্রতিপালনে বাধ্য। তবে এই আইনি দিকটির কারণে মুফতী বিচার করা কিংবা শাস্তি কার্যকর করার অধিকার লাভ করেন না। বরং এর জন্য বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ রয়েছে।

'আল্লাহর বিধান' বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা

কোনো একটি মাসআলা বা ফতোয়াকে 'আল্লাহর বিধান' বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের কাফেলা প্রেরণ কালে সেনাপতিকে উদ্দেশ করে উপদেশে বলতেন,... জিহাদের ময়দানে যদি তোমরা শত্রু বাহিনীর কেল্লা অবরোধ করো আর কেল্লায় অবরুদ্ধ শত্রু বাহিনী তোমাদের কাছে আল্লাহর বিধান মতে তাদেরকে কেল্লা থেকে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করে তবে তোমরা তাদেরকে আল্লাহর বিধান মতে অবতারণ করো না। বরং তোমরা তাদেরকে নিজেদের এবং তোমাদের সঙ্গী সৈন্যদের হুকুম মতে অবতারণ করবে। কারণ তোমরা জানো না যে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার যথার্থ বিধান প্রয়োগ করতে পারবে কি না?– সহীহ মুসলিম ৫/১৩৯/৪৬১৯।

এ কারণেই উমর রা. এর সম্মুখে যখন লিপিকার তাঁর ফরমান লিপিবদ্ধ করছিল তখন লিপিকার বলল, এগুলো আল্লাহ তা'আলা আমীরুল মু'মিনীন-এর হৃদয়ে উদ্ভাসিত করেছেন। তখন উমর রা. বললেন, এভাবে বল না। বল, এগুলো আমীরুল মু'মিনীনের নিজেরই সিদ্ধান্তাবলী।

ইবনে ওয়াহহাব রা. বলেন, আমি মালেক রা. কে বলতে শুনেছি, আমাদের পূর্বসুরি এবং অনুসৃত কোনো মনীষীকে বলতে শুনি নি, যে এটা হালাল, এটা হারাম। এ ব্যাপারগুলোতে তাঁরা স্পর্ধা এবং দুঃসাহস দেখাতেন না। তাঁরা বলতেন, এটাকে আমি অপছন্দ করি এবং এ বিষয়টাকে আমি ভালো মনে করি, এরকম হওয়া উচিত, এ ব্যাপারটাকে আমরা যথার্থ মনে করি। তুমি কি আল্লাহর বাণী শুনো নি? 'বল, আচ্ছা তোমরা নিজেরাই লক্ষ্য করে দেখো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যা কিছু আহার হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন তোমরা সেগুলোর মধ্য হতে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করছো? বলো, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন? না কি তোমরা আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করছো?' – সূরা ইউনুস ৫৯।

একদা ইমাম মালেক রা. এর সম্মুখে একটি মাসআলা উপস্থাপন করা হলো। চিন্তা ভাবনা করে অভিমত ব্যক্ত করে বললেন, এটা আমার একটি ধারণা। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।– ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন ১/৩৯।

মুফতীর ভাতা গ্রহণ প্রসঙ্গ

মুফতীর জন্য উচিত হলো, বিনিময়হীনভাবে স্বেচ্ছায় ফতোয়া সেবা প্রদান করা। হ্যাঁ যদি মুফতী পারিবারিক প্রয়োজনে অন্য কোনো আয়ের উৎস গ্রহণ না করে

নিরবচ্ছিন্নভাবে এ কাজে নিরত হয় তবে দুটি শর্ত সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা গ্রহণ করতে পারবে। (১) মুফতী অন্য কোনো আয়ের উৎস গ্রহণ করে নি। (২) রাষ্ট্রীয়ভাবে অন্য কোনো মুফতীকে নিয়োগ দেওয়া হয় নি।

ফতোয়া প্রদান বিষয়ে সরকারপ্রধানদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে খতীবে বাগদাদী রা. বলেন, রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হলো, যারা ফিকহের পাঠ দান ও ফতোয়া প্রদানে নিজেদেরকে নিরত রাখে তাদের জন্য এ পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করা যেন তারা জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আর এটা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদান করবে।

আর যদি এলাকাটি এমন হয় যেখানে নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেই এবং কোষাগারও নেই অথবা রাষ্ট্রপ্রধানগণ মুফতীদের জন্য কোনো ভাতা নির্ধারণ করে নি ফলে জনসাধারণ মিলে মুফতীর জন্য ভাতা নির্ধারণ করে যাতে তারা ফতোয়ার ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে তাদের জন্য ভাতা গ্রহণ করা বিধিত হবে।

ইবনে আবি গায়লান রা. বলেন, উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রা. ইয়াজিদ বিন আবু মালেক এবং হারেস বিন ইয়সজুদকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মানুষকে ফিকহ শিখানোর উদ্দেশ্যে পাঠালেন এবং তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করলেন। তো ইয়াজিদ রা. ভাতা গ্রহণ করল। কিন্তু হারেস রা. ভাতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো। সুতরাং সে এ ব্যাপারে উমর বিন আব্দুল আজীজের কাছে পত্র পাঠাল। উমর ইবনে আব্দুল আজীজ প্রতি উত্তরে বললেন, ইয়াজিদ যে কাজটি করেছে তাতে আমি কোনো সমস্যা দেখি না। আল্লাহ আমাদের মাঝে হারেস বিন ইয়সজুদের মতো নিঃস্বার্থ লোক বৃদ্ধি করে দিন।– খতীবে বাগদাদী, আলফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ৩৯৮।

এরপর খতীবে বাগদাদী রা. উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রা.-এর ঐ শাহী ফরমান বর্ণনা করেন যা তিনি হিমসের গভর্নরকে লিখেছিলেন। 'যারা নিজেদেরকে ফিকহ ফতোয়ার সেবায় নিয়োজিত করে এবং জীবিকা উপার্জন পরিহার করে নিজেদেরকে মসজিদে (তৎকালীন সময়ের মাদ্রাসা ও দারুল ইফতা) তাদের প্রত্যেককে একশত দীনার করে প্রদান করুন। আমার পত্র পাওয়া মাত্রই এ আদেশ কার্যকর করবেন। সর্বোত্তম পুণ্যের কাজ তাই যা দ্রুত করা হয়।– প্রাগুক্ত ৩/১৯২।

মুফতী এবং প্রশাসনিক নিয়োগ প্রসঙ্গ

মুফতী এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ পদবি যার জন্য প্রশাসনিক নিয়োগের প্রয়োজন নেই। কারণ ফতোয়া প্রদানের জন্য রাষ্ট্রীয় আইনি ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। বরং মুফতী সে আল্লাহ প্রদত্ত আইনি ক্ষমতা বলেই ফতোয়া প্রদান করে থাকেন। ফিকহ ফতোয়ার নীতিমালা, মুফতীর আচরণ বিধি সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে মুফতীর গুণাবলি ও শর্তসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ফতোয়া প্রদানের জন্য মুফতীকে রাষ্ট্রের অনুমোদিত হতে হবে বলে কোথাও কোনো উদ্ধৃতি নেই। তবে ফতোয়া প্রদান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে

ফতোয়ার দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা এবং ফিকহ ফতোয়ার যোগ্যমান স্বীকৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার এ যোগ্যতার স্বীকৃতি থাকতে হবে। উপরোক্ত যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে শরীয়তের পক্ষ থেকে শুধু অনুমতি প্রাপ্তই নন; আদিষ্টও বটে। এজন্য ফতোয়ার ব্যাপারে অন্য কারো অনুমতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। যেমন কুরআন শিক্ষা দান, তাফসীর বর্ণনা, হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা দান, সীরাতুন্নবী আলোচনা, ওয়াজ নসীহত, আত্মশুদ্ধি, জীবন গঠন ও দীনী বিষয়ে রচনা ও সংকলনের জন্য সরকারের অনুমতি ও নিয়োগের প্রয়োজন হয় না।

ইসলামের প্রথম যুগ থেকে শুরু করে ইসলামী খেলাফত ও রাজ্য শাসনের শেষ সময় পর্যন্ত বিচারক ও হাকিমের নিয়োগ খলীফা বা তার অনুমোদিত সুলতানের পক্ষ থেকে হওয়া আবশ্যক ছিল। কারণ প্রশাসনিক নিয়োগ ব্যতীত কেউ এ দায়িত্ব পালন করতে পারত না। অন্য দিকে ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব ফকীহ ও মুফতীগণ নিজেরাই পালন করতেন। সাধারণ মানুষ তাদের শরণাপন্ন হতো আর তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা এই ছিল যে, কোথাও কোনো অযোগ্য লোক ফতোয়া দিলে স্বীকৃত ফকীহ ও মুফতীগণের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্র তাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করত।

বিচারপতি ইমাম সাদউদ্দীন হারেসী বলেন, ফতোয়া দেওয়া একটি পুণ্যময় কাজ। এর জন্য সরকারি অনুমোদনের কোনো প্রয়োজন নেই। পূর্বসুরিদের কর্ম পন্থা এই ছিল যে, তারা ফতোয়া বিষয়ে সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষা করতেন না।– ইবনে মুফলিহ, আল আদাবুশ শরঈয়া ৩/৩৯০

বাগদাদ ইউনিভার্সিটি ও সান'আ ইউনিভার্সিটির শরীয়ত ও আইন এবং ফিকহে মুকারিনের অধ্যাপক ড. আব্দুল কারীম যায়দান রা. তার *উসূলুদ দাওয়া* গ্রন্থে 'ফতোয়া প্রদানের অধিকার কার' শিরোনামের অধীনে লেখেন, যে ব্যক্তি মুফতী হওয়ার যোগ্য কেবল সেই ফতোয়া দিতে পারেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে মুফতী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হোক বা না হোক। তিনি আরো বলেন, ফতোয়া প্রদানের অধিকার লাভের জন্য সরকারের অনুমোদন শর্ত নয়। কিন্তু ফতোয়া প্রদানকারী বাস্তবেই এ কাজের যোগ্য কি না তা নিশ্চিত হওয়া জরুরি।– আব্দুল কারীম যায়দান, উসূলুদ দাওয়াহ ১৬২

ফতোয়া প্রদানের ভিত্তি হলো যোগ্যতা; সরকারি নিয়োগ নয়। এজন্য কে ফতোয়া প্রদানের যোগ্য কে যোগ্য নয় তা নিরূপণের জন্য ফতোয়া সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলোতে কিছু নিদর্শনাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বিচারকের ক্ষেত্রে কে বিচারকের যোগ্য কে বিচারকের যোগ্য নয় তা নিরূপণের জন্য কোনো উপায় বা নিদর্শন বলা হয় নি। বরং স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, সরকারি নিয়োগ দান ছাড়া বিচারের কোনো বৈধতা নেই।

ফতোয়া প্রদান বিষয়ে সরকারপ্রধানদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে খতীবে বাগদাদী রা. বলেন, রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হলো, যারা ফিকহের পাঠ দান ও ফতোয়া প্রদানে নিজেদেরকে নিরত রাখে তাদের জন্য এ পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করা, যেন তার জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আর এটা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদান করবে।

এরপর খতীবে বাগদাদী রা. উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রা.-এর ঐ শাহী ফরমান বর্ণনা করেন যা তিনি হিমসের গভর্নরকে লিখেছিলেন। 'যারা নিজেদেরকে ফিকহ ফতোয়ার সেবায় নিয়োজিত করে এবং জীবিকা উপার্জন পরিহার করে নিজেদেরকে মসজিদে (তৎকালীন সময়ের মাদ্রাসা ও দারুল ইফতা) তাদের প্রত্যেককে একশত দীনার করে প্রদান করুন। আমার পত্র পাওয়া মাত্রই এ আদেশ কার্যকর করবেন। সর্বোত্তম পুণ্যের কাজ তাই যা দ্রুত করা হয়।– খতীবে বাগদাদী, আলফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৩৭৪।

তো এই ফরমানের ভিতরে نصبوا انفسهم বাক্য এসেছে। যার অর্থ যারা নিজেদের নিয়োজিত করে। এখানে সরকারি নিয়োগ আবশ্যক নয়। যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি সরকারি অনুমতি ছাড়াই ফিকহ ফতোয়ার কাজে নিয়োজিত হতে পারে।

মূলকথা ফতোয়া প্রদানের জন্য সরকারের নিয়োগ কিংবা অনুমতি শর্ত নয়। হ্যাঁ সরকারের সদিচ্ছা হলে জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে অঞ্চল ভিত্তিক মুফতী নিয়োগ দিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ফিকহী বিশ্বকোষ আল মাউসু'আতুল ফিকহিয়্যায় বলা হয়েছে, যদি প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ফতোয়া সেবায় যদি কেউ স্বেচ্ছায় এগিয়ে না আসে তবে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য কর্তব্য হলো, প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে মুফতী নিয়োগ দেওয়া। এবং এ ক্ষেত্রে একমাত্র যোগ্যমান ব্যক্তিকেই নিয়োগ দিবে। এবং এ কাজের জন্য যারা নিরত হবে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদেরকে ভাতা প্রদান করা আবশ্যক। মুফতীর যোগ্যতা মনিটরিং করা সরকারের দায়িত্ব। কোনো অযোগ্য মুফতী এ কাজে প্রবৃত্ত হলে কিংবা কেউ ফতোয়ার অপব্যবহার করলে সরকার তাদেরকে এ থেকে নিবৃত্ত করবে।

খতীবে বাগদাদী রহ. বলেন, মুফতীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা সরকারের দায়িত্ব। যে ব্যক্তি ফতোয়ার যোগ্য হবে কেবল তাকেই মুফতী পদে নিয়োগ দিবে। আর যে ব্যক্তি এ পদের যোগ্য নয় তাকে এ পদে নিয়োগ দিবে না। সে পুনরায় যদি ফতোয়া প্রদানে প্রবৃত্ত হয় তবে তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি কার্যকর করবে। কে ফতোয়ার যোগ্য কে ফতোয়ার যোগ্য নয় এ ব্যাপারটি জানার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান দেশের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সাথে সলাপরামর্শ করবে। এবং নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত উলামায়ে কেরামের পরামর্শের ভিত্তিতেই ব্যাবস্থা গ্রহণ করবে।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, যে ব্যক্তি ফতোয়ার যোগ্যতা অর্জন না করে ফতোয়ার আসনে সমাসীন হয়ে ফতোয়া প্রদান করে সে পাপিষ্ঠ এবং আল্লাহর অবাধ্য। আর যে রাষ্ট্রপ্রধান তাকে অনুমোদন দিবে সে ও গুনাহগার হবে।

ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, অযোগ্য মুফতী এবং ফতোয়ার অপব্যবহারকারীদের নিবৃত্ত করা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য আবশ্যক। অযোগ্য মুফতী তো ঐ ব্যক্তির মতো যে আরোহীদের পথ দেখায় অথচ সে নিজেই পথ চিনে না। অথবা ঐ অন্ধ ব্যক্তির মতো যে মানুষকে কেবলা দেখিয়ে দেয়। অযোগ্য মুফতীর ব্যাপারটি তো এর চেয়েও নিন্দনীয়। যে ডাক্তার রোগীদের ভালো চিকিৎসা দিতে জানে না তাকে নিবৃত্ত করা সরকারের দায়িত্ব। আর যে ব্যক্তি কুরআন, হাদীস না জেনে, ফিকহ ফতোয়া না শিখে ফতোয়া দানে প্রবৃত্ত হয় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব কী পরিমাণ তা বলাই বাহুল্য।– ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন ৪/২১৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৩২/৪৬।

সারকথা ফতোয়া প্রদানের জন্য সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। তবে জন চাহিদা সৃষ্টি হলে পর্যাপ্ত পরিমাণ মুফতী নিয়োগের ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তেমনিভাবে ফতোয়ার অপব্যবহার হলে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের দায়িত্ব।

ফতোয়াবাজী, ফতোয়াবাজ শব্দদ্বয়ের ব্যবহার প্রয়োগ

ফতোয়াবাজী শব্দটির মর্মার্থ বুঝতে হলে আমাদের একটু গভীরে যেতে হবে। ফতোয়া একটি আরবি শব্দ আর বাজী হলো ফার্সি শব্দ। এ দু'টি শব্দ মিলে একটি শব্দ গঠিত হয়েছে। যাকে বাংলা ব্যাকরণে দ্বিত্ব শব্দ বলে অভিহিত করা হয়। ফতোয়ার শাব্দিক অর্থ পিছনে আলোচিত হয়েছে। ফার্সী বাজী শব্দের অর্থ হলো 'খেলা'। এর মূল ক্রিয়া হলো بازيدن (বাযিদান)। আর এর বর্তমান এবং ভবিষ্যত ক্রিয়ারূপ হলো بازد (বাযাদ) এবং এর আদেশক্রিয়া হলো باز (বায)। ফার্সী ভাষার এসব ক্রিয়া তৈরির আলাদা নীতিমালা সংশ্লিষ্ট ফার্সী ব্যকরণ গ্রন্থগুলোর মাঝে সুবিস্তর আলোচিত হয়েছে। ফতোয়াবাজী এর কর্তাবিশেষ্য হলো ফতোয়াবাজ। ফার্সি ব্যাকরণ মতে কোনো বিশেষ্যের সাথে যখন নির্দেশ ক্রিয়া যুক্ত হবে তখন সে দ্বিত্ব শব্দটি কর্তা বিশেষ্যের অর্থ দিবে। সে মতে ফতোয়াবাজের অর্থ হলো যে ব্যক্তি ফতোয়া নিয়ে খেলা করে বা ফতোয়া খেলোয়াড়। ফার্সি ব্যাকরণ অনুসারে যদি এ দ্বিত্ব শব্দটিকে আবার মূল ক্রিয়ায় আনা হয় তবে শব্দটির শেষে ى (ইয়া) বর্ণ যোগ করতে হবে। ফতোয়াবাজীর ক্ষেত্রে ফার্সি ব্যাকরণিক এ নীতিটিই প্রয়োগ হয়েছে। সুতরাং ফতোয়াবাজীর অর্থ হবে ফতোয়া নিয়ে খেলা করা। বাংলা ভাষায় বাজী বা বাজ যোগে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর গঠনবিধি কিংবা ব্যবহারবিধি কিন্তু ফার্সি ব্যাকরণ থেকে ধার করা। এসব শব্দের ক্ষেত্রে যদি অন্য ভাষার ব্যাকরণকে অবহেলা করা হয় তবে বাংলা ভাষা বিজ্ঞানী কিংবা ব্যাকরণবিদরা এসব শব্দের গঠনপ্রকৃতি নিয়ে চরম হতাশায় ভুগবেন

নতুবা ভুল ফর্মুলা দিয়ে বসবেন। যদিও সংসদ বাংলা অভিধানে *বায* শব্দটিকে দক্ষ, অভ্যস্ত, আসক্ত ইত্যাদি অর্থবাচক ফার্সি প্রত্যয় বিশেষ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। মূলত এটা প্রত্যয় নয়; এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্দেশ ক্রিয়া। তো ব্যাকরণগতভাবে ফতোয়াবাজী শব্দ ব্যবহারে কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষতিটা অন্যখানে। কারণ ফতোয়া ইসলামী আইনের একটি পবিত্র পরিভাষা। পবিত্র এ শব্দটির বিদ্রূপ ব্যবহার কখনো কাম্য নয়। সব শব্দের মূল্যমান এক নয়। সব শব্দের সাথে সব ধরনের শব্দ যোগ করা যায় না। শব্দের ব্যবহারেও নীতি নৈতিকতা রয়েছে। বাজী, বাজ এই শব্দগুলো সাধারণত নীচাশয় ও নিন্দনীয় শব্দের সাথে সংযুক্ত হয়। যেমন ধোঁকাবাজ/বাজী, চাপাবাজ/বাজী, চিটিংবাজ/বাজী ইত্যাদি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ফতোয়ার মতো পবিত্র শব্দটির সাথে বাজ অথবা বাজী শব্দ যোগ করে তার ব্যাপক ব্যবহার খুবই আপত্তিকর। কুরআনবাজী, নামাযবাজী, সংবিধানবাজী, একাত্তরবাজী প্রভৃতি মিশ্র শব্দগুলো যেমন ধর্মীয় ও আইনগত দিক থেকে আপত্তিকর তেমনি ফতোয়াবাজী শব্দটিও চরম আপত্তিকর।

ফতোয়া এবং আইনানুগ ব্যক্তির আইনানুগ মতামত

একটি সরল প্রশ্ন। ফতোয়া কি আইনানুগ ব্যক্তির আইনানুগ মতামত? এক্ষেত্রে যদি আমরা ইংলিশ কিংবা বাংলা বিশ্বকোষগুলো লক্ষ করি তাহলে একটি স্পষ্ট ধারণা চলে আসবে।

এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকায় মুফতী শব্দের অধীনে বলা হয়েছে, Mufti. Arabic MUFTI an Islamic legal authourity who gives a formal legal opinion (Fatwa) in answer to an inquiry by a private individual or judge (B 8/394) অর্থ মুফতী হলো, আরবি (المفتي) মুফতী, ইসলামী আইনানুগ বিশেষ ব্যক্তি যিনি ব্যক্তিগত কিংবা বিচারিক বিষয়ের প্রশ্নের উত্তরে আইনানুগ মতামত ব্যক্ত করে থাকেন।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, ফতোয়া; ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞ অথবা মুফতী (Juriesconsult) কর্তৃক প্রদত্ত বা প্রকাশিত বিধানকে ফতোয়া বলা হয়। বিচারক বা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান ফতোয়ার উদ্দেশ্য। এই ফতোয়ার অনুসরণে বিচারক মোকদ্দমার বিচার করেন। এবং তার ব্যক্তিগত জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করেন।– ২/১৭।

বাংলা পিডিয়ায় বলা হয়েছে, ফতোয়া আরবি শব্দ। ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞ অথবা মুফতী কর্তৃক প্রদত্ত বা প্রকাশিত বিধান। এর উদ্দেশ্য একজন বিচারক বা একজন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দান।– ৭/৭৩

তো এনসাইক্লোপিডিয়ার মুফতীর ইংলিশ সংজ্ঞা থেকে ফতোয়ার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা উৎসারিত হয়। আর তা হলো আইনানুগ ব্যক্তির আইনানুগ মতামত। তবে এই আইন মানব রচিত আইন নয়; আল্লাহ প্রদত্ত আইন।

ইসলামী বিশ্বকোষ ও বাংলাপিডিয়ায় ও ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অভিমতকে ফতোয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ বলা হলেও বস্তুত তিনি ইসলামী আইনানুগ ব্যক্তি। কারণ তিনি ইসলামী আইন মতে ফতোয়া দিতে বাধ্য। তেমনিভাবে ফতোয়ার মাত্রাগত ভিন্নতা বিবেচনায় ফতোয়া প্রার্থী ও তা প্রতিপালনে বাধ্য। কারণ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতের বাধ্যগত ভিন্নতার কারণে ফতোয়ার মাঝেও ব্যবধান ও ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবহেলা ও শিথিলতার কারণে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান কঠিন কিংবা লঘু শাস্তি প্রয়োগ করেন। তবে যেসব ফতোয়া বিশেষত আল্লাহর অধিকার সংশ্লিষ্ট সেসব ব্যাপারে পার্থিব জীবনে নির্দিষ্ট কোনো দণ্ডাদেশ না থাকলেও পরকালে রয়েছে চরম জটিল দণ্ডাদেশ। সে দণ্ডাদেশ থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই। তবে এ ধরনের ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবহেলার কারণে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান উপযুক্ত দণ্ডাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। ফল কথা ফতোয়া ইসলামী আইনানুগ ব্যক্তির আইনানুগ মতামত। মানব রচিত কিংবা দেশীয় আইনের সাথে এ আইনের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। কারণ ইসলামী আইন মানেই ফতোয়া। ইসলামী আইনের আলাদা কোনো সংজ্ঞা নেই। ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থায় যারা বিচার কার্য পরিচালনা করতেন তারা সবাই ছিলেন মুফতী তথা ইসলামী আইনবিদ। দেশের বিজ্ঞ মুফতীরাই বিচারিক পদ অলংকৃত করতেন। কোথাও এর ব্যতিক্রম হলে বিচারক বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুফতীর ফতোয়া গ্রহণ করতেন এবং তদানুযায়ী রায় প্রদান করতেন।

ফতোয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান বলেন, ফতোয়া ইসলামিক রাষ্ট্রের বিচারক ও আইন বিশারদের সুস্পষ্ট মতামতসমূহের এক প্রয়োগিক বহিঃপ্রকাশ।– ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন ৫৯

অন্যদিকে মুসলিম সুলতানী আমলের আইন ব্যবস্থায় মুফতী ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রথম শ্রেণির আইন কর্মকর্তা।

মোহাম্মদ আব্দুল হালিম লিখিত *বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা* গ্রন্থে বলা হয়েছে, ...প্রধান বিচারপতির আদালতের সাথে যুক্ত আরও কতিপয় কর্মকর্তা হলেন নিম্নরূপ-

(ক) মুফতী (MUFTI) : প্রধান বিচারপতি তাকে নির্বাচিত করতেন এবং সুলতান নিয়োগ প্রদান করতেন। তিনি আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করতেন। এবং বিচারক ও মুফতীর মাঝে মতদ্বৈতা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে বিষয়টি সুলতানের কাছে চলে যেত। এবং সুলতান সিদ্ধান্ত দিতেন।– ৩০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'আইন শব্দটি কেবল আইনজীবীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত নয়; এটা জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, বৈজ্ঞানিকগণ মধ্যাকর্ষণের আইনের কথা বলেন, ধর্মতাত্ত্বিকগণ ওয়াহী ভিত্তিক আইনের কথা বলেন।'

অন্য দিকে ইসলামী আইনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'ইসলাম হচ্ছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে।

ইসলাম এক দিকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ককে সমুন্নত করে, অন্য দিকে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অটুট ও অব্যাহত রাখে। মানুষের এই দ্বিবিধ সম্পর্কের পরিগঠন ও পরিশীলনের জন্য ইসলামী শরীয়তে যে সকল নিয়মকানুন ও নীতিমালা বিবৃত হয়েছে তাই ইসলামী আইন।'

আরো বলা হয়েছে, 'আরবি ফিকহ শব্দের প্রয়োগিক অর্থ আইন। কাজেই ইসলামী আইন হচ্ছে, মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে সীরাতে মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিন্যস্ত বিধান।'– ২৩।

জামি'আ রাহমানিয়া থেকে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ ফতোয়া গ্রন্থ ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া এর ভূমিকায় আইন ও ফতোয়া সংক্রান্ত কয়েকটি উদ্যোগ শিরোনামে ফতোয়া ও ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নির্ভর আলোচনায় ফতোয়া ও ইসলামী আইনকে একীভূত করে দেখানো হয়েছে।– ১/১৩

সারকথা ফতোয়া এবং ইসলামী আইন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কখনো ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও দুটি মূলত একই জিনিস। বস্তুগত দিক থেকে এ দুটির মাঝে কোনো ভিন্নতা নেই। কারণ আইনের আভিধানিক অর্থ হলো, কানুন, নীতি, পদ্ধতি। ফতোয়া ও কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস এই দলীল চতুষ্টয়ের আলোকে প্রণীত মানব নীতিমালা।

ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স গ্রন্থে মুসলিম আইন বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি এবং মন প্রাণ আত্মা জীব জগৎ ও ইহ-পরকাল সম্পর্কে মুসলিম জাতির স্বকীয় সামগ্রিক ধারণা, হৃদয়ঙ্গম, উপলব্ধি, সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং নিজস্ব চিন্তাধারা ও অভিমতের নামই মুসলিম আইন বিজ্ঞান।– ২৪।

ফতোয়া গ্রন্থ এবং ইসলামী আইন গ্রন্থ একই অর্থবোধক দুটি ভিন্ন শব্দ। মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান বলেন, সপ্তদশ শতকে সম্রাট আলমগীরের পৃষ্ঠপোষকতায় ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী এর সংকলন করা হয়েছে। এই বিখ্যাত গ্রন্থটি হানাফী মাজহাবের নীতি অনুসারে এই অঞ্চলের মুসলমানদের বিভিন্ন রীতির সাথে সংগতি রেখে সংকলিত হয়েছে। ফলে ইহা এ উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ মুসলিম আইনের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। হেদায়া অপেক্ষা ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীকে উপমহাদেশের বিভিন্ন বিচারালয় এবং প্রিভি কাউন্সিল মুসলিম আইনের অধিকতর গ্রহণযোগ্য উৎস বলে পরিগণিত করেছেন।– পূর্বোক্ত ২৪।

সুতরাং আমরা বলতে পারি ফতোয়া ইসলামী আইনানুগ ব্যক্তির আইনানুগ মতামত। বাধ্যগত বিষয়ের ফতোয়া হলে একজন মুসলিম সে ফতোয়া প্রতি পালনে বাধ্য। প্রতিপালনে অবহেলা হলে পরকালে দণ্ড অবধারিত।

যদি ধরে নেয়া হয়, ফতোয়া কোনো দেশীয় আইনানুগ ব্যক্তির আইনানুগ অভিমত তবে কি সে অভিমত ব্যক্ত করা যাবে না? এ অভিমত ব্যক্ত করতে কি রাষ্ট্রের

অনুমতির প্রয়োজন? একজন মানুষ কি বলতে পারবে না এটা সংবিধান বিরোধী কাজ এটা করো না? এ কথাটুকু বলতে কি তার সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হবে? আইনের কথা বলা তো অপরাধ নয়। সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে আইন প্রয়োগ করা হলো অপরাধ। সরকার অননুমোদিত কেউ আইনানুগ বিচার করলেও সে অপরাধী। কারণ ফতোয়া কিংবা আইনানুগ বিচারের আধিকারিক একমাত্র সরকার অনুমোদিত ব্যক্তি। এছাড়া অন্য কারো এক্ষেত্রে অনধিকার চর্চার অধিকার নেই। তবে আইন ও ফতোয়ার কথা বলার জন্য প্রশাসনিক অনুমতির প্রয়োজন না হলেও আইন ও ফতোয়া সম্বন্ধে সম্যক যোগ্যতা থাকা অবশ্যই জরুরি। তবে সরকার অনুমোদিত ব্যক্তি যদি কাউকে আইনি পরামর্শ দেয় কিংবা আইনের কথা বলে তবে সে আইন মানতে সে বাধ্য নয়। পক্ষান্তরে এ আইনটা যদি বিচারকের আদালত থেকে রায় হয়ে আসে তখন সে এটাকে মানতে বাধ্য।

যদি ধরে নেয়া হয়, ফতোয়া রাষ্ট্রীয় আইনানুগ ব্যক্তির আইনানুগ মতামত। আর এর অর্থ হলো, রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ছাড়া কেউ ফতোয়া ব্যবহার করতে পারবে না। তখন প্রশ্ন হবে সংবিধান কিংবা রাষ্ট্রীয় আইনের কোথাও কি উল্লেখ আছে ফতোয়ার কথা? ফতোয়া যে একটি বিশেষ ইসলামী পরিভাষা এটা তো স্বতঃসিদ্ধ। ফতোয়া ব্যবহারের জন্য ফিকহ ফতোয়ার শাস্ত্রীয় ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক এটাও সর্বজনবিদিত। তো নির্বাহী বিভাগ কিংবা বিচার বিভাগে কি যোগ্যমান এমন মুফতী কর্মকর্তা আছেন? ফতোয়া সেবাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদন দেওয়ার কি কোনো ব্যবস্থা আছে? ফতোয়া সেবা দেওয়ার জন্য কি আলাদা কোনো বিভাগ আছে? এসব যদি না থাকে তবে আইনানুগ ব্যক্তির আইনানুগ অভিমত বলে ফতোয়ার কার্যক্রম বন্ধ করার কি কোনো সুযোগ আছে? আগে বিষয়টার উপস্থিতি দেখাতে হবে। তারপর সংকোচন-বিয়োজন সীমিতকরণ ইত্যকার ব্যাপারাটির কথা। বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে ফতোয়া সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই নেই। তাহলে এটা বাংলাদেশের আইনানুগ ব্যক্তির আইনানুগ অভিমত হয় কি করে?

সুতরাং কারো জন্য আইনানুগ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের আইনানুগ মতামত শিরোনামে ফতোয়ার সংজ্ঞা করে দেশের দারুল ইফতা কিংবা মুফতী মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়াকে বেআইনি সাব্যস্ত করার কোনোই সুযোগ নেই। কারণ মুফতী ফতোয়া প্রয়োগ করে না। তারা শুধু ফতোয়া প্রদান করেন। বাক স্বাধীনতার অন্তরালে যদি অশ্লীল অশ্রাব্য বক্তব্য ও অন্যের পবিত্র অনুভূতিকে আঘাত করা মন্তব্যকে আইনসিদ্ধ বলে চালিয়ে দেওয়া হয় তবে আমাদের এ ফতোয়া প্রদান হবে বাক স্বাধীনতার যথার্থ প্রয়োগ। এখানে কোনো অশ্লীল অশ্রাব্যতা নেই। নেই অন্যের অনুভূতিতে প্রত্যাঘাত জনিত কোনো অনুষঙ্গ।

হদ, তাযীর, কিসাস এবং ফতোয়া

অন্যায়, অপরাধ রোধকল্পে শরীয়ত বিভিন্ন শাস্তির বিধান রেখেছে। এগুলো মূলত তিন প্রকার।

১. ঐ সকল শাস্তি যার ধরন, পরিমাণ ও কার্যকর করার পদ্ধতি সব কিছুই শরীয়তে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে। যেমন ব্যভিচারের দণ্ড, মিথ্যা অপবাদের দণ্ড, চুরি ডাকাতির দণ্ড, ধর্মান্তরিত হওয়ার দণ্ড ইত্যাদি। এ প্রকারের দণ্ডবিধিকে শরীয়তের পরিভাষায় হদ বলা হয়। এর বহুবচন হুদুদ।

২. ব্যক্তির ক্ষত, অঙ্গহানী, কিংবা মৃত্যুর কারণে অপরাধীকে ও শাস্তি স্বরূপ ক্ষত সৃষ্টি, অঙ্গহানী, কিংবা হত্যা করার দণ্ডবিধি। শরীয়তের পরিভাষায় একে কিসাস বলা হয়।

৩. ঐ সকল শাস্তি যার ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নি; বরং এটা দায়িত্বশীল বা কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন, বিনা কারণে অব্যাহতভাবে নামায না পড়ার শাস্তি, রমাযানের মর্যাদা বিনষ্ট করার শাস্তি, ঘুস খাওয়ার শাস্তি, দুর্নীতি ও পণ্যে ভেজাল দেওয়ার শাস্তি ইত্যাদি। আব্দুল কাদের আওদা, আততাশরীউল জিনায়ী ১/৬৩২-৬৩৪। তাযিরের আরেকটি প্রকার হলো তা'দীব। তা'দীব ঐ সামান্য শাস্তি যা অধীনস্তদের তরবিয়াতের জন্য পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করার অনুমতি অভিভাবকদের দেওয়া হয়েছে। যেমন, পিতা সন্তানদের শাসন করেন।

তা'দীব পর্যায়ের সামান্য শাসনের অনুমতি তো অভিভাবকদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাযিরের প্রথমোক্ত প্রকার, হুদুদ এবং কিসাস কার্যকর করার অধিকার জনগণের নেই। এই শাস্তিগুলো কার্যকর করা সরকারের দায়িত্ব। অন্য কেউ যদি এ ধরনের শাস্তি কার্যকর করে তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। মুফতী হুদুদ, তাযির, এবং কিসাসের ফতোয়া বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু তা কার্যকর করার অধিকার মুফতী, মুস্তাফতী কারো নেই। এটা সরকারের কাজ। এটা একটা স্বীকৃত বিধান। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী আইন গ্রন্থ আলহিদায়ায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হদ কার্যকর করা ওলীর দায়িত্ব (ওলী অর্থ রাষ্ট্রপ্রধান বা তার নিয়োগকৃত প্রশাসনিক ব্যক্তি)। এমন কি কোনো মনীব তার কৃতদাসের উপরও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে হদ প্রয়োগ করতে পারবে না।– (২/৫১১) তাতে আরো বলা হয়েছে, হুদুদ কিসাস প্রয়োগ করার জন্য কাউকে সালিস বানানো বৈধ নয়।– (৩/১৪৬) এতে সুস্পষ্ট প্রতিয়মান হয় সালিসী দরবার হুদুদ বা কিসাস প্রয়োগ করার অধিকার রাখে না। অতএব যে ব্যক্তি মাদ্রাসার পাঠ্যভুক্ত কিতাবসমূহ পড়ার সুযোগ পেয়েছে সে আলেম হতে না পারলেও এ বিধানটি তার জানা থাকে। ফলে হুদুদ প্রয়োগকারী সালিসের সমর্থন দেওয়ার মতো ভুল তার হওয়ার কথা নয়। বিভিন্ন জায়গায় গ্রাম্য মাতব্বর কর্তৃক দোররা মারা কিংবা শাস্তি দেওয়ার যে দুঃখবহ ঘটনাগুলো আমাদের দেশে ঘটছে সে সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও সরকার দলীয় লোকদেরও জানা নেই সাধারণ মানুষের জন্য আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া অপরাধ। তদ্রূপ হুদুদ কিসাস প্রয়োগ করা সালিশি দরবারের কাজ নয়; আদালতের কাজ। এ জন্য সরকারের উপর

আবশ্যক হলো শিক্ষা মাধ্যম ও প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে সর্ব শ্রেণীর মানুষকে শরীয়তের এ বিধান সম্পর্কে অবগত করা। পাশাপাশি ব্রিটিশ ফৌজদারি আইন বিলুপ্ত করে শরীয়তের ফৌজদারি আইন প্রতিষ্ঠা করা। যাতে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিসমূহ অকার্যকর না হয়ে যায়। কারণ আল্লাহর হুদুদ দণ্ডবিধি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য কোনো ভূখণ্ডের জন্য আর কিছুই হতে পারে না।

ফতোয়া এবং সালিশি ব্যবস্থা

সালিশ এটা বস্তুত আরবি ثالث (ছালিছ) শব্দের প্রতিরূপ। অর্থ তৃতীয় পক্ষ। সালিশি ব্যবস্থার আরবি নাম তাহকীম। ইংরেজি নাম Arbitration। তাহকীম হলো নিজেদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তৃতীয় কোনো পক্ষকে বিচারক নিয়োগ করা। একজন বিচারকের মাঝে যেসব শর্তের উপস্থিতি অপরিহার্য সেসব শর্তই সালিশের মাঝে থাকা আবশ্যক।– ড. আব্দুল কারীম যাইদান, নিযামুল কাযা ২৪৭-২৪৮। সালিশি দরবার কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের সাথে ফতোয়ার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এমনকি সালিশি করার আধিকারিক কোনো ব্যক্তিকে যদি যথা নিয়মে সালিশ বানানো হয় এবং তিনি সঠিক পন্থায় সালিশি দায়িত্ব পালন করেন তবুও তার রায়কে ফতোয়া বলা যাবে না এবং এটাকে আইনতঃ বিচারও বলা যাবে না। বরং এটা হুকুম, ফয়সালার একটি প্রকার যা বিচারের মানে উত্তীর্ণ নয়। আর ইসলামী বিচার ব্যবস্থার একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধান হলো, হুদুদ ও তাযিরের ক্ষেত্রে সালিশি দরবার চলে না। এর জন্য আদালত প্রয়োজন। কোনো সালিশ বা সালিশি দরবারের মাধ্যমে কাউকে দোররা মারা কিংবা অন্য কোনো শাস্তি প্রদানের অধিকার নেই। ইসলামী বিচার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গ্রন্থাদিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধান হুদুদ, কিসাস, দিয়তের (রক্তপণ) ক্ষেত্রে সালিসী দরবার চলে না। কারণ সালিশ বা তৃতীয় পক্ষের কাজ হলো, বাদী বিবাদীর মাঝে আপোষ মীমাংসা করে দেওয়া। সুতরাং যেসব বিষয় আপোষ মীমাংসা উপযোগী শুধু সেসব বিষয়েই সালিশি দরবার চলে। আর হদ কিসাস আপোষ উপযোগী কোনো বিষয় নয়। সুতরাং এ বিষয়ে সালিশি দরবার চলবে না।– ড. আব্দুল কারীম যাইদান, নিযামুল কাযা ২৪৮। বুঝা গেল, সালিসী দরবারকে ফতোয়া বৈঠক বলা চরম অপরাধ। বস্তুত সাত্যিকারার্থে যদি ফতোয়ার উপর আমল করা হতো তাহলে কোনো সালিশি দরবারের মাধ্যমে কাউকে দোররা মারা হতো না এবং অন্য কোনো শাস্তি প্রয়োগ করা হতো না। আমাদের দেশে প্রচলিত আইনের সালিশ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাদা নীতিমালা রয়েছে। Arbitration তথা সালিস ব্যবস্থা মূলতঃ Nonjudicial (বিচার বিভাগ বহির্ভূত) পদ্ধতিতে মীমাংসা কার্যক্রমের একটি প্রকার। বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির তিনটি ধাপ রয়েছে, (১) আলাপ-আলোচনা (Negotiation), (২) মধ্যস্থতা কার্যক্রম (Mediation or Conciliation), (৩) সালিশ ব্যবস্থা (Arbitration)। আর আধা বিচার ব্যবস্থা নামে একটি বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। এর অধীনে বলা হয়েছে, আধা বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমকে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের পূর্ববর্তী ধাপে বা অধীনে রাখা হলে তা আইনের শাসনের বিরোধী নয়,

কিন্তু একে বিরোধ মীমাংসার চূড়ান্ত পথ/মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলে আইনের শাসনের বিরোধী হবে।− মো. আব্দুল হালিম, বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা ১৬২-১৬৩। আধা বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাকে বিরোধ মীমাংসার চূড়ান্ত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করাকে যেখানে আইনের বিরোধী বলা হয়েছে সেখানে ননজুডিশিয়াল পদ্ধতিতে মীমাংসা কার্যক্রমকে মীমাংসার চূড়ান্ত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যে আইন বিরোধী তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো সালিশি বা পঞ্চায়েতের শাস্তি কার্যকর করার অধিকার নেই। আজকাল সালিশি দরবারের মাধ্যমে শাস্তি কার্যকর করার শরীয়ত পরিপন্থি ও বেআইনি তৎপরতার যেসব ঘটনা ঘটছে তা মূলতঃ সালিশি বিচার ব্যবস্থার ভুল প্রয়োগ। ফতোয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি একে ফতোয়ার ভুল ব্যবহার বলাও ঠিক হবে না। আজ পর্যন্ত কোনো দারুল ইফতা কিংবা কোনো মুফতীর ফতোয়ার ভিত্তিতে এমন কোনো অঘটন ঘটে নি। যা কিছু ঘটেছে সবই গ্রামের মূর্খ লোকদের মাধ্যমেই হচ্ছে। যাদের ফিকহ, ফতোয়া ও রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। এসব ঘটনার সাথে ফতোয়ার মতো মর্যাদাপূর্ণ একটি পরিভাষাকে জড়ানো আদৌ উচিত নয়।

ফতোয়া এবং সংবিধান

ফতোয়া জিজ্ঞাসা এবং তা প্রদান করা একটি মানবাধিকার। কারণ ফতোয়ার মাধ্যমে ধর্মীয় নির্দেশনা জানা ও জানতে চাওয়া মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। ফতোয়া জিজ্ঞাসা এবং ফতোয়া প্রদানের অধিকার যে মানুষের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার তা আমাদের সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় স্বীকৃত। এখানে পঞ্চদশ সংশোধনী সংযুক্ত সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হলো।

১. অনুচ্ছেদ-৪১ : ধর্মীয় স্বাধীনতা। -১) আইন, জন শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে-

ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে-কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

অ্যাডভোকেট এ. কে. এম. মিজানুর রহমান প্রমুখ সম্পাদিত মেট্রোপাবলিকেশন্স ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের সংবিধান [(পঞ্চদশ সংশোধন) আইন-২০১১সহ] পৃ: ২৯।

২. অনুচ্ছেদ-৩৯ : চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা। -১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইলো।

২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জন শৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানী বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে-

ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার এবং

খ) সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।−পূর্বোক্ত ২৮।

৩. অনুচ্ছেদ-[“২ক। রাষ্ট্রধর্ম। − প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।”]− পূর্বোক্ত ৪।

৪. অনুচ্ছেদ-৩২ : জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ। − আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।− পূর্বোক্ত ২২।

সুতরাং ফতোয়ার সাংবিধানিক আইনগত ভিত্তি হলো, (ক) মানবাধিকার, (খ) চিন্তার স্বাধীনতা, (গ) মত প্রকাশের স্বাধীনতা, (ঘ) বাক স্বাধীনতা, (ঙ) ধর্মীয় স্বাধীনতা, (চ) ধর্মচর্চার স্বাধীনতা, (ছ) সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, (জ) সংবিধানের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম -এর সন্নিবেশন।

বাংলাদেশের সংবিধানের এমন কোনো ধারা উপধারা নেই যা ফতোয়া বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং ফতোয়ার উপর আইনি খড়গহস্ত সম্প্রসারণের কোনো সুযোগ নেই। এবং এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ হবে চরম সংবিধান বিরোধী কাজ যা আইনতঃ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে ফতোয়া ছাড়া সাধারণ মুসলমানের ইসলামী শরীয়ত প্রতিপালনের কোনো উপায় নেই। কারণ ইসলাম ও শরীয়তের বিধিবিধান প্রচার-প্রসারের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় এবং সর্বশ্রেণির জনগণের সহজ ও উপযুক্ত মাধ্যম হচ্ছে ফতোয়া। এ জন্য এটি মুসলমানদের সাংবিধানিক অধিকার। উপরন্তু একমাত্র ইসলামী শরীয়তই সকল আধিকারিককে তার অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করেছে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষাই হচ্ছে প্রত্যেক আধিকারিককে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করো। এ জন্য সমাজে যদি ফতোয়ার সঠিক চর্চা ও প্রচলন হয় তাহলে নাগরিকদের মধ্যে অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হবে। সুতরাং সরকার যদি মানবাধিকার রক্ষা এবং হকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগী হয় তাহলে সম্মানিত মুফতীদের ফতোয়ার ব্যপক প্রচার-প্রসারের পদক্ষেপ নেয়া উচিত। দেশের মিডিয়াগুলোকেও এ কাজে ব্যবহার করা কর্তব্য।

আদালতের কাঠগড়ায় ফতোয়া

২০০১ সনে একটি হিল্লা বিয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিচারপতি গোলাম রব্বানী সাহেবের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ সুয়োমোটো রুল জারি করেন। এবং এক পর্যায়ে এসে সব ধরনের ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন। সাথে সাথে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ধর্মপ্রাণ জনগণ। মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত হয়ে উঠে বাংলার রাজপথ। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন বেশ কজন টগবগে যুবক। রব্বানী সাহেবের এ অনাকাঙ্খিত রায়ে কলঙ্কিত

হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়। এক পর্যায়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন যুগসচেতন দুজন মেধাবী আলেম। দীর্ঘ এক দশক পর ২০১১ ইং এর মার্চ মাস থেকে আপিল বিভাগে মামলাটির পূর্ণাঙ্গ শুনানি শুরু হয়। এবং সে মাসের ১৯ তারিখে শুনানি শেষে সংক্ষিপ্ত রায় ঘোষিত হয়। রায়ে বলা হয়, ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া দেয়া যাবে। এবং শিক্ষিত লোকেরাই শুধু ফতোয়া দিতে পারবেন। এবং গ্রহণের বিষয়টি হতে হবে স্বতস্ফূর্ত। কারো উপর কোনো শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না।

জনাব গোলাম রব্বানী সাহেবের পক্ষ থেকে ইসলামের উপর এটিই একমাত্র আঘাত ছিল না। বরং হাইকোর্টে থাকাকালীন তিনি আরো একাধিক মামলায় কুরআন সুন্নাহ বিরোধী রায় দিয়েছিলেন। এমনি একটি মামলা ছিল তালাক পরবর্তী খোরপোষ বিষয়ে। সেটিও আপিল বিভাগে খারিজ হয়ে যায়। জনাব বিচারপতি সাহেব শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য তৎকালীন আপিল বিভাগ কর্তৃক তিরস্কৃত ও হয়েছিলেন। তখনকার বিচারপতি আফজাল সাহেব, বিচারপতি মোস্তফা কামাল সাহেব এবং তাদের সহযোগী বিচারপতি মহোদয়গণ সম্পূর্ণ ধর্মীয় ভাবগাম্ভির্য ও যথাযথ গুরুত্বের সাথে ঐ মামলার শুনানি করেছিলেন। এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শীর্ষ উলামায়ে কেরামের মতামত ও নিয়েছিলেন। সত্যাগ্রহী এসকল আইনজীবীগণ শত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন মুমিনের পবিত্র হৃদয়ে।

এক শ্রেণীর এন জি ও তখন রব্বানী সাহেবের কুরআন বিরোধী রায় বহাল রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। নিজেদের পক্ষে একাট্টা করেছিল বড়ো বড়ো উকিল ব্যারিষ্টারদের। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। প্রধান বিচারপতি এটি এম আফজাল নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ দৃঢ়তার সাথে ঐ কুরআন বিরোধী রায় খারিজ করে দেন। তখনকার সর্ব জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মরহুম ব্যারিষ্টার ইসতিয়াক আহমদ উকিল সাহেবদের পক্ষ থেকে আদালত কর্তৃক উলামায়ে কেরামের মতামত নেয়ার সমালোচনা করে বক্তব্য দিতে চাইলে তাকে কঠোর ভাষায় ধমক দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন তখনকার আপিল বিভাগ। এমন কি জনৈক ব্যারিষ্টার সাহেব কর্তৃক পবিত্র কুরআনের তরজমা পড়ে রেফারেন্স দেয়ার চেষ্টা করলে প্রধান বিচারপতি ঈমানদীপ্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, আপনাকে আল্লাহর কালাম আল্লাহর ভাষায় পড়তে হবে। এরপর তার মেয়ের সহায়তায় ইংরেজি হরফে লিখিত পবিত্র কুরআনের উচ্চারণ পড়তে গিয়ে ব্যারিস্টার সাহেব চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন।

যাহোক আপিল বিভাগে তার শরীয়ত বিরোধী সে রায় বাতিল হয়ে যাওয়ার পর ও থমকে যান নি বিচারপতি গোলাম রব্বানী সাহেব। ২০০১ এর শুরুতে এসে তিনি এক কথায় পুরো শরীয়তকেই নিষিদ্ধ করে দেন। রায় দেন সকল ফতোয়াকে অবৈধ বলে। অথচ কে না জানে ফতোয়া হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। শরীয়তের ছোটো বড়ো সকল ক্ষেত্রের সাথে রয়েছে এর নিবিড় সম্পর্ক।

অতএব ফতোয়া নিষিদ্ধ করা মানেই কাউকে কুরআন সুন্নাহ তথা ধর্মীয় বিধি বিধান জানানো থেকে বারণ করা এবং অনিবার্যভাবে ধর্মীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসার পথকে রুদ্ধ করে দেয়া। তাহলে শরীয়ত থাকল কোথায়?

বস্তুত উচ্চ আদালত থেকে কোনো রায় প্রদান করা হয় যাতে নির্দেশিত ব্যক্তিবর্গ তা মেনে চলে এবং আদালতের উপর শ্রদ্ধাশীল থেকে এর বিপরীত কিছু না করে। কিন্তু ফতোয়া নিষিদ্ধের রায় ঘোষণার পর থেকে তা খারিজ হওয়া পর্যন্ত দশটি বছরে ফতোয়া নিষিদ্ধের রায়ের উপর একজন ব্যক্তি ও কি আমল করেছে। একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ ও কি ঐ রায়ের ভয়ে সম্মানিত মুফতীর নিকট তার প্রয়োজনীয় ধর্মীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা থেকে বিরত থেকেছে? কিংবা বিজ্ঞ মুফতী সাহেব কি রব্বানী সাহেবের রায় তোয়াক্কা করে মানুষকে ধর্মীয় জিজ্ঞাসার জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন? সম্ভবত কোনোটিই ঘটে নি। বরং কুরআন সুন্নাহ বিরোধী ঐ নির্দেশ লজ্ঘিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ বার। প্রকৃত অর্থে একজন ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। কুরআন হাদীস তাকে বলে ধর্মীয় বিষয়ে জানা না থাকলে জ্ঞানীকে জিজ্ঞেস কর। আবার জ্ঞানীর প্রতি নির্দেশ হচ্ছে শরীয়তের কথা গোপন করা যাবে না। জিজ্ঞেসিত বিষয় বলে দিতে হবে। তাহলে মুফতী মহোদয় কি করবেন? তারা দেশের আদালতের কথা শুনবেন না ঐ আদালতসহ সকল আদালতের মহা বিচারক সৃষ্টি কর্তার নির্দেশ পালন করবেন।

মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, বৃটিশরা তাদের রাজত্ব এখান থেকে গুটিয়ে নিলে ও তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে তাদের আইন ও বিচার ব্যবস্থা এখনো বহাল তবিয়তে এখানে বিদ্যমান রয়েছে। অন্যথায় ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় এধরনের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কোনো প্রয়োজন হয় না। বরং শরীয়তের বিচারে ধৃষ্টতাপূর্ণ এ রায় গোড়াতেই বাতিল ও অকার্যকর বলে বিবেচিত হয়। আলহিদায়াসহ ফিকহের বিশাল গ্রন্থগুলোর আদাবুলকাযী (বিচারপতিদের আচরণবিধি) অধ্যায়ে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ রয়েছে যে, কোনো বিচারক শরয়ী পরিপন্থী কোনো রায় প্রদান করলে তা আপনা আপনিই বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

রব্বানী সাহেব তথাকথিত হিল্লা বিয়ের যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ রায় দিয়েছিলেন তা ও কোনো ফতোয়া ছিল না। সেটাকে ফতোয়ার সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। বরং তা ছিল একটি গ্রাম্য সালিস বিচার। তার সাথে হয়তো জড়ানো হয়েছিল সামান্য পড়ুয়া পোষাকধারী কোন ব্যক্তিকে। স্পষ্ট কথা যে কোনো হাতুড়ে চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসাকে বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থাপত্র বলে আখ্যা দিবেন না কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি। রব্বানী সাহেব তার মনোবাসনাকে পরিপূর্ণতার রূপ দেয়ার জন্য প্রদত্ত রায়ে সংসদকে ফতোয়াদাতাদের বিরুদ্ধে শাস্তির আইন ও প্রণয়ন করতে বলেছিলেন। কিন্তু কোনো সংসদই রব্বানী সাহেবের সে কথা আমলে নেয় নি!

ফতোয়ার বৈধতা সংক্রান্ত আপিল বিভাগের সংক্ষিপ্ত রায়ে পাঁচটি ধারা ছিল। প্রথমেই বলা হয়েছিল, আপিল আবেদনটি আংশিক গ্রহণ করার কথা। এরপর বলা হয়েছিল ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া দেয়া যাবে। এবং তা প্রদান করতে পারবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। আর তা গ্রহণ করা না করার বিষয়টি থাকতে হবে ঐচ্ছিক। এরপর চতুর্থ ধারায় বলা হয়েছিল, ফতোয়ার মাধ্যমে কাউকে শারীরিক বা মানষিক শাস্তি দেয়া যাবে না।

এ শর্তগুলো অবশ্য ফতোয়ার সংজ্ঞার মধ্যেই রয়েছে। ফতোয়া দাতাকে যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ শিক্ষিত হতে হবে সেটা তো অনিবার্য একটি শর্ত। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, পার্থিব বিষয়গুলোতে আমরা এজাতীয় শর্ত মেনে চললেও শরীয়তের বিষয়ে অনেকেই তা বেমালুম ভুলে যাই। একজন যত বড়ো বিখ্যাত প্রকৌশলীই হোক না কেন তিনি কোনো ডাক্তারি ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন না। আবার একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কখনো প্রকৌশল বিষয়ে অন্যকে জ্ঞান দেয়ার চিন্তা করেন না। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়াবলিতে আমরা অনেকেই বিশেষজ্ঞ সেজে যাই। আমি একজন আইনজীবী, ধর্মীয় জ্ঞান আমার থাকুক বা না থাকুক এসম্পর্কে মত আমি দিবই। আমি একজন বুদ্ধিজীবী। সুতরাং ধর্মীয় বিষয়ে আমার পড়াশুনা না থাকলেও আমাকে মতামত দিতে হবে। মাদরাসায় সামান্য দু চার ক্লাস পড়েই আমি জটিল শরঈ বিষয়ে মতামত দেয়া শুরু করলাম। এধরনের মানষিকতা এসমাজের অনেকেরই রয়েছে। অথচ অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শরীয়া বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য যে উচ্চাঙ্গের পড়া শোনা থকতে হয় তা আমরা স্মরণে রাখি না। একারণে দুধরনের ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এক দিকে ধর্মের নামে দেয়া যে কোনো ব্যক্তির বক্তব্যকে ফতোয়া আখ্যা দেয়া হয়। অন্য দিকে না জেনে ও ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার খেসারত গুণতে হয় দেশ ও জাতিকে।

ধর্ম প্রাণ মুসলমান আশা করেছিল, মাননীয় আদালত হয়ত ধর্মীয় নীতি ও অনুশাসন বিরোধী রায় দেয়ার ব্যাপারে একটি নিষেধাজ্ঞা প্রদান করবেন। এমনিভাবে যেখানে সেখানে ফতোয়া শব্দের অপ প্রয়োগের ব্যাপারে মিডিয়াসহ অন্যদেরকে সতর্ক করবেন। কারণ এ অপপ্রয়োগ ও অপপ্রচারের কারণেই মূলত ফতোয়ার বাস্তব সংজ্ঞা ও চিত্র অনেকের সামনে অস্পষ্ট থেকে যায়। বরং ফতোয়া নয় এমন বিষয়কে ফতোয়া আখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়।

এছাড়া আরেকটি বিষয়ে সুপ্রম কোর্টের সংক্ষিপ্ত রায়ে কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায় নি। তা হল, হাইকোর্ট যে সুয়োমোটো বা স্বপ্রণোদিত রুল জারি করেছে তা এ পর্যায়ে আইনসিদ্ধ ছিল কি না। কারণ অনেক আইনজীবীই এমন কি কোনো কোনো এমিকাস কিউরি ও বলেছেন যে, এক্ষেত্রে সুয়োমোটর কোনো সুযোগ নেই। যদি তাই হয় তাহলে তো মামলাটি গোড়া থেকেই অবৈধ ছিল।

আপিল বিভাগ রায়ের শেষে বলেছে, হাইকোর্ট যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফতোয়াকে অবৈধ বলেছিলেন সেটি অবৈধ ফতোয়া ছিল। এব্যাপারে প্রথম কথা হল, গ্রাম্য সালিসের সে রায়টি ফতোয়াই নয়। সুতরাং সেটিকে বৈধ বা অবৈধ ফতোয়া বলার

সুযোগ ইসলামী আইনে নেই। দ্বিতীয়ত অবৈধ ফতোয়া বলতে কি বুঝাতে চেয়েছে আপিল বিভাগ। যদি উদ্দেশ্য হয় ফতোয়া নামে সালিসী দরবার হতে যে মতামতটি উঠে এসেছিল, যে তিন তালাক পরবর্তী সময়ে অন্যত্র বিবাহ বন্ধন ব্যতীত পূর্বের স্বামীর সাথে ঘর করা বৈধ নয় ইসলামী আইনের এ উক্তিটিই অবৈধ তবে আমরা আপিল বিভাগের সাথে প্রচণ্ডভাবে দ্বিমত পোষণ করি। কারণ কোনো বিষয়ে অনধিকার চর্চা হলে সে বিষয়টি অবৈধ বা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। এখানে ঘটনা যেটা ঘটেছে সেটা হল, একজন নন মুফতী আলেম ফতোয়া প্রদানে অনধিকার চর্চা করেছেন (যদি তিনি আলেম হয়ে থাকেন এবং ফতোয়া দিয়ে থাকেন)। তবে এখানে স্মৃতব্য, কোনো নির্ভরযোগ্য মুফতী সূত্রে ফতোয়া বলা আর ফতোয়া প্রদান করা এক কথা নয়। মাওলানা উপাধি গ্রহণকারী আজিজুল হক নামের লোকটি মূলত কোন কাজটি করেছিলেন তা আমাদের গোচরে নেই। যদি তিনি মুফতী না হয়ে ফতোয়া প্রদান করে থাকেন তবে তিনি ফতোয়ার ভুল ব্যবহার করেছিলেন। আর যদি কারো সূত্রে নিছক মাসআলা বলে থাকেন তবে তিনি দোষের কিছুই করেন নি। কারণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিজ্ঞ ব্যক্তি সূত্রে যে কারো জন্য ফতোয়া কিংবা আইন বলা দোষের কিছু নয়। দোষ এবং অন্যায় হল, প্রয়োগের দণ্ড হাতে তুলে নেয়া। আর যদি হাইকোর্টের উদ্দেশ্য হয় ফতোয়ার প্রয়োগ এবং ব্যবহার অবৈধ তবে হাইকোর্টের সাথে সমত পোষণ করতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই।

অনেকে ফতোয়াকে বিচারিক রায় বলে তার উপর আইনি খড়গ চালাতে চান। মূলত ফতোয়া কোনো বিচারিক রায় নয়। এতদ সত্ত্বে যদি ধরে নেয়া হয় ফতোয়াএকটি বিচারিক রায় তবুও এর উপর আইনি খড়গ চালানোর কোনো সুযোগ নেই। কারণ বিচারের বহু প্রকার রয়েছে। আদালতে যেটা পরিচালিত হয় সেটাও বিচার। গ্রাম্য সালিসে যেটা চলে সেটাও বিচার। দুটি বিচারই স্ব স্ব স্থানে যথাযথ। প্রশাসনেরপক্ষ থেকে সালিসী বিচারব্যবস্থার উপর কোনোরকম নিষেধাজ্ঞা আরোপকরা হয় নি। সুতরাং এটা বেআইনী কোনো বিচার ব্যবস্থা নয়। বরং এটা আবহমান কাল ধরে চলে আসা গ্রাম বাংলার চিরাচরিত বিচার ব্যবস্থা। এদৃষ্টি কোণ থেকে ফতোয়াকে যদি কেউ গায়ের জোরে বিচারিক রায় বলেন তবুও ফতোয়াকে আক্রান্ত করা যাবে না। কারণ বিচারিক রায় এক কথা আর এর প্রয়োগ আরেক কথা। বিচারিক রায় হয়ে গেলে যে কেউ সে রায় প্রয়োগ করতে পারে না। প্রয়োগের জন্য আইনি ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক। এ প্রয়োগটাই মূল প্রসঙ্গ। বিচার করা মানে সাক্ষী সবুদ সাপেক্ষে আইনী অভিমত প্রকাশ করা। এই অভিমতের ভিত্তিতে প্রশাসন দণ্ড প্রয়োগ করবে। তো বিচারিক রায় দোষের নয়; বরং অন্যায় প্রয়োগটাই দোষের।

জনৈক প্রধান বিচারপতি (যিনি ফতোয়া মামলার বেঞ্চের প্রধান ছিলেন) হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শে আদর্শবান হতে হবে। কারণ রোজ হাশরে তিনি

হবেন প্রধান উকিল ও ব্যারিষ্টার। তিনি আমাদের পক্ষে সকল বিচারপতির প্রধান বিচারপতি আল্লাহ তা'আলার দরবারে ওকালতি করবেন। যদি আমরা তার তরীকার অনুসরণ না করি তাহলে তিনি কিভাবে আমাদের পক্ষে ওকালতি করবেন।"

বিচারপতি তার পেশাগত জীবনে এই আদর্শ ধারণ করেছেন কি না সে প্রশ্নের জবাব দিবে ইতিহাস। তবে তার এ চির সত্য বক্তব্যটি যদি মাননীয় বিচারপতি ও সম্মানিত আইনজীবীগণ ধারণ করেন তাহলে আমাদের আদালত পাড়ার মর্যাদা যে অনেক উঁচু মার্গে উন্নীত হবে এবং পিছিয়ে পড়া দেশ ও জাতি এগিয়ে যেতে পারবে তাতে সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই।

পরিশেষে আমরা আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতিদেরকে ফতোয়া বৈধ বলে রায় দেয়ার জন্য মোবারকবাদ জানাই। যদিও মুসলমানদের কাছে ফতোয়ার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা প্রমাণের জন্য কোনো রায়ের প্রয়োজন হয় না। তথাপি মাননীয় আদালত এক দশকের বেশি সময় ধরে জাতির ঘাড়ে ঝুলে থাকা একটি ভুল রায়ের বোঝা অপসারণ করেছেন।

আপিল বিভাগের এ রায় সতর্ক বার্তা হোক সকলের জন্য এবং ভবিষ্যতে কোনো ব্যক্তি ইসলাম বিরোধী কোনো রায় দেয়ার দুঃসাহস না দেখাক। এটাই পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা। আল্লাহ আমাদের সকলকে সুমতি দান করুন। আমীন!

ফতোয়া প্রদান বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব

সরকারপ্রধান একটি দেশের কোটি মানুষের প্রতিনিধি। সে হিসেবে তার দায়িত্বের শেষ নেই। এ দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালনে সে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি উভয়ের কাছে সমানভাবে দায়বদ্ধ। এ দায়িত্ব পালনে হেরফের হলে পরকালীন কাঠগড়ায় তো দাঁড়াতেই হবে। উপরন্তু ক্ষেত্র বিশেষে জনগণের কাঠগড়া থেকেও সে মুক্তি পায় না। সরকারি দায়িত্বাবলির মধ্য হতে অন্যতম দায়িত্ব হলো, প্রতিটি মানুষকে ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসনে অভ্যস্ত করে তোলা। এতে করে মানুষের মাঝে নীতি নৈতিকতা ও রক্ষণশীলতার বিকাশ ঘটবে। ফলে দেশ থেকে যাবতীয় অন্যায় অনাচার বিদূরিত হবে। দেশ পরিণত হবে সুখী সমৃদ্ধ এক আদর্শবান দেশে। এ জন্য সরকারের কর্তব্য হলো,

১. প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের মাঝে ফতোয়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদের অন্তরে মুফতীর প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা তৈরি করা।

২. ফতোয়া বিভাগ ও ফতোয়া অনুশীলনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদি ও প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা।

৩. ফতোয়া সেবার পথকে মসৃণ ও অবারিত করা এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করা।

৪. বিজ্ঞ মুফতীদের জন্য মুসলমানের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৫. কোনো অযোগ্য ব্যক্তি ফতোয়া দিলে দেশের স্বীকৃত বিজ্ঞ মুফতীদের পরামর্শক্রমে তাকে এ অনধিকার চর্চা থেকে নিবৃত্ত করা।

৬. ফতোয়া বিষয়ে নেতিবাচক যাবতীয় কার্যকলাপ ও প্রপাগান্ডা বন্ধ করা।

৭. দীন ও শরীয়ত বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া শুধু অনুবাদ পড়ে এবং সিডি-ভিসিডি দেখে দীনি বিষয়ে মত প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

৮. ফতোয়ার মতো মর্যাদাপূর্ণ পবিত্র পরিভাষা সম্পর্কে ফতোয়াবাজ, ফতোয়ার শিকার জাতীয় অবমাননাকর শব্দ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

তথ্যসূত্র :

১. আল কুরআনুল কারীম
২. কুতুবে সিত্তা (হাদীস গ্রন্থ ষষ্ঠক) সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ
৩. ইবনুল কাইয়িম আল জাওযী, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন
৪. খতীবে বাগদাদী, আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ
৫. ইবনে আবিদীন, রদ্দুল মুহতার
৬. ফরিদুদ্দীন দেহলভী, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া
৭. আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা
৮. ইমাম নববী, আলমাজমু
৯. জালালুদ্দীন মাহাল্লী, শরহু মিনহাজিত ত্বালিবীন
১০. ইমাম বাইহাকী, আলমাদখাল
১১. আল্লামা আজুররী, আখলাকুল উলামা
১২. আল্লামা শাতিবী, আল মুয়াফাকাত
১৩. আল্লামা কারাফী, আল ফুরুক, আল ইহকাম
১৪. ইবনে মুফলিহ, আল আদাবুশ শরঈয়া
১৫. আবদুল কারীম যায়দান, উসলুদ দাওয়াহ
১৬. ইমাম মারগিনানী, আল হিদায়া
১৭. আব্দুল কাদির আওদা, আততাশরীউল জিনায়ী
১৮. আল্লামা তাকি উসমানী, উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু
১৯. আব্দুল কারীম যায়দান, নিযামুল কাযা
২০. ইবনে ইমাদ, আল মুহিত ফিললুগাহ
২১. ইবনে মানযুর আফরিকী, লিসানুল আরব
২২. আহমদ আল ফাইউমী, আলমিসবাহুল মুনীর
২৩. মুরতাযা যাবিদী, তাজুল আরূস
২৪. আল্লামা মুতাররিযী, আল মুগরিব

২৫. আল্লামা মুনাবি, আত্তাওফীক
২৬. মাজদুদ্দীন ফাইরুযাবাদী, আলকামুসূল মুহীত
২৭. আল্লামা কাল'আজী, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা
২৮. আল মুনজিদ ফিল লুগাহ
২৯. আল মু'জামুল ওয়াসীত
৩০. এনসাইক্লোপিডিয়া অব বৃটানিকা
৩১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ
৩২. বাংলাপিডিয়া
৩৩. ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া
৩৪. মোহাম্মদ আব্দুল হালীম, বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা
৩৫. ইসলামী আইন ও আইনবিজ্ঞান
৩৬. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স
৩৭. এ কে এম মিজানুর রহমান, বাংলাদেশের সংবিধান
৩৮. ইন্টারনেট
৩৯. আলমাকতাবাতুশ শামিলা
৪০. গবেষণা-পত্রিকা মাসিক আল কাউসার, মার্চ ২০১১

প্রসঙ্গ ফতোয়া
সুশীল সমাজ ও মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া

ড. মুহাম্মদ আবদুল হাননান

লেখাটির প্রথমেই 'সুশীল সমাজ' শব্দটির একটি পরিচিতি প্রয়োজন। ইংরেজি 'সিভিল সোসাইটির'-র বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'সুশীল সমাজ'। প্রধানভাবে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিকদের 'সুশীল সমাজ'-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে। যদিও সুশীল সমাজের আরো নানা ব্যাখ্যা আছে এবং আরো ব্যাখ্যা আসতে পারে, আর আসাটাই স্বাভাবিক, তবে আমরা মোটামুটি কাছাকাছি পূর্বোক্ত ধারণাটি নিয়ে আলোচনাটিতে অগ্রসর হতে পারি।

এ প্রসঙ্গে 'ফতোয়া' শব্দেরও একটা পরিচিতি ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আরবি 'ফতোয়া' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'আইন সম্বন্ধীয় মত'। [*বাংলা একাডেমী আরবি-বাংলা অভিধান*, ঢাকা ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৮৬]। তবে ঠিক সাধারণ আইন সম্বন্ধীয় অভিমত নয় ফতোয়া, বরং ধর্মীয় আইনবিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রদত্ত ও প্রকাশিত বিধানকে ইসলামি পরিভাষায় 'ফতোয়া' বলা হয়েছে। [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৭৬]।

ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক উপস্থাপিত কোনো প্রশ্নের শরিয়ত সম্মত উত্তর দান করাই ফতোয়ার মূল উদ্দেশ্য। এতে পূর্ববর্তী নজির, ইংরেজিতে যাকে Precedent বলে, তাকে সামনে রাখা হয়। আর এ কাজটি করতে পারবেন একমাত্র তিনি, ইসলামি পরিভাষায় যাঁকে 'মুফতি' বলা হয়। একজন মুফতি কেবলমাত্র তার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কোনো ফতোয়া দিতে পারেন না, যদিও বিচার-বিশ্লেষণে তাঁর নিজস্ব মত প্রকাশের অবকাশ রাখেন। [*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬]।

ইসলামি শরিয়ায় 'মুফতি' কোনো বিচারক নন, তিনি হচ্ছে Juriesconsult (ধর্মীয় আইন বিষয়ে পরামর্শদাতা)। ইসলামি শরিয়ার বিধান যা 'ফিকহ শাস্ত্র' নামে অভিহিত, মুফতি এই শাস্ত্রে একজন পণ্ডিত এবং একমাত্র তিনিই পারেন ফতোয়া দিতে, আর ধর্ম বিশ্বাসী জনগণের কাছে তাঁর ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবে।

'মুফতি' এবং 'সুশীল সমাজ' সম্পর্কে আমরা এখানে একটা সাধারণ ধারণা পেলাম। এটা নিছক সাধারণ ধারণাই, কারণ এসব শব্দের রয়েছে ব্যাপক তাৎপর্য, যার ভেতরে প্রবেশ বিশদ ব্যাখ্যায় যাওয়া থেকে এই আলোচনায় বিরত থাকা যৌক্তিক মনে হয়েছে।

এখন আমরা দেখতে পারি, এই 'ফতোয়া' সম্পর্কে বাংলাদেশের সুশীল সমাজ ও মিডিয়া কী মনে করে। বাংলাদেশের সুশীল সমাজ ও মিডিয়া 'ফতোয়া' বিষয়ে এই একুশ শতকেও অন্ধকারে রয়েছে। অথবা বলা যায়, জেনেশুনেও ফতোয়া শব্দের অপব্যবহারের বিষয়টা তাঁরা এক রকম উপভোগই করেন। এর ফলে মিডিয়া নিজেরাও মাঝে মাঝে 'ফতোয়া' তৈরি করেন এবং তা প্রচারও করে থাকেন। পরে সুশীল সমাজ এই ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃতি দেন, কলাম লেখেন।

বাংলাদেশে বিগত কয়েক দশকে কয়েকশত 'ফতোয়া' নামক ঘটনা মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে, যা মূলত কোনো ফতোয়াই ছিল না। বিশেষ করে গ্রামবাংলার বিভিন্ন সালিশ বৈঠকের রায়কে ফতোয়া বলে প্রচার করা হয়েছে। গ্রামের চেয়ারম্যান, সমাজের মাতব্বর অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং কোথাও কোথাও মসজিদের সাধারণ ইমাম এসব সালিশ বৈঠকে উপস্থিত থেকেছেন। কিন্তু এদের কেউ 'মুফতি' নন। এদের সম্মিলিত রায়ে কোনো মুফতি উপস্থিত ছিলেন এমন ঘটনা বিরল। অথচ তাদের রায়কে 'ফতোয়া' বলে উল্লেখ করে মিডিয়ায় প্রচার করার ঘটনার তালিকাটি দীর্ঘ।

এ প্রসঙ্গে ১৯৯৩ সালে মৌলভীবাজারের ছাতক ছড়া গ্রামের এক সালিশ বৈঠকের ফয়সালার কথা উল্লেখ করা যায়। এই সালিশে নূরজাহান নামে এক গৃহবধূকে বিয়ে সংক্রান্ত জটিলতার প্রশ্নে কোমর সমান গর্তে দাঁড় করিয়ে ১০১টি পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়। ঘটনাটি সারাদেশকে আলোড়িত করেছিল। মিডিয়া এই সালিশের সিদ্ধান্তকে 'ফতোয়া' বলে প্রচার করে। পরে সুশীল সমাজ এ নিয়ে সারাদেশে তোলপাড় করে ইসলামের ফতোয়া রীতিরই বিরোধিতা করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে নূরজাহান হত্যাকাণ্ডে 'মুফতি' মর্যাদার কেউ জড়িত ছিলেন না, বরং এতে নেতৃত্ব দেন মনির সর্দার নামক এক গ্রাম্য মোড়ল। অথচ এজন্য ইসলামকে এবং তাঁর শরিয়ার বিধানকে দায়ী করা হচ্ছিল।

প্রকৃতপক্ষে সুশীল সমাজ এবং মিডিয়া বারবার এক্ষেত্রে যে ভুলটি করে তাহলো, সালিশ ও ফতোয়াকে তারা এক করে ফেলে। এ কাজটি তারা কখনো করে অজ্ঞতা থেকে, কখনো কখনো করে থাকে ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব থেকে। ফতোয়া'র নাম করে কোনো নারী নির্যাতন বা সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির পেছনে হাক্কানী আলেম-সমাজ অথবা মুফতি শ্রেণির কেউ জড়িত আছেন কি না তা না খুঁজেই তারা এ প্রচারণা চালিয়ে থাকেন।

অবশ্য আমাদের দেশে অতীতের কিছু কিছু ঘটনা এমন আছে যে, রাজনৈতিক আলেম সমাজ তাদের রাজনীতির স্বার্থে অনেক সময় ফতোয়া দিয়েছেন, এ এক কঠিন সত্য বটে। যেমন, পাকিস্তান আমলে ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ বনাম যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে কিছু ফতোয়া প্রচার করা হয়েছিল, যা ছিল বিতর্কিত। যেমন, 'মুসলিম লীগকে ভোট না দিলে বিবি তালাক হয়ে যাবে'। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ১৯৪৬ সালে প্রচারিত মাওলানা শামসুল হক ও শর্ষীনার পীর সাহেবের ফতোয়া, যখন ভারত থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের জন্য ভোট গ্রহণ চলছিল। তাঁরা এ সময় ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, 'মুসলিম

লীগের বিরুদ্ধে ভোট দিলে কোরআন ও সুন্নাহর বরখেলাপ হবে'। এই ফতোয়াই ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ ভিন্নভাবে ব্যবহার করে যে, 'মুসলিম লীগে ভোট না দিলে বিবি তালাক হয়ে যাবে'। [*বাংলাদেশে ফতোয়ার ইতিহাস*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৩৯]।

প্রকৃতপক্ষে এই জন্য ওলামা-হযরতদের দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরা যে বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৯৪৬ সালে ফতোয়া দিয়েছিলেন তাতো যুগ পরিপ্রেক্ষিতে সঠিকই ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগের রাজনীতিকরা (ওলামারা নন) আরো প্রায় ১০ বছর পর তা নিজেদের স্বার্থে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। মুসলিম লীগে অবস্থানকারী কোনো আলেম যদি তখন তা সমর্থনও করে থাকে, তাহলেও তাতে হাক্কানী আলেম-মাশায়েখদের দোষ নেই। কারণ রাজনৈতিক দলে যুক্ত আলেমদের নামের আগে 'মাওলানা' শব্দটি থাকলেও তিনি প্রধানত রাজনীতিকই। তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি তখন অনেক কিছু করতে চাইলে এবং অনেক কিছু বলতে চাইলেও তা দীনের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন। সুশীল সমাজ ও মিডিয়াকে এমন ওলামাকে 'রাজনীতিবিদ' হিসেবেই দেখতে হবে। যেমন, পাকিস্তান আমলের বামপন্থি নেতা প্রফেসর মোজাফফর আহমদ যদি তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থে এমন কথা বলেন, যা সুশীল সমাজের কাছে অগ্রহণযোগ্য, তাহলে তো তাঁরা তখন সকল 'অধ্যাপক-সমাজ'-কে এজন্য সমালোচনা করবেন না। বিষয়টি এমনই যে, কোনো ওলামা যখন রাজনৈতিক দলে যুক্ত থাকেন, তখন তাঁর নামের আগে 'মাওলানা' শব্দ বিশিষ্ট থাকলেও তিনি প্রধানভাবে আসলে রাজনীতিবিদ, সেভাবেই মিডিয়া ও সুশীল সমাজকে বিষয়টি দেখতে হবে, গোটা আলেম সমাজকে এজন্য জড়িয়ে ফেলা যথাযথ হয় না।

অন্যদিকে বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সুশীল সমাজের লোকেরাও অনেক সময় 'ফতোয়া' দিয়েছেন। এসব 'ফতোয়া' না হলেও মিডিয়া একে ফতোয়া হিসেবেই প্রচার দিয়েছে। ১৯৬৮ সালের ১১ই আগস্ট ঢাকায় পাকিস্তান কাউন্সিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেনারেল আইয়ুব খানের দশ বছর পূর্তিতে এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন,

> 'আইয়ুব খান হলেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ (রসুল)'। [পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা, ১২ই আগস্ট ১৯৬৮]।

সুশীল সমাজ এবং রাজনীতিবিদদের কারণে–

১. অকারণে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়ার এমন ঘটনার তালিকা অনেক দীর্ঘ।

২. ১৯৯৪ সালে একজন রাজনীতিবিদ এক অনুষ্ঠানে বলেন, ... (অমুক) ... সরকার শয়তানের বোন। [দৈনিক ইনকিলাব, ২রা অক্টোবর ১৯৯৪]

৩. একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, বিরোধী দল বিসমিল্লাহ খেয়ে ফেলতে চায়। [ভোরের কাগজ, ২রা অক্টোবর ১৯৯৪]

৪. একজন সামরিক নেতা নির্বাচনকে সামনে রেখে চট্টগ্রামের জনসভায় বলেন, আমরা যদি মুসলমান হই, তাহলে ... অমুক মার্কায় ভোট না দিলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। [সংবাদ, ১২ই মে ১৯৯৬]।

অনেক সময় সংবাদপত্র নিজেরাই ফতোয়া দিয়ে থাকে,

৫. ১৯৯৭ সালে একটি পত্রিকা বিশেষ নিবন্ধে উল্লেখ করে, 'বাংলাদেশে ইয়াজুয-মাজুয ও দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে'। [দৈনিক দিনকাল, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৯৭]।

প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নাম ধরে এ প্রচারণা চালানো হয়েছিল।

৬. ১৯৯৮ সালে অন্য এক রাজনীতিবিদ ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, 'সরকারের পতন ঘটানো বাংলাদেশের মুসলমানদের ৬ নম্বর ফরয কাজ'। [সংবাদ, ৩০শে জুলাই ১৯৯৮]।

তালিকাটি দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু এগুলো দেখানো মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য হলো, এটা সুশীল সামাজ ও মিডিয়াকে উপলব্ধি করানো যে, এসব তথাকথিত ফতোয়ার সঙ্গে দেশের হাক্কানী আলেম সমাজের কোনো সম্পর্ক নেই। এসব তথাকথিত ফতোয়া'র পেছনে রয়েছে প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও নগদ লাভ, ধর্ম বা দীন কিংবা শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং সুশীল সমাজ ও মিডিয়ার উচিত হবে, এসব 'ফতোয়া' হিসেবে প্রচার না করা সালিশ, রাজনৈতিক বাহাস ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা। এমনকি 'ফতোয়াবাজ', 'ফতোয়াবাজি' শব্দও এক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই হবে সঙ্গত।

'ফতোয়া' হলো একটি ইসলামি বিধান, যা শরিয়তসম্মতভাবে একমাত্র 'মুফতি' ওলামা-হযরতরাই দেওয়ার অধিকার রাখেন। অন্য কেউ এরকম ফয়সালা দিলেও তাতে 'ফতোয়া' শব্দের ব্যবহার হবে অনৈতিক এবং অগ্রহণযোগ্য। রাষ্ট্র, সরকার এবং জনগণের এটা মানার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজনীয় ৫০০ ফতোয়া

ঈমান-আকীদা

প্রশ্ন ১ : কি কি বিষয়ে ঈমান আনা আবশ্যক?

উত্তর : যেসব বিষয়ে ঈমান আনতে হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

(১) আল্লাহর উপর ঈমান

বস্তুত তিনটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনয়নের পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পায়।

১. আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা।

২. আল্লাহ তা'লার সিফাত তথা গুণবাচক বিষয়াবলিতে বিশ্বাস করা। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি তাঁর গুণবাচক নামসমূহে ব্যক্ত হয়েছে।

৩. তাওহিদ তথা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা।

(২) মালা-ইকা (ফেরেশতা) সম্বন্ধে ঈমান।

ফেরেশতা সম্বন্ধে বিশ্বাস করতে হবে, তাঁরা আল্লাহ তা'লার নূরের এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা পুরুষ ও নয় নারী ও নয়। তাঁরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপু হতে মুক্ত। তাঁরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। আল্লাহ তা'লার নির্দেশের সামান্যতম ব্যত্যয় ও তাঁরা করে না। তাঁরা নানা রকম রূপ ধারণ করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'লা তাঁদেরকে বিপুল শক্তির অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন।

(৩) নবী ও রাসূল সম্বন্ধে ঈমান।

আল্লাহ তা'আলা মানব ও জিন জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। সেই গ্রন্থের ধারক বাহক বানিয়ে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদেরকে জিন ও মানব জাতির কাছে প্রেরণ করেছেন। মানব জাতির এ বিশেষ শ্রেণীকে নবী বা পয়গম্বর বলা হয়। নবীদের মধ্য হতে যাঁরা বিশেষভাবে নতুন আসমানী গ্রন্থের অধিকারী হন তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়। আর যাঁরা নতুন কিতাব প্রাপ্ত হন নি; বরং পূর্ববর্তী নবীদের প্রাপ্ত কিতাব প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন তাঁদেরকে শুধু নবী অভিধায় অভিহিত করা হয়।

নবী রাসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে প্রধানত যেসব বিষয়াবলিতে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা হল,

১. নবীগণ নিষ্পাপ। তাঁদের দ্বারা কোনো ধরনের পাপ সংঘটিত হয় না।

২. নবীগণ মানুষ। তাঁরা আল্লাহ নন, আল্লাহর পুত্র ও নন। এবং তাঁরা আল্লাহর রূপান্তরও (অবতার) নন; বরং তাঁরা আল্লাহর একনিষ্ঠ প্রতিনিধি। জিন ও মানব জাতিকে সৎ পথ প্রদর্শনের জন্যই কেবল তাঁরা পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন।

৩. নবীগণ আল্লাহ তা'আলার বাণী যথাযথরূপে পৌঁছে দিয়েছেন।

৪. নবীদের ক্রমধারা আদম আ. থেকে শুরু হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে পরিসমাপ্ত হয়েছে।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী এবং শেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না। কেউ নবী হওয়ার দাবি করলে সে পিথগামী এবং কাফের বলে বিবেচিত হবে।

৬. নবীগণ নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পবিত্র রওযা মুবারকে জীবিত আছেন। তাঁর রওযায় সালাম দেয়া হলে তিনি শুনতে পান এবং উত্তর প্রদান করে থাকেন।

৭. সমস্ত নবী সত্য ছিলেন। সবার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের পর পূর্ববর্তী নবীদের শরীআত রহিত হয়ে গেছে। এখন কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীআত ও তাঁর আনুগত্যই গৃহীত হবে।

৮. নবীদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলী সত্য। এতে বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গীভূত।

(৪) আল্লাহ তা'আলার কিতাব সম্বন্ধে ঈমান।

আল্লাহ তা'লা মানব ও জিন জাতির দিক নির্দেশনার জন্য নবীদের কাছে তাঁর বাণীসমূহ প্রেরণ করে থাকেন। এ বাণী ও আদেশ নিষেধের সমষ্টিকে কিতাব বা আসমানী গ্রন্থ নামে অভিহিত করা হয়। আল্লাহ তা'আলার কিতাবের উপর ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে প্রধানত যেসব বিষয়াবলিতে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা হল,

১. এ সকল কিতাব আল্লাহ তা'আলার বাণী সমগ্র; মানব রচিত নয়।

২. আল্লাহ যেমন অবিনশ্বর ও চিরন্তন তাঁর বাণীও তদ্রূপ অবিনশ্বর ও চিরন্তন।

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে সর্ব শেষ কিতাব আলকুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ।

৪. কুরআন শরীফ সর্ব শেষ কিতাব। এর পর আর কোনো কিতাব অবতীর্ণ হবে না। কিয়ামত অবধি কুরআনেরই বিধান চলবে। সর্ব শ্রেষ্ঠ এ কুরআনের মাধ্যমে অন্যান্য কিতাবসমূহ রহিত হয়ে গেছে।

৫. কুরআনের সংরক্ষণ কল্পে আল্লাহ তা'লা নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সতুরাং কেউ এর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না।

(৫) পরকাল সম্বন্ধে ঈমান।

পরকাল সম্বন্ধে ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে প্রধানত যেসব বিষয়াবলিতে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা হল,

১. কবর জগতের পশ্নোত্তর সত্য।

২. কবর জগতের আজাব ও শাস্তি বিধান সত্য।

৩. পুনরুত্থান ও হাশর ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য প্রক্রিয়াবলী সত্য।

৪. আল্লাহ তা'আলার বিচার ও হিসাব নিকাশ সত্য।

৫. পাপ পূণ্যের পরিমাপ সত্য।

৬. আমল নামার প্রাপ্তি সত্য।

৭. হাউজে কাউসার (সুমিষ্ট জলাধার) সত্য।

৮. পুল সিরাত (জাহান্নাম পারাপার সেতু) সত্য।

৯. শাফায়াত এবং সুপারিশমালা সত্য।

১০. জান্নাত সত্য।

১১. জাহান্নাম সত্য।

১২. তাকদির বা নিয়তি সম্বন্ধে ঈমান।

তাকদির সম্বন্ধে ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে প্রধানত যেসব বিষয়াবলিতে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা হল,

১. সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা সব কিছু লিখে রেখেছেন।

২. সবকিছু ঘটার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা সেসব কিছু সম্বন্ধে অবহিত থাকেন এবং তাঁর জানা ও ইচ্ছা অনুসারেই সব কিছু সংঘটিত হয়।

৩. তিনি ভাল এবং মন্দ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

৪. আল্লাহ তা'আলা কলম দ্বারা লওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত ফলকে) তাকদিরের সব কিছু লিখে রেখেছেন।

৫. তাকদিরে লেখা আছে বলে মানুষ নিজেকে দায়িত্বহীন মনে করবে না। তেমনিভাবে তাকদিরকে এড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনার বাইরে সে কিছু করে ফেলতে সক্ষম বলে মনে করবে না।

৬. আল্লাহ প্রদত্ত কোনো বিধানই মানুষের সাধ্যের বাইরে নয়। আল্লাহ তা'আলার উপর কোনো কিছু আবশ্যক নয়।– সূরা বাকারা ১৭৭, ২৮৫, ২৮৬, সূরা আম্বিয়া ২৭, ৪৭, সূরা মুদ্দাসসির ২৬, ৩১, সূরা আহযাব ৩৯,৪০, সূরা মায়িদা ৬৭, সূরা হিজর ৯, সূরা তওবা ২৯, সূরা মু'মিন ১০০, সূরা নূহ ২৫, সূরা যুমার ৬৮, সূরা ইয়াসীন ৭৯, সূরা রূম ২৭, সূরা তাকাসুর ২, সূরা বনী ইসরাঈল ১৩, ৩৬, সূরা আ'রাফ ৮-৯, সূরা আলহাক্কা ১৯,২৫ সূরা কাহাফ ৪৯, সূরা কাউসার ১, সূরা নিসা ১১৬, সূরা আলইমরান ১৩৩, সূরা নাজম ১৩-১৫ সূরা আলকারিয়া, সূরা হুমাযা, সূরা ফজর, সূরা ইউসুফ ৬৭, সূরা হাদীদ ২২, সূরা আনয়াম, ৫৯, সহীহ বুখারী হাদীস ৩৪, ৩৫, ৫০, ২২৭৭, ৩০৭২, ৭২৮৭, ৬২০৮, সহীহ মুসলিম হাদীস ১, ৪৬৯, ৪৭২, ১৩৪৭, ৬৩০৬, ৭৩১০, সুনানে তিরমিযী হাদীস ২৪১৭,৪৮০১, ১০৭৭, সুনানে আবু দাউদ ২০৭০, ফাতহুলবারী ৩/৫২, ২৫/৭, আলজামে লি আহকামিল কুরআন ১/১৭৮, মা'আরিফুল কুরআন ১/১৮৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ১/১৫০, ১৫৮, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ১/১৩, ১৪।

প্রশ্ন ২ : ঈমান বিধ্বংসী আকীদা-বিশ্বাস ও আমলগুলো কি কি বিস্তারিত জানতে চাই?

উত্তর : ঈমান বিধ্বংসী আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যক্রমগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. হযরত আবু বকর ও উমর রা. কে বকা দেয়া।

২. আল্লাহর দীদার তথা সাক্ষাৎকে অসম্ভব মনে করা।

৩. আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির ন্যায় শরীর, হাত, পা, এবং চেহারা বিশিষ্ট মনে করা।

৪. অজ্ঞতাবসত ও স্বেচ্ছায় কুফুরী শব্দ উচ্চারণ করা।

৫. কাফের হয়ে যাওয়ার সংকল্প করা।

৬. অকাট্য হারামকে হালাল এবং অকাট্য হালালকে হারাম মনে করা।

৭. 'আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি না' বলে দম্ভোক্তি করা।

৮. 'সে যদি খোদাও হয় তবুও আমি তার থেকে আমার অধিকার আদায় করে ছাড়বো।' এ জাতীয় কথা বার্তা বলা।

৯. 'স্বয়ং আল্লাহই তোর সাথে পারে না। আমি কি করে পারবো' বলা।

১০. 'আমার জন্য আকাশে আল্লাহ আর জমিনে তুমি' বলা।

১১. কেউ মারা গেলে 'আল্লাহ তার মুখাপেক্ষী ছিল কিংবা আল্লাহ এদের উপর জুলুম করেছে' জাতীয় কথা বার্তা বলা।

১২. 'আমি সওয়াব ও আযাবের প্রতি অসন্তুষ্ট ' বলা।

১৩. সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করে 'আমি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা ফেরেশতাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করেছি।' বলা।

১৪. আল্লাহ ও তোমার পায়ের কসম বলে শপথ করা।

১৫. নবীদের ব্যাপারে অপমান ও অসম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা।

১৬. 'যদি আদম আ. গন্দম না খেতেন তাহলে আমরা কেউ দুর্ভাগা হতাম না।' জাতীয় কথা বার্তা বলা।

১৭. 'সুন্নত কি কাজে আসবে?' বলে দম্ভোক্তি করা।

১৮. নেক কাজ করাকে হাঙ্গামা বলে অভিহিত করা।

১৯. 'এত নামায পড়ে কি পেয়েছো' বলে নামাযের প্রতি তাচ্ছিল্য করা।

২০. 'আমার কাছে আল্লাহর তুলনায় নারী জাতি অধিক প্রিয়' বলা।

২১. 'খেল তামাশার কারণে নামায রোজার সময় পাই না' বলা।

২২. মদ জুয়া জিনা ব্যাভিচার হালাল হওয়ার আকাংখা করা।

২৩. যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা আবশ্যক সেসব বিষয়ের কোনো একটিকেও অস্বীকার করা।

২৪. হারাম সম্পদ সদকা করে সওয়াবের নিয়ত করা।

২৫. শরীয়তের কোনো বিষয়কে অবজ্ঞা করা।

২৬. 'অর্থ কড়ির দরকার; ইলম আমল কোনো কাজে আসবে না।' বলা।

২৭. বিসমিল্লাহ বলে মদ পান বা জিনা ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া।

২৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে পশু জবাই করা।

২৯. সত্যিকার আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতকে কাফের বলা।

৩০. কুরআন হাদীসের অকাট্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয় অস্বীকার করা।

৩১. শরীয়তের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা।

৩২. ইবাদত কিংবা সম্মানের উদ্দেশে কবর চুমা দেয়া।

৩৩. আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো নির্দেশকে খারাপ মনে করা এবং তাতে দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা।

৩৪. ফেরেশতা সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করা।

৩৫. কারো মৃত্যুতে আল্লাহর উপর অভিযোগ করা।

৩৬. সত্যপন্থী উলামায়ে কেরামকে দীনের ধারক বাহক হওয়ার দরুণ গালি দেয়া বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা।

৩৭. প্রকাশ্যে পাপ করে তার জন্য গর্ববোধ করা।

৩৮. জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মনে করা।

৩৯. গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদিকে মুক্তির পথ মনে করা।

৪০. ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যদি হয়, কোনো ধর্মে না থাকা, কোনো ধর্মের পক্ষ অবলম্বন না করা, কোনো ধর্মকে সমর্থন দিতে না পারা তবে এটা কুফুরী মতাদর্শ।

৪১. ডারউইনের বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করা।

৪২. ইসলামকে মসজিদ, মাদরাসা এবং ব্যক্তিগত জীবন ব্যবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ মনে করা।

৪৩. ইসলামের মত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মকে সত্য মনে করা।

৪৪. কোনো পীর বুযুর্গকে সর্বত্র উপস্থিত মনে করা।

৪৫. কোনো পীর বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে আহ্বান করা। এবং তিনি শুনতে পান বলে বিশ্বাস করা।

৪৬. কোনো পীর বুযুর্গের মাযারে গিয়ে সন্তান কিংবা কোনো উদ্দেশ্য কামনা করা।

৪৭. কোনো পীর বুযুর্গের নাম ওয়াজিফার মত জপ করা।

৪৮. কোনো পীর বুযুর্গের নামে শিরনী, ছদকা বা মান্নত করা।

৪৯. কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে দোহাই দেয়া বা শপথ করা।

৫০. নক্ষত্রের প্রভাব বিশ্বাস করা বা তিথি পালন করা।

৫১. জ্যোতির্বিদ, গণক বা ঠাকুরের নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা।

৫২. কোনো জিনিস দেখে কু লক্ষণ বা কু যাত্রা মনে করা।

৫৩. কোনো দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা।

৫৪. কোনো পীর বুযুর্গকে লাভ লোকসানের মালিক মনে করা।

৫৫. কোনো পীর বুযুর্গের বাড়ি বা দরগাহকে কা'বা শরীফের মত আদব সম্মান করা।

৫৬. কোনো পীর বুযুর্গের নামে নাক, কান ছিদ্র করা, আংটি পরিধান করা, চুল রাখা বা টিকি রাখা।

৫৭. ব্যারাম-পীড়ার ছুত লাগাকে বিশ্বাস করা।

৫৮. যাত্রা মুখে হাঁচি দেয়াকে কু যাত্রা মনে করা।

৫৯. তেমাথা পথে ভেট দেয়া।

বি. দ্র. উপরে যেসব বিষয়কে কুফুরী বা শিরক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে তা কারো মাঝে পরিলক্ষিত হলেই তাকে কাফের বা মুশরিক বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। কারণ কুফুর শিরকের মাঝে স্তরভিন্নতা রয়েছে। যদিও সব স্তরের কুফর ও শিরক ভ্রষ্টতা এবং যার মাঝে এগুলো বিদ্যমান তাকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য করা হবে। তবুও কুফর শিরকের কোন স্তর কার মাঝে পাওয়া গেলে তাকে কাফের মুশরিক বলা যাবে তা বিজ্ঞ উলামা ও মুফতীগণই নির্ণয় করতে পারবেন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া জায়েয নেই। তাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের শরণাপন্ন হবে।– সূরা শূরা ১১, সূরা কিয়ামাহ ২২,২৩, সহীহ বুখারী হাদীস ১০৭, ৫৫৪, সহীহ মুসলিম ৬৩৩, রদদুল মুহতার ২/৪, ১৫০, ৪/৪৬৩, ৪৬৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৭৯, ৫/৩৪৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ১/১৪১, ১৪৬, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ২৬৮ কেফায়াতুল মুফতী ১/৩২, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২/১০৬, ১০৮, ২০১, নিযামুল ফাতাওয়া ১/১৩৯, ১৮৯, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৬, ৮/১১৩, ১৯২, ফাতাওয়া উসমানী ১/৮৪, ফাতাওয়া আব্দুল হাই লাক্ষবী ৩৪, ফাতাওয়া রশীদিয়া ২/২৬৬, মালাবুদ্দা মিনহু ১২৯, বেহেস্তী জিওর ১/ ৪০, ৪১।

প্রশ্ন ৩ : বিদ'আতের কোনো প্রকার আছে কি? থাকলে তা কী কী?

উত্তর : মূলত শরীয়তের মাঝে নতুন কোনো বিষয় সংযোজনকে বিদ'আত বলা হয়। শরঈ দৃষ্টিতে সমস্ত প্রকৃত বিদ'আতই বিদ'আতে সাইয়্যিয়াহ। তবে শাব্দিক অর্থগত দিক দিয়ে বিদ'আত দুই প্রকার। যথা, (১) বিদ'আতে হাসানা ও (২) বিদ'আতে সাইয়্যিয়াহ। বিদ'আতে সাইয়্যিয়াহ হলো, প্রত্যেক ঐ কাজ যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানাসহ খাইরুল কুরূনে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তীতে মনগড়াভাবে শরীয়তে সংযোজন করা হয়েছে। এ ধরনের সমস্ত বিদ'আত বিদ'আতে সাইয়্যিয়াহ, যা প্রত্যাখ্যাত। আর বিদ'আতে হাসানা হলো, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খাইরুল কুরূনের মাধ্যমে দীনের সহায়ক হিসেবে সংযোজিত কোনো কাজ। মূলত ইহা বিদ'আত নয়। এটাকে বিদ'আতে লুগাবী (শাব্দিক অর্থে বিদা'আত) বলা যায়। অতএব পারিভাষিক সংজ্ঞা বিবেচনায় বিদ'আতের কোনো প্রকারভেদ নেই।– সহীহ মুসলিম; হাদীস ৬৯, সহীহ বুখারী; হাদীস ২৬৯৭, রদ্দুল মুহতার ২/২৯৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২৮৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/২১৪।

প্রশ্ন ৪ : বিদ'আতের কোনো প্রকারভেদ আছে কি না? বিদ'আতে হাসানা এবং বিদ'আতে সাইয়্যিয়াহ-এর প্রকারভেদ কারা করেছেন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু?

উত্তর : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ'আতকে কখনো দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, কখনো পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে শরঈ পরিভাষার দিক দিয়ে সকল প্রকার বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

যারা বিদ'আতকে আভিধানিক সংজ্ঞার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করেছেন তারা হলেন ইমাম শাফেয়ী, ইয ইবনে আব্দুস সালাম, আবূ শামা, ইমাম নববী, ইমাম কারাফী, যুরকানী, ইবনুল জাওযী ও ইবনে আবিদীন রহ. প্রমুখ। তাদের এ ভাগ গ্রহণযোগ্য। তবে পরিভাষায় যাকে বিদ'আত বলা হয় তার মাঝে উক্ত ভাগের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। সুতরাং পারিভাষিক সংজ্ঞা বিবেচনায় বিদ'আতের কোনো প্রকারভেদ নেই। সব ধরনের বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।– সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮২৭, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ৮/২১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/২১৪, ২১৭, মু'জামুল মুসতালাহাত ফিল আলফাযিল ফিকহিয়্যা ১/৩৬২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২৮৫, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪২, কামূসুল ফিকহ ২/২৯২।

প্রশ্ন ৫ : প্রচলিত মিলাদের সূচনা কবে হয়েছে এবং তাতে কিয়াম করার হুকুম কী?

উত্তর : ৬০৪ হিজরিতে বাদশাহ আবূ সাঈদ মুজাফ্ফারের শাসনামলে তার বিশেষ তত্ত্বাবধানে প্রচলিত মিলাদের সূচনা হয়। আর প্রচলিত এ মিলাদের আয়োজন এবং তাতে কিয়াম করা বিদ'আত ও নাজায়েয।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫২২০, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৭৫৪, আলবিদাউল হাওলিয়্যা (আলমাকতাবাতুশ শামিলা সংস্করণ) ১/১৪২, আলবাঈস আলা ইনকারিল বিদা' (আলমাকতাবাতুশ শামিলা সংস্করণ) ১/১১১, আলউরফুশ শাযী (হাশিয়ায়ে ফাতাওয়া মাহমূদিয়া) ৫/৩৭৯, আলজান্নাতু লিআহলিস সুন্নাহ, ৫/৩৭৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/৩৮২,৩৯০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৯৩, খাইরুল ফাতাওয়া ১/৫৫০, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৮৩, ইখতিলাফে উম্মাত আওর সীরাতে মুস্তাকীম; পৃষ্ঠা ৭৮।

প্রশ্ন ৬ : আমাদের দেশে গায়ে হলুদের নামে যে প্রচলিত প্রথা রয়েছে যাতে একদিন বরের বাড়ি থেকে একদল নারী কনের বাড়ি যায়, আরেকদিন কনের বাড়ি থেকে একদল নারী বরের বাড়িতে যায়। অতঃপর অনেক নারী-পুরুষের সম্মিলিত আয়োজনে বর-কনেকে হলুদ মাখানো হয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : আমাদের দেশে গায়ে হলুদের নামে যে প্রথা প্রচলিত তা সম্পূর্ণ হারাম। কারণ এতে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, পর্দাবিধান লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে। উপরন্তু এটা একটা হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরোয়া সংস্কৃতি, যা তারা ধর্মীয় বিধানমতে পালন করে থাকে। সুতরাং মুসলমানদের জন্য এসব অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।– সূরা আহযাব; আয়াত ৩৩, আলী ইবনে সুলতান কারী কৃত মিরকাতুল মাফাতীহ ৮/২২২, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬০, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১৬০, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৮/১৩২, সংসদ বাংলা অভিধান; পৃষ্ঠা ১৬৯।

প্রশ্ন ৭ : যদি কোনো শিয়া বা হিন্দু বিসমিল্লাহ বলে কোনো প্রাণী জবাই করে তাহলে তার জবাইকৃত প্রাণী আমাদের জন্য খাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : জবাইকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য জবাইকারীর তাওহীদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়া শর্ত। সুতরাং হিন্দু কর্তৃক জবাইকৃত প্রাণী হালাল নয়। আর যে সকল শিয়া কুফরী বিশ্বাসে বিশ্বাসী তাদের জবাইকৃত প্রাণীও হালাল হবে না। তবে যাদের মধ্যে কুফরী আকীদা নেই তারা যদি বিসমিল্লাহ বলে জবাই করে তাহলে হালাল হবে।– রদ্দুল মুহতার ৪/১৩৫, ৯/৪২৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৮৫, রদ্দুল মুহতার ৯/৪৩১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/২৮১ আলহিদায়া ৪/৪৩৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৪০২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/৪৪৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/১৭৮।

প্রশ্ন ৮ : আল্লাহ ওয়ালা এবং বুযুর্গানে দীনের উসিলা দিয়ে দু'আ করার বিধান কী?

উত্তর : আল্লাহ ওয়ালা এবং নেককার ব্যক্তিদের উসিলা দিয়ে দু'আ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে। তবে উসিলা দিয়ে দু'আর পদ্ধতি এমন হতে হবে যাতে ঈমান বিধ্বংসী কোনো আকীদা কিংবা বাক্য না থাকে। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মাঝে আকাইদ সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকার ফলে অনেকে এমন শব্দ উচ্চারণ করে ফেলে যাতে ঈমান চলে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। অতএব উসিলা দিয়ে দু'আ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।– সূরা মায়েদা; আয়াত ৩৫, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫২১, ৩৫৭৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৯৭, তারীখে বাগদাদ ১/১১৪, খাইরুল ফাতাওয়া ১/১৯১, ১৯৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৩/১৪৪।

প্রশ্ন ৯ : হাদীসে বর্ণিত কোনো জামে' দু'আ আছে কি না, থাকলে সে দু'আটি কী?

উত্তর : হাদীসের কিতাবসমূহে বেশ কিছু জামে' দু'আ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি নিম্নরূপ,

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

সূরা মায়েদা; আয়াত ৩৫, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫২১, ৩৫৭৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৯৭, তারীখে বাগদাদ ১/১১৪, খাইরুল ফাতাওয়া ১/১৯১, ১৯৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৩/১৪৪।

পদচুম্বন এবং পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা সম্পর্কে ইসলামের দর্শন

প্রশ্ন ১০ : আমার এলাকার একজন আলেমের সঙ্গে পদচুম্বন এবং পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। তিনি আমাকে *ফাতাওয়ায়ে দারুচ্ছুন্নাত* কিতাবের ১৪২ পৃষ্ঠার ফটোকপি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, (হুবহু উল্লেখ করা হলো)

'ছহীহ তিরমিজী শরীফের ২য় খণ্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে- باب ما جاء في قبلة اليد والرجل তিনি স্বীয় কিতাবে একটি অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন যার শিরোনাম হলো, হাত

পা চুম্বন করা শরীয়তে বৈধ কি না? তার অনুকূলে নিম্নে বর্ণিত হাদীছ শরীফ বর্ণনা করেছেন–

আরবি লেখা আছে কিন্তু আমি শুধু বাংলা অনুবাদটি লিখলাম।

অনুবাদ : হযরত ছাফওয়ান বিন আসসাল বর্ণনা করেছেন, জনৈক ইয়াহুদী তার সঙ্গীকে বলল, আমাকে এ নবীর নিকট নিয়ে চলো। তদুত্তরে সাথি তাকে বলল, তুমি তাকে নবী বলবে না কারণ, সে যদি শোনে তুমি তাঁকে নবী বলছ তাহলে সে খুব খুশি হয়ে যাবে। অতঃপর তারা হুযূর আকরাম ﷺ-এর নিকট আসল ও ৯টি নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তদুত্তরে হযরত রাসূল মকবুল ﷺ বললেন, উহা হলো– (১) মহান আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশীদার করো না। (২) চুরি করো না। (৩) যেনা করো না। (৪) যাকে মহান আল্লাহপাক হত্যা করা হারাম করেছেন নাহক ভাবে তাকে হত্যা করো না, নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য কোনো শাসকের কাছে নিও না। (৫) যাদু করো না। (৬) সুদ খেয়ো না (৭) সৎ নর-নারীকে যেনার অপবাদ দিও না। (৮) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করো না। (৯) বিশেষ করে তোমরা ইয়াহুদীরা শনিবার দিন সীমাতিক্রম করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, হুযূর আকরাম ﷺ-এর উক্ত উত্তর শোনা মাত্র তারা উভয়ে হুযূর ﷺ-এর দু'হাত ও দু'পায়ে চুম্বন করল এবং বলল নিশ্চয়ই আপনি নবী। তখন হযরত রাসূল ﷺ তাদেরকে বললেন, কি কারণে তোমরা ইয়াহুদীরা আমার এত্তেবা কর না। তদুত্তরে তারা বলল, দাউদ নবী দোয়া করেছেন হে প্রভু! সব সময় যেন আমার আওলাদে নবী থাকেন। আমরা আপনাকে মান্য করি এ কথা তাদের কানে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহুদীগণ আমাদেরকে হত্যা করবে।

তৎপর উল্লেখ আছে,

ইমাম তিরমিজী বলেছেন, উক্ত সাহাবীর মতো ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ, ইবনে ওমর ও কা'ব বিন মালিক কদমবুসি ও হাতবুসির হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও ছহীহ। অর্থাৎ হাদীছ শরীফখানির ২টি সনদ আছে। এক সনদে হাসান, দ্বিতীয় সনদে ছহীহ। অথবা উসূলীনের মতে, হাসান لذاته ও ছহীহ لِغَيْرِهِ একই পর্যায়ের বিধায় তিনি ইহাকে حَسَنٌ صَحِيْحٌ বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হাদীছটি ইবনে মাজা শরীফে ২৬২ পৃষ্ঠায় ঐ ছাফওয়ান বিন আসসাল হতে বর্ণিত আছে। তবে এবারত নিম্নরূপ-

অতঃপর আরবি আছে এরপর উল্লেখ আছে,

অনুবাদ : হযরত ছাফওয়ান বিন আসসাল বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই ইয়াহুদের একটি গোত্র হুযূর আকরাম ﷺ-এর হাত ও পা মুবারক চুম্বন করেছেন।

আবু দাউদ শরীফ ২/১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে–

অনুবাদ : আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ বিন ঈসা তিনি বলেছেন আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন মাতার বিন আব্দুর রহমান আনাক তিনি বলেছেন আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন উম্মে আবান বিনতে ওয়াজে বিন জারে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যিনি আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দলে ছিলেন। উক্ত দলের প্রধান ছিলেন আশাজ। জারে বলেন, আমরা মদীনা শরীফ পৌঁছে তাড়াহুড়া করে ছাওয়ারী হতে অবতরণ করে হুযূর ﷺ এর হাত পা চুম্বন করতে লাগলাম। আবু দাউদ ২/৭০৯ পৃষ্ঠা।

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন, বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলো, বুজুর্গানে দীনের পদযুগল চুম্বন করা জায়েয।

ইমাম বুখারী (রহ.) তদীয় গ্রন্থ ادب المفرد -এ বর্ণনা করেছেন–

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন হযরত মূসা বিন ইসমাঈল তিনি বলেছেন আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন মাতার বিন আব্দুর রহমান আনাক, তিনি বলেছেন আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ছাবাহ গোত্রের এক মহিলা। তার মশহুর নাম হলো উম্মে আবান বিনতে ওয়াজে। সে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন তার দাদা ওয়াজে বিন আমের বলেছেন, আমরা যখন মদীনা শরীফ এসে পৌঁছলাম শুনতে পেলাম কে যেন বলছে ইনি আল্লাহর রাসূল। আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত-পা যুগলে চুম্বন দিলাম।

উক্ত আদাবুল মুফরাদ কিতাবের ১৪৪ পৃষ্ঠায় আরো লিখিত আছে–

অনুবাদ : ইমাম বুখারী বলেন, আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, আব্দুর রহমান বিন মুবারক তিনি বলেছেন আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান বিন হাবীব তিনি বলেছেন। আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন শো'বা তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ওমর জাকওয়ান থেকে তিনি ছুহাইব হতে তিনি বলেছেন, আমি হযরত আলী (রাঃ) কে দেখেছি হযরত আব্বাসের হাত পা যুগলে চুম্বন করতে।

উপরোক্ত বিষয়ের সত্যতা যাচাই করে এবং এ ব্যাপারে আর কী কী হাদীস আছে তা উল্লেখ করে ইসলামে কদমবুসি এবং পায়ে হাত লাগিয়ে সালামের অবস্থান কী? তা প্রমাণসহ পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়টি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ হাফেজ।

উত্তরঃ ইসলামে কদমবুসি জায়েয বা নাজায়েয উভয় দিকেই মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কিরামের মতামত পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ে হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা-ই সবচেয়ে ইনসাফপূর্ণ এবং যথাযথ। তিনি বলেন, কদমবুসি তথা পদচুম্বন মৌলিকভাবে জায়েয আছে। তবে ফুকাহায়ে কেরাম নাজায়েয বলার কারণ হলো, এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে কখনো কুফ্র শিরকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু বিষয় সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো

নাজায়েয বিষয়ের সংমিশ্রণ না হবে ততক্ষণ কদমবুসি জায়েয থাকবে। আর সংমিশ্রণ হলে জায়েযের সীমা পেরিয়ে নাজায়েযের আওতায় চলে যাবে।

নিম্নে এমন কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো যার সংমিশ্রণে পদচুম্বন নিষিদ্ধ হয়ে যায়,

১. যে ব্যক্তির হাত চুম্বন বা পদচুম্বন করলে তার ভিতরে গর্ব, অহংকার, অহমিকা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা হয় তার জন্য অন্যকে হাত চুম্বন বা পদচুম্বন করার সুযোগ দেওয়া জায়েয নেই।

২. কোথাও যদি এমন আশঙ্কা হয় যে, হস্তচুম্বন বা পদচুম্বন করতে গিয়ে অন্যদের কষ্ট হবে তবে সেখানেও এগুলো জায়েয হবে না। এমনকি এমতাবস্থায় মুসাফাহা পর্যন্ত জায়েয নেই।

৩. যদি হস্তচুম্বন এবং পদচুম্বন জনসম্মুখে উন্মুক্তভাবে করা হয় তবে পরবর্তী প্রজন্ম ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক পদচুম্বনকারীদের অনুসরণ করতে থাকবে। একসময় এটা তাদের প্রথাগত নিয়মে পরিণত হবে। এ অবস্থায় পদচুম্বন থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে' তাবেয়ীদের বিভিন্ন ঘটনা থেকে বুঝা যায়, কখনো কখনো তাঁরা হস্তচুম্বন করেছেন। তবে এটা তাদের নিয়মতান্ত্রিক অভ্যাস ছিল না এবং সকল মজলিসেও তাঁরা এরূপ করতেন না। উপরন্তু কেউ কাউকে এ কাজের প্রতি উৎসাহিতও করতেন না।

সুতরাং এটা তাঁদের থেকে যেভাবে প্রমাণিত হয়েছে ঠিক সেই ভাবে আদায় না করে যদি কেউ এটাকে অভ্যাসে পরিণত করে বা এটাকে খুব গুরুত্বের বিষয় মনে করে তবে এ কাজটি নিষিদ্ধ কাজের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা ফুকাহায়ে কেরামের স্বতঃসিদ্ধ নীতি হলো, কোনো মুস্তাহাব কাজের মাঝেও যদি বাধ্যবাধকতা কিংবা প্রথাগত বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটে তবে সেই মুস্তাহাব কাজও পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে যায়।

সারকথা হলো, যে কাজ যেভাবে প্রমাণিত সে কাজ সেভাবে সীমার ভিতরে থেকে করতে পারলে তা জায়েয হবে। আর সীমা অতিক্রম করলে তা নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে।

আর পায়ে হাত লাগিয়ে সালাম করার ব্যাপারে কথা হলো, এটা ব্রাহ্মণ-হরিজনদের ঘরোয়া সংস্কৃতি হওয়ায় তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কারণ, হাদীসে বিধর্মীদের সাদৃশ্য অবলম্বনের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীসসমূহ স্ব স্ব কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। তবে *আদাবুল মুফরাদ*-এর ৯৭৫ নং হাদীসকে 'যয়ীফ' (ضعيف الاسناد) বলা হয়েছে এবং ৯৭৬ নং হাদীসকে ضعيف الاسناد وموقوف বলা হয়েছে। এবং *ইবনে মাজাহ শরীফের* ৩৭০৫ নং হাদীসকেও 'যয়ীফ' বলা হয়েছে। আর *আবূ দাউদ শরীফের* ৫২২৭ নং হাদীস সম্পর্কে

আব্দুল মুহসিন আব্বাদ কর্তৃক *আবূ দাউদের* যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করা হয়েছে তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শাইখ আলবানী সাহেব বলেছেন, হাদীসটি 'হাসান'। তবে তা উভয় পায়ের উল্লেখ ব্যতীত। তবে *তিরমিযী শরীফের* হাদীসটি সহীহ। হাদীসটি *সুনানে নাসাঈসহ* বহু নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

আর শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর ভাষ্য প্রশ্নে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা *আবূ দাউদ শরীফের* ২য় খণ্ডের ৭০৯ পৃষ্ঠার টীকায় *মিশকাত শরীফের* ব্যাখ্যাগ্রন্থ *আশি'আতুল লুম'আত* সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। তবে *জাওয়াহিরুল ফিকহ* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৯৭ পৃষ্ঠায় *আশি'আতুল লুম'আত* সূত্রে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে,

'যদি কেউ কোনো আলেম বা যাহেদ এর নিকট তার পদচুম্বন করার সুযোগ প্রদানের আবেদন করে তবে সেই আলেম বা যাহেদের তার আবেদনে সাড়া দেওয়া উচিত নয় এবং তাকে চুমু দেওয়ার সুযোগ দেওয়াও উচিত নয়। আর *কুনিয়াহ* নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে এতে কোনো অসুবিধা নেই।'

আলআদাবুল মুফরাদ; হাদীস ৯৭৫, ৯৭৬, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৭০৫, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪০৩১, ৫২২৭, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৭২৮, ৩১৪৪, সুনানে নাসাঈ; হাদীস ৪০৭৮, আব্দুল মুহসিন আব্বাদ কৃত সুনানে আবূ দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১/২, আলমুফহিম (সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) ১৯/৩৮, আদদুররুল মুখতার ৯/৫৫০, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৫০-৫৫১, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলাদ দুর ৪/১৯২, ইমদাদুল মুফতীন; পৃষ্ঠা ১৬৬, ১৬৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬৯, আযীযুল ফাতাওয়া; পৃষ্ঠা ১২৫-১২৭, ইমদাদুল আহকাম ১/২২৭, কিফায়াতুল মুফতী ১/২৩০, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৯৭-৩৯৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/২১৭, জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/১৮৭, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৮, ২০০, ২০১-২০২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/৩৪৫।

প্রশ্ন ১১ : আমাদের দেশে বিভিন্ন মাজারে কবরের উপর গম্বুজ এবং ঘর দেখা যায়। এভাবে কবরের উপর গম্বুজ বা ঘর বানানোর শরঈ বিধান কী?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে কবরের উপর গম্বুজ বা ঘর বানানো জায়েয নেই। সুতরাং আমাদের সমাজে কবর, মাজারের উপর ঘর বা গম্বুজ নির্মাণের যে সংস্কৃতি চালু রয়েছে তা শরীয়ত গর্হিত এবং বিদ'আত।— সহীহ মুসলিম; হাদীস ৯৭০, রদ্দুল মুহতার ৩/১৪৪, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬১০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/৪১৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৭৫০।

প্রশ্ন ১২ : বর্তমান সমাজে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে যে খানার আয়োজন করা হয় তাতে শরীক হওয়ার বিধান কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির বাড়িতে দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে কুলখানি কিংবা কুরআন খানির মাধ্যমে যে খানাপিনার আয়োজন করা হয় তাতে অংশগ্রহণ করা মাকরূহে তাহরীমী ও

বিদ'আত। তবে যদি দিন তারিখ নির্দিষ্ট না করে ঈসালে সওয়াবের (মৃত ব্যক্তিকে সওয়াব পৌঁছানো) উদ্দেশে শুধু সমাজের অভাবী অনাথ লোকদের জন্য খাবারের আয়োজন করা হয় এবং তাতে অংশগ্রহণকারীগণ সদকা গ্রহণের উপযুক্ত হয় এবং দাওয়াতপ্রাপ্ত হয়, তবে তাদের জন্য এতে অংশগ্রহণ করা জায়েয আছে। এর জন্য শর্ত হলো, তাতে আত্মপ্রদর্শন, নাবালেগ শিশুর সম্পদ ব্যবহার এবং অন্যান্য ওয়ারিশদের অনুমতি ব্যতীত তাদের সম্পদ ব্যবহার প্রভৃতি শরীয়ত গর্হিত বিষয়গুলোর উপস্থিতি না থাকতে হবে।— সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩৭৫৪, ৪০৩১, মুসনাদে আহমদ (মাকতাবায়ে শামেলা সংস্করণ) ১১/৫০৫, রদ্দুল মুহতার ৩/১৪৮, ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ৪/৮১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/৩৩৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২৬১।

প্রশ্ন ১৩ : মসজিদে অনেক লোক সমবেত হয়ে একসাথে উচ্চশব্দে যিকির করার বিধান কী?

উত্তর : মসজিদে বা কোনো স্থানে কিছু লোক সমবেত হয়ে উচ্চস্বরে একসাথে যিকির করা জায়েয আছে যদি অন্যদের অসুবিধা না হয়। তবে সমস্বরে যিকির করাকে আবশ্যক মনে করা বিদ'আত।— সূরা বাকারা; আয়াত ১১৪, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৯৮, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ২১/২৫২, ফাতাওয়া রশীদিয়া ১/৩৭১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৫৪, ফাতাওয়া উসমানী ১/২৯০, খাইরুল ফাতাওয়া ১/৩৪৯, কিফায়াতুল মুফতী ২/৫৪।

প্রশ্ন ১৪ : শরীয়তে খতমে খাজেগানের হুকুম কী?

উত্তর : খতমে খাজেগানের মধ্যে যে সমস্ত দু'আ পাঠ করা হয় এবং যে সকল আমল করা হয় সেগুলো সবই শরীয়ত সমর্থিত সওয়াবের কাজ। সুতরাং কোনোরকম বাধ্যবাধকতা ছাড়া খতমে খাজেগান পড়ে দু'আ করা ভালো এবং জায়েয। তবে আবশ্যকীয় মনে করা বিদ'আত।— সহীহ বুখারী; হাদীস ৫০১৭, রদ্দুল মুহতার ২/২৪৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/৩৩০, খাইরুল ফাতাওয়া ১/৩৩৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/৩১০।

প্রশ্ন ১৫ : কোনো কোনো এলাকায় দেখা যায় যে, আযানের আগে মুয়াযযিন দুরূদ শরীফ পড়েন। কোনো কোনো স্থানে দুরূদ এভাবে পড়া হয় 'আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ...।' আযানের আগে দুরূদ পড়ার শরঈ বিধান কী?

উত্তর : দুরূদ শরীফ পাঠ অত্যন্ত মুবারক ও ফযীলতপূর্ণ আমল। কিন্তু আযানের পূর্বে দুরূদ পাঠ করার রীতি কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত নয় এবং সালাফে সালেহীনের যুগেও এর প্রচলন পাওয়া যায় না। তাই নিঃসন্দেহে এটা বিদ'আত। এ থেকে সকলের বেঁচে থাকা অপরিহার্য।— সহীহ বুখারী; হাদীস ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৭১৮, আলবাহরুর রায়েক ১/৪৫৪, খাইরুল ফাতাওয়া ২/২২৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/১১৯।

পবিত্রতা

প্রশ্ন ১৬ : শরীয়তের বিধি বিধান কত প্রকার ও কি কি সংজ্ঞা ও বিধানসহ জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : শরীয়তের বিধানসমূহ মোট আট শ্রেণীতে বিভক্ত।

১. ফরয
২. ওয়াজিব
৩. সুন্নত
৪. মুস্তাহাব
৫. হারাম
৬. মকরুহে তাহরিমী
৭. মকরুহে তানযিহী
৮. মুবাহ বা জায়েয

ফরযের সংজ্ঞা ও বিধান

ফরয আল্লাহ প্রদত্ত এমন বিধান যা সুনিশ্চিতরূপে অকাট্ট দলীলের আলোকে প্রমাণিত, যাতে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। ফরয দুই প্রকার। যথা : ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া।

ফরযে আইন : যে বিধান পালন করা প্রতিটি সাবালক নর নারীর উপর সমভাবে অত্যাবশ্যক।

ফরযে কিফায়া : যে বিধান কতক লোক মিলে পালন করলে তার দায় থেকে সকলেই মুক্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে কেউ না পালন করলে সকলেই ফরয পরিত্যাগ করার দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়। কেউ ফরয বিধান পালন না করলে সে ফাসেক বলে বিবেচিত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে। আর ফরয অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়।

ওয়াজিবের সংজ্ঞা ও বিধান

যে বিধান সুনিশ্চিত দলীলের আলোকে প্রমাণিত নয়; বরং প্রবল ধারণাপ্রসূত দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত তাকে ওয়াজিব বলা হয়। কার্যত ওয়াজিব ফরয বিধানের মতই অবশ্য কর্তব্য। তবে এর অস্বীকারকারী কাফের সাব্যস্ত হবে না।

সুন্নতের সংজ্ঞা ও বিধান

যে কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কেরাম করেছেন, করতে বলেছেন কিংবা সমর্থন করেছেন তাকে সুন্নত বলা হয়। সুন্নত দুই প্রকার। যথা, ১. সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা সুন্নতে হুদা (অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত) ২. সুন্নতে গয়রে মুয়াক্কাদ বা সুন্নতে যায়েদা (সম্পূরক সুন্নত)

সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ এর সংজ্ঞা ও বিধান

যে কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কেরাম নিয়মিত করেছেন এবং বিনা কারণে পরিত্যাগ করেন নি তাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বলা হয়। সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ আমলগত দিক থেকে ওয়াজিবের মত। তবে ওয়াজিবের তুলনায় সুন্নতে মুয়াক্কাদা পরিত্যাগের ক্ষেত্রে গুনাহের পরিমাণটা কম হবে। এবং কোনো কারণে সুন্নতে মুয়াক্কাদা ছুটে গেলে তা পরবর্তীতে কাযা করতে হয় না।

সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদাহ এর সংজ্ঞা ও বিধান

যে কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কেরাম নিয়মিত করেন নি; বিনা কারণে কখনো কখনো পরিত্যাগও করেছেন তাকে সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদাহ বলা হয়। সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদা পালন করলে পূণ্য হবে। তবে পরিত্যাগ করলে কোনো গুনাহ নেই।

মুস্তাহাবের সংজ্ঞা ও বিধান

যে কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম কালেভদ্রে কখনো করেছেন তাকে মুস্তাহাব বলা হয়। এটা আদায় করলে সওয়াব লাভ হবে। না করলে কোনো অসুবিধা নেই। মুস্তাহাবকে মান্দুবও বলা হয়।

হারামের সংজ্ঞা ও বিধান

হারাম আল্লাহ প্রদত্ত এমন নিষিদ্ধ বিধান যা সুনিশ্চিতরূপে অকাট্ট দলীলের আলোকে প্রমাণিত, যাতে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। কেউ যদি হারমকে হালাল মনে করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর বিনা কারণে কেউ হারাম কাজে রত হলে সে ফাসেক বলে বিবেচিত হবে এবং পরকালে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

মাকরূহে তাহরিমীর সংজ্ঞা ও বিধান

যে নিষিদ্ধ বিধান সুনিশ্চিত দলীলের আলোকে প্রমাণিত নয়; বরং প্রবল ধারণাপ্রসূত দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত তাকে মাকরূহে তাহরিমী বলা হয়। কার্যত মকরুহে তাহরিমী হারাম বিধানের মতই অবশ্য পরিত্যাজ্য। তবে এর অস্বীকারকারী কাফের সাব্যস্ত হবে না। যদি কেউ বিনা কারণে মকরুহে তাহরিমী কাজে রত হয় তবে সে ফাসেক হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং পরকালে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

মাকরূহে তানযিহীর সংজ্ঞা ও বিধান

আল্লাহ তা'লা যে কাজ থেকে অনাবশ্যকভাবে নিবৃত্ত হওয়ার কামনা করেন তাকে মাকরূহে তানযিহী বলা হয়। মাকরূহে তানযিহী থেকে নিবৃত্ত হলে পূণ্য হবে। নিবৃত্ত না হলে গুনাহ হবে না।

মুবাহ এর সংজ্ঞা ও বিধান

শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদিত কার্যক্রমকে মুবাহ বলা হয়। স্বাভাবিকভাবে এতে কোনো পূণ্য ও নেই গুনাহ ও নেই। তবে নিয়্যত ও উদ্দেশ্যের ব্যবধানে পূণ্য ও গুনাহ হয়ে থাকে।– মু'জামুল মুস্তালাহাতিল ফিকহিয়্যা ৩/২০২,৩৪৩, কামুসুলফিকহ

৩/২৪৭,২৮৯, ৪/৪৫২, ৫/৮৯, ২৫৬, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১০/২০৫,২০৬, ৩২/৯৫, ২৫/২৭৫, মু'জামুল ফকীহ ৩১৯।

প্রশ্ন ১৭ : অপবিত্রতা কত প্রকার এবং কি কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর: যেসব অপবিত্রতা দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা থেকে শরীর, কাপড় ও খাদ্যবস্তু পবিত্র রাখা একান্ত কাম্য তা দু' ধরনের-

(১) নাজাসাতে গলিজা (কঠোর বিধান সম্পর্কিত অপবিত্রতা)

(২) নাজাসাতে খফিফা (তুলনামূলক শিথিল বিধান সম্পর্কিত অপবিত্রা)

- মানুষের মল মূত্র, মানুষ ও প্রাণী কুলের রক্ত, বীর্য, মদ, সব ধরনের পশুর মল, সব ধরনের হারাম পশুর প্রশ্রাব এবং হাস, মুরগীর বিষ্ঠা হল নাজাসাতে গলিজা।
- গরু, মহিষ, বকরিসহ সকল প্রকার হালাল প্রাণীর পেশাব, কাক, চিলসহ সকল প্রকার হারাম পাখির বিষ্ঠা এবং ঘোড়ার পেশাব হল নাজাসাতে খফিফা।
- হাঁস, মুরগি ও পানকৌড়ি ব্যতীত অন্যান্য হালাল পাখির বিষ্ঠা এবং বাদুর ও চামচিকার মল মূত্র পবিত্র। তেমনিভাবে মশা, মাছি, ছারপোকা এবং মাছের রক্তও পবিত্র।
- তরল নাজাসাতে গলিজা গোলাকৃতির একটি কাঁচা টাকা তথা হাতের তালুর মধ্যবর্তী নিচু অংশ পরিমাণ সহনীয়। এ পরিমাণ অপবিত্র পদার্থ শরীরে কিংবা কাপড়ে লাগলে তা না ধুয়ে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে। তবে বিনা কারণে এভাবে নামায আদায় করা মাকরূহ। তবে অপবিত্রতার পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হলে তা সহনীয় হবে না। এবং তা নিয়ে নামায আদায় করলে নামায হবে না।
- গাঢ় নাজাসাতে গলিজা এক সিকি পরিমাণ তথা ৪.৮৬ গ্রাম পরিমণ সহনীয়। এর অতিরিক্ত সহনীয় নয়।
- নাজাসাতে খফিফা শরীর কিংবা পরিহিত কাপড়ের এক অঙ্গের এক চতুর্থাংশের কম পরিমাণ সহনীয়। জামার হাতা, কলি, কাপড়ের আঁচল, পায়জামার দুটি পার্ট প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ বলে গণ্য হবে।
- পানিতে নাপাকি পতিত হলে সে পানি নাপাক হয়ে যায়। তবে প্রবাহিত পানি অথবা আনুমানিক ১০০ বর্গ হাত বা তার চেয়ে বড়ো কোনো জলাধারে নাপাকি পতিত হলে তা নাপাক হবে না। তবে যদি তাতে নাপাকির রং, গন্ধ অথবা স্বাদ পরিলক্ষিত হয় তাহলে এপানি নাপাক হয়ে যাবে।
- মরদেহ গোসল দেয়া পানি নাপাক।
- পেশাবের অতি ক্ষুদ্র ফোঁটা যা দৃষ্টিগোচর হয় না তাতে শরীর কিংবা কাপড় নাপাক হয় না।

- কুকুর, শুকর, বানর প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট নাপাক।
- বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হলেও তা ব্যবহার করা মাকরূহ।
- সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুরের মত গৃহচারী প্রাণীর উচ্ছিষ্ট তুলনামূলক শিথিল পর্যায়ের মাকরূহ।
- হালাল পশু পাখির উচ্ছিষ্ট পবিত্র।
- মানুষের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। চাই সে যে ধর্মেরই অধিকারী হোক।– সূরা মায়িদা ৩, ৯০, হেদায়া ১/৭২, ৭৪, ৭৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪৬, হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ফাতাওয়া কাযীখান ১/১৯,আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৪০/৯৩, ১০৯, ১১০, রদদুল মুহতার ১/২৯৬, ৩৮০

প্রশ্ন ১৮ : শরীর বা কাপড়ে নাপাকি লাগলে তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি কি? বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

উত্তর:

- গাঢ় নাপাকি শরীরে বা কাপড়ে লাগলে তা এমনভাবে ধৌত করতে হবে যাতে সামান্যতম ছাপ চিহ্নও না থাকে। এক দুবার ধোয়ার ফলে যদি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায় তথাপিও তিনবার ধৌত করা উত্তম এবং মুস্তাহাব। তৃতীয়বার ধোয়ার ফলে যদি ছাপ চিহ্ন বিলুপ্ত না হয় তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।
- তরল নাপাকি কাপড়ে লাগলে তিনবার ধৌত করতে হবে এবং প্রতিবারই খুব ভালো করে নিংড়াতে হবে। ভালো করে না নিংড়ালে কাপড় পবিত্র বলে গণ্য হবে না।
- ওয়াশিং মেশিনে নাপাক কাপড় ধোয়া হলে তা পাক হবে না। বরং তাতে নাপাক কাপড়ের সাথে পাক কাপড় মিলিয়ে ধোয়া হলে সব কাপড়ই নাপাক বলে গণ্য হবে। কারণ ওয়াশিং মেশিনে কাপড়গুলোকে যথাযথরূপে নিংড়ানো সম্ভব হয় না। সুতরাং ওয়াশিং মেশিনে ধোয়ার পূর্বে কিংবা পরে কাপড়গুলোকে যথা নিয়মে ধুয়ে নিতে হবে। তা সম্ভব না হলে মেশিনের ভিতরেই তিনবার পানি ঢেলে যথা নিয়মে নিংড়িয়ে নিবে।
- যদি ড্রাই ওয়াশ কিংবা লন্ড্রিতে কাপড় ধোলাই করা হয় এবং তাতে পাক নাপাক সব ধরনের কাপড়কে এক সাথে ভিজিয়ে রাখা হয় বলে নিশ্চিত হওয়া যায় তাহলে সব কাপড়ই নাপাক বলে গণ্য হবে। এগুলোকে পরবর্তীতে যথা নিয়মে পবিত্র করে নিতে হবে। ধোপাগণ বস্তুত কি পদ্ধতিতে ধোলাই করে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই লন্ড্রিতে কাপড় ধোলাই করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তবে একান্ত কেউ লন্ড্রিতে পাক কাপড় ধৌত করতে দিলে তা

নাপাক বলে ধরা হবে না। পক্ষান্তরে নাপাক কাপড় দিলে তাও পাক বলে গণ্য হবে না।

- বিছানার কোনো এক কোণ অপবিত্র এবং বাকি অংশ পবিত্র হলে পবিত্র অংশে নামায আদায় করা জায়েয আছে।
- বিধর্মীদের ব্যবহৃত কাপড় কিংবা বিছানা না ধুয়ে তাতে নামায আদায় করা মাকরূহ।
- তুলার তৈরি গদি, তোষক, অথবা লেপে যদি মল-মূত্র বা অন্য কোনো অপবিত্র পদার্থ লাগে তাহলে তা পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। যদি নিংড়ানো কঠিন তাহলে ভালভাবে তিনবার পানি প্রবাহিত করতে হবে। প্রতিবার পানি প্রবাহিত করার পর এমনভাবে রেখে দিবে যাতে সমস্ত পানি ঝরে যায়। এরপর আবার পানি প্রবাহিত করবে। এভাবে তিনবার করলেই তা পাক হয়ে যাবে।– রদদুল মুহতার ১/৫৫৮, মারাকিল ফালাহ ১৫১-১৫৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮/২৮৯, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৮৩।

প্রশ্ন ১৯ : তৈজসপত্র, সামানা পত্র কিংবা দ্রব্যসামগ্রীতে নাপাকি লাগলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি কি? জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর :

- থালা, বাসন, কলস, খাট, মাদুর, জুতা এ জাতীয় ব্যবহার্য্য সামগ্রীতে যদি নাপাকি লাগে এবং সেগুলো পানি শোষণ না করে কিংবা করলেও সামান্য পরিমাণ করে তাহলে এগুলো পবিত্র করার ক্ষেত্রে তিনবার ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। এগুলো মাটি দ্বারা মেজে পরিষ্কার করে ফেলা হলেও পাক হয়ে যাবে। তবে এ জাতীয় সামগ্রী নকশীদার হলে তা পূর্বোক্ত নিয়মে ধৌত করতে হবে। নতুবা পাক হবে না। আর যদি সামগ্রীগুলো পানি শোষণ করে নেয়ার মত হয় তাহলে একবার ধুয়ে এমনভাবে রেখে দিবে যাতে সমস্ত পানি ঝরে যায় এবং ফোঁটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে তিনবার ধৌত করলে এসব সামগ্রী পবিত্র হয়ে যাবে।
- জুতা বা চামড়ার মোজায় যদি রক্ত, মল এবং গোবর জাতীয় গাঢ় নাপাক লাগে এবং তা মাটিতে ঘষে বা শুকনো অবস্থায় শক্ত কিংবা ধারালো কিছু দিয়ে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে ফেলা হয় তাহলে তা পাক হয়ে যাবে।
- কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা নাপাক হয়ে যায়। তিনবার ধৌত করলে যদিও পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু সাতবার ধৌত করা উত্তম। আর একবার মাটি দ্বারা ধৌত করে ফেলতে পারলে আরো বেশি উত্তম হবে।– শরহুলবিকায়া ১/১২২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪২, মারাকিল ফালাহ ৩০, ১৬৩, হিদায়া ১/৭২, নসবুর রায়াহ ১/৬৩, ফাতাওয়া হক্কানিয়া ২/৫৭৪, কিফায়াতুল মুফতী ২/৩০৮, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮/৩১৯-৩২২।

প্রশ্ন ২০ : উঠোন ফ্লোর মেঝ প্রভৃতি স্থানে যদি নাপাকি লাগে তবে তা পবিত্র করার উপায় কি? জানতে চাই।

উত্তর :

- উল্লিখিত স্থানগুলো যদি মাটির হয় এবং নাপাকি লাগার পর শুকিয়ে যায় এবং এর ফলে নাপাকির কোনো নিদর্শন না থাকে তাহলে তা পাক হয়ে যাবে। তবে এ শুকনো মাটিতে তায়াম্মুম করা জায়েয নেই।
- উপরোক্ত স্থানগুলো যদি তাৎক্ষণিক পবিত্র করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহলে তাতে এ পরিমাণ পানি প্রবাহিত করে দিবে যাতে পবিত্র হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারনা সৃষ্টি হয়। এতে স্থানগুলো পবিত্র হয়ে যাবে।
- ইট, সিমেন্ট বা পাথর প্রভৃতি দ্বারা পাকা করা স্থানগুলোর বিধান সাধারণ মাটির মতই।
- মাটিতে গজানো ঘাস মাটির মতই শুকিয়ে নাপাকির নিদর্শন চলে গেলে তা পবিত্র হয়ে যায়। তবে কর্তিত ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না।
- গোবর দ্বারা লেপা মাটিতে পাক বিছানা না বিছিয়ে নামায পড়লে নামায হবে না।– হিদায়া ১/৭৪, মারাকিল ফালাহ ১৬৪, শরহুলবিকায়া ১/১২৩, নসবুর রায়া হাদীস ৮৮২।

প্রশ্ন ২১ : খাদ্য দ্রব্য পাক করার নিয়ম কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : মধু, চিনি, শিরা, তেল, ঘি, ডালডা প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যে নাপাকি পড়লে তা পাক করার দু'টি প্রক্রিয়া-

১. দ্রব্যগুলোতে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে জ্বাল দিবে। যখন প্রদত্ত পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে তখন আবার সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে জ্বাল দিবে। এভাবে তিনবার জ্বালালে খাদ্য দ্রব্য পাক হয়ে যাবে।

২. তৈল জাতীয় খাদ্য দ্রব্যে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে তাতে নাড়া চাড়া দিবে। এতে করে তৈলাক্ত পদার্থ উপরে উঠে আসবে। এরপর উপর থেকে তেলটা তুলে ফেলবে। এ প্রক্রিয়ায় তিনবার তেল তুলে ফেলবে। এতে খাদ্য দ্রব্য পাক হয়ে যাবে। তবে যদি নাপাকি পড়ার পর তেল, ঘি, ডালডা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য জমে যায় তাহলে তাতে পানি মিশিয়ে রৌদ্র কিংবা আগুনে আঁচ দিবে। এতে তরল খাদ্য গলে উপরে উঠে আসবে। এরপর উপরোক্ত নিয়মে তিনবার পানি দিয়ে তা তুলে নিলে তা পাক হয়ে যাবে।

   শক্ত খাদ্যদ্রব্যে নাপাকি লাগলে সংশ্লিষ্ট অংশটুকু ফেলে দিয়ে বাকি অংশ আহার করা জায়েয আছে।– রদদুল মুহতার ১/৫৪৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪৫, বাদাইয়ুস সানায়ি' ১/২০৭, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১/৫৪৩, ৮/২৫৮।

প্রশ্ন ২২ : হাউজ বা ট্যাংকিতে যদি নাপাকি পতিত হয় তাহলে তা পাক করার পদ্ধতি কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর :

- হাউজ বা ট্যাংকি যদি আনুমানিক ১০০ বর্গ হাত বা তার চেয়ে বড়ো হয় এবং তাতে নাপাকি পতিত হয় কিংবা কোনো প্রাণী পড়ে মারা যায় তাহলে তার পানি নাপাক হবে না। তবে যদি তাতে নাপাকির রং, গন্ধ অথবা স্বাদ পরিলক্ষিত হয় তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি আনুমানিক ১০০ বর্গ হাতের চেয়ে ছোটো হয় তাহলে নাপাক হয়ে যাবে। অবশ্য ব্যাঙ, কচ্ছপ, কাঁকড়া প্রভৃতি জলজ প্রাণী মরে গেলে তাতে পানি নাপাক হবে না। তবে যদি এসব প্রাণী মরে পঁচে গলে যায় তাহলে সে পানি পান করা বা তা দ্বারা খাবার পাকানো জায়েয হবে না। যদিও উযূ গোসল করা জায়েয হবে।
- সাধারণত হাউজ বা ট্যাংকি দুই ধরনের হয়ে থাকে-

১. আণ্ডার গ্রাউণ্ড ট্যাংকি, যাতে সরকারি পানির লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ হয়।

২. ছাদে বা উপরে স্থাপিত ও নির্মিত ট্যাংকি, যেখান থেকে প্রত্যেক তালায় পানি সরবরাহ হয়। উল্লেখিত উভয় প্রকারের হাউজ বা ট্যাংকিতে এক দিক থেকে পানি প্রবেশ করে আর অন্য দিক দিয়ে ব্যবহারের জন্য পানি সপ্লাই হয়। সুতরাং এতে যদি নাপাকি পতিত হয় তাহলে অধিকাংশ ফিকহবিদদের মতানুসারে এ জাতীয় ট্যাংকির পানি নাপাক হবে না। কারণ এ পানি প্রবাহমান পানির পর্যায়ভুক্ত। তবে যদি সে পানিতে নাপাকির রং, গন্ধ অথবা স্বাদ পরিলক্ষিত হয় তাহলে তা নাপাক হয়ে যাবে। তেমনিভাবে ট্যাংকির উভয় দিক থেকে পানি সরবরাহ কালে যদি নাপাক বস্তু পতিত হয় এবং এক দিকে পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নাপাক বস্তু বহাল থাকে তাহলেও সে পানি নাপাক হয়ে যাবে। হাউজ বা ট্যাংকি পবিত্র করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে-

১. হাউজে পতিত নাপাকি যদি ফেলে দেয়ার মত বস্তু হয় তাহলে তা ফেলে দিবে। এরপর এক দিকের পাইপ দিয়ে পানি প্রবেশ করাবে এবং অন্য দিকের পাইপ দিয়ে পানি বের করে দিবে। এভাবে পানি প্রবাহিত করে দিলে ট্যাংকি বা হাউজের পানি পাক হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি বের করা শর্ত নয়।

২. যদি আণ্ডার গ্রাউণ্ড ট্যাংকি হয় এবং সরকারী পাইপ থেকে পানি এসে ট্যাংকির মুখ থেকে উপচে পড়ে তখন তা পাক হয়ে যাবে। আর যদি উপরে স্থাপিত ট্যাংকি হয় তাহলে টয়লেট, বাথরুম এবং ব্যাসিনসহ ব্যবহার উপযোগী সব লাইন বন্ধ করে দিবে। যাতে নাপাক পানি ব্যবহৃত না হয়। এরপর মেশিনের সাহায্যে তাতে পানি তোলা শুরু করবে। এরপর যখন উপরের পাইপ থেকে পানি উপচে পড়া শুরু হবে তখন ট্যাকির সব পানি পাক হয়ে যাবে। তবে নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার সময় হাউজে যে পরিমাণ পানি ছিল সবটুকু পানি বের করে দিয়ে হাউজ পবিত্র করার প্রক্রিয়া শুরু করা উত্তম।– রদদুল মুহতার ১/৪৩, ৪৫, ৩৩২, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮/৩৩, ৪৫, ৮১-৮৩, আহসানুল ফাতাওয়া ২/২৪৮, আলাতে জাদীদা কে শরঈ আহকাম।

প্রশ্ন ২৩ : নলকূপে যদি নাপাকি পতিত হয় তাহলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি কি?

উত্তর : নলকূপে যদি তুলে ফেলার মত নাপাক বস্তু পতিত হয় তাহলে তা তুলে ফেলবে। এরপর নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার সময় নলকূপে যে পরিমাণ পানি ছিল অনুমাণ করে সে পরিমাণ পানি চাপিয়ে ফেলে দিবে। এতে নলকূপ পাক হয়ে যাবে।

- যদি নলকূপে তরল জাতীয় নাপাকি পতিত হয় তাহলে সমপরিমাণ পানি ফেলে দিলে নলকূপ পাক হয়ে যাবে।
- নলকূপে যদি পায়খানা, গোবর জাতীয় স্থুল নাপাকি পতিত হয় এবং তা তুলে ফেলা সম্ভব না হয় তাহলে নাপাক বস্তুটি মাটিতে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে হবে। এরপর পূর্বের নিয়মে পানি বের করে নলকূপ পাক করতে হবে।– রদদুল মুহতার ১/৩৬৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৮৭, আলাতে জাদীদা কে শরঈ আহকাম।

প্রশ্ন ২৪ : উযূ কত প্রকার ও কি কি? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : উযূ পাঁচ প্রকার

(১) ফরয। নামায, জানাযা নামায, সেজদায়ে তিলাওয়াত এবং কুরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য উযূ করা ফরয।

(২) ওয়াজিব। বাইতুল্লাহ তওয়াফ করার জন্য উযূ করা ওয়াজিব।

(৩) মুস্তাহাব।

১. প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন উযূ করা।

২. ঘুমানোর পূর্বে উযূ করা।

৩. গোসল ফরয হলে গোসল, পানাহার এবং ঘুম ইত্যাদির পূর্বে উযূ করা।

৪. ক্রোধ এসে গেলে উযূ করা।

৫. কোনো গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে উযূ করা।

৬. কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে তিলাওয়াত এবং ইসলামী গ্রন্থ পাঠ করার সময় উযূ করা।

৭. আযান, ইকামত, ওয়াজ, নসীহত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর যিয়ারত, উকুফে আরাফা, সফা মারওয়া, সায়ী প্রভৃতি বর্কতময় কার্যাবলি সম্পাদন করার সময় উযূ করা।

৮. মরদেহ গোসল দেয়া এবং বহন করার পর উযূ করা।

৯. মতবিরোধ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্য উযূ করা। অর্থাৎ নারী দেহ কিংবা গোপনাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ করা। কারণ এসব ক্ষেত্রে উযূ ভাঙ্গা না ভাঙ্গার ব্যাপারে ফকীহদের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে।

১০. নামাযের বাহিরে অট্ট হাসি দেয়ার পর উযূ করা।

(৪) মাকরূহ।

১. উযূ করে উযূ 'আবশ্যক ইবাদত' না করে আবার নতুন উযূ করা।

২. গোসল করে উযূ করা। কারণ গোসল দ্বারাই উযূ সম্পন্ন হয়ে যায়। এরপর আর উযূর প্রয়োজন নেই।

(৫) হারাম।

১. জোর পূর্বক অন্যের পানি দ্বারা উযূ করা।

২. এতিম অসহায়দের পানি নিয়ে উযূ করা।– সূরা মাঈদা ৬, সহীহ বুখারী হাদীস ১৩৫, ২৪৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭২৬, সুনানে তিরমিযী হাদীস ৩৩০, لا يمس القرآن إلا طاهر অর্থ: শুধু মাত্র পবিত্রতা অর্জণ করা ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ.হাদীস- ২৯৬ হাদীসটি সহীহ। আরবের প্রখ্যাত আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানী র. ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (সহী ওয়া যয়ীফুল জামিয়িস সগীর লিল আলবানী ২/১৬১), সুনানে নাসাঈ, হাদীস ২৯২২, মুসনাদে আহমদ হাদীস ৭৫১৩, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৭৮৬, মুসনাদে আহমদ হাদীস ৯৮৬২, রদ্দুল মুহতার ১/১৯৮, ২৯৪, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৩১৫, ৩১৬, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ২/২৩, মাসায়েলে উযূ ৩৭, মাসায়েলে গোসল ৪৮।

প্রশ্ন ২৫ : উযূর ক্ষেত্রে কি কি বিষয় ফরয বা আবশ্যক? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : উযূর ক্ষেত্রে চারটি বিষয় ফরয। যথা,

১. সমস্ত চেহারা একবার ধৌত করা।

২. উভয় হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা।

৩. মাথার এক চতুর্থাংশ একবার মাসাহ করা।

৪. উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত চারটি ফরযের কোনো একটি সম্পন্ন না করলে কিংবা অঙ্গগুলোর কোনো একটি চুল পরিমাণ শুকনা থেকে গেলে উযূ সম্পন্ন হবে না।– সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৬।

প্রশ্ন ২৬ : উযূর ক্ষেত্রে কি কি বিষয় সুন্নত জানতে আগ্রহী।

উত্তর : উযূর ক্ষেত্রে যেসব বিষয় সুন্নত তা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. পবিত্রতা অর্জন ও নামাযের উদ্দেশে নিয়্যত করা।

২. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে উযূ আরম্ভ করা।

৩. আলাদাভাবে উভয় হাত তিনবার ধৌত করা।

৪. মিসওয়াক করা।

৫. তিনবার কুলি করা।

৬. তিনবার নাকে পানি দেয়া এবং নাক পরিষ্কার করা।

৭. প্রত্যেক অঙ্গকে পূর্ণাঙ্গভাবে তিনবার ধৌত করা।

৮. দুই হাত ব্যবহার করে মুখাবয়ব ধৌত করা।

৯. ঘন দাঁড়ি খিলাল করা।

১০. হাত ও পা ধৌত করার সময় আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।

১১. একবার সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা।

১২. যথাযথরূপে উভয় কান মাসাহ করা।

১৩. উযূর অঙ্গসমূহ হাত দ্বারা ঘষে মেজে মাসাহ করা।

১৪. এক অঙ্গ ধোয়ার পর অন্য অঙ্গ ধৌত করতে বিলম্ব না করা।

১৫. অঙ্গসমূহ ধৌত করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

১৬. অঙ্গসমূহ ধৌত করার ক্ষেত্রে ডান দিককে প্রাধান্য দেয়া।

১৭. কনকনে শীতের মাঝেও অঙ্গসমূহ উত্তমরূপে ধৌত করা।

১৮. উযূর মধ্যে নিম্নোক্ত দুআটি পঠ করা: اللهم اغفرلى ذنبى و وسع لى فى دارى وبارك لى فى رزقى এবং উযূ শেষে কালিমায়ে শাহাদত পাঠ করা। অতঃপর এ দু'আ পড়া- اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين।– সহীহ বুখারী হাদীস ১৫৯, ১৬৮, ১৮৫, ৬৬৮৯, সহীহ মুসলিম হাদীস ২৩৪, ৩২৬, ২৪৩, ২৫১, সুনানে নাসাঈ হাদীস ৭৮, মুসনাদে আহমদ হাদীস ৯২১৬, সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস ১০৭৭, সহীহ ইবনে খুজাইমা হাদীস ১১৮, সুনানে আবু দাউদ হাদীস ১৩৭, সুনানে তিরমিযী হাদীস ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৫১, ৫৫, আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ লিবনিসসুন্নী, হাদীস ২৮।

প্রশ্ন ২৭ : উযূর ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মুস্তাহাব? অনুগ্রহপূর্বক জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : উযূর মুস্তাহাব বিষয়গুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. উঁচু স্থানে বসা।
২. কি্বলামুখী হয়ে বসা।
৩. যথাসম্ভব অঙ্গসমূহ ধৌত করা বা মাসাহ করার ক্ষেত্রে অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করা।
৪. জাগতিক কথা বার্তা না বলা।
৫. নিয়্যতের ক্ষেত্রে বাক ও হৃদয়ের সমন্বয় করা।
৬. পরিহিত আংটিকে এদিক ওদিক নাড়া চাড়া করে নিচে পানি পৌঁছিয়ে দেয়া।
৭. কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করা।
৮. নাক পরিস্কার করার ক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহার করা।
৯. উযূ সম্পন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা।
১০. প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা।
১১. কান মাসাহ করার সময় কনিষ্ঠাঙ্গুলি কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে দেয়া।
১২. গড় গড় করে কুলকুচা করা।
১৩. নামাযের সময় আসার পূর্বে উযূ করা নেয়া।
১৪. শীত কালে উযূ করার পূর্বে পদযুগলকে ভিজিয়ে নেয়া।
১৫. নিজের জন্য বিশেষভাবে ওযুর পাত্র নির্দিষ্ট করে না রাখা এবং তাতে ব্যবহারাধিকার সংরক্ষিত না রাখা।
১৬. পবিত্র জায়গায় বসে উযূ করা।
১৭. পানি ঢেলে নেয়ার মত পাত্র হলে পাত্রটি বাম দিকে রাখা এবং তুলে নেয়ার মত পাত্র হলে পাত্রটি ডান দিকে রাখা।
১৮. তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতরের অংশ মাসাহ করা।
১৯. উযূ সম্পন্ন করার পর দু রাকাআত তাহিয়্যাতুল উযূ নামায আদায় করা।
২০. ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থেকে খিলাল আরম্ভ করা।

উল্লেখ্য, উযূর মাঝে ও শেষে পঠিত বিভিন্ন দু'আ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু ইবনে হিব্বান, কানযুল উম্মাল ৪/২৪৫/২৬৯৯২ এবং জামিউল আহাদীস ৩০/৩৪৭/৩৩৩২৭ সূত্রে ফিকহের বিভিন্ন কিতাবে উযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে চমকপ্রদ মাহাত্ম সম্বলিত যে বিভিন্ন দু'আ রয়েছে তা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমৃদ্ধ নয়। বরং হাদীস বিশারদগণ এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে জাল বলে

অভিহিত করেছেন। তাই এ দু'আগুলোকে মাসূর বা মাসনূন মনে করার কোনো সুযোগ নেই। তবে দু'আগুলোর অর্থ যেহেতু সুন্দর তাই কেউ যদি উযূর সময় অর্থের দিকটি বিবেচনা করে দু'আগুলো পাঠ করে তবে তার অবকাশ আছে বলে মনে হয়।– আল ইলালুল মুতানাহিয়া ১/৩৩৮, আল ফাওয়াইদুল মাজমু'আ ১/১৩, তাজকিরাতুল মাউযূ'আত ১/১৪, তানযীহুস শরী'আহ ২/৮০ আস সি'আ ইয়া ফি কাশফি মা ফি শরহিল বিকাইয়া ১/১৮১, হাশিয়াতুত তহতাবী আলাদ দুর ১/৭৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৭, ৮, ৯, আদ দুরুল মুখতার ১/২৫৬, নুরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ১/৫, রদ্দুল মুহতার ১/২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ৭৮, ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া ১/৩৭৮।

প্রশ্ন ২৮ : কি কি কারণে উযূ মাকরূহ হয় জানতে চাই।

উত্তর : উযূ মাকরূহ হওয়ার কারণসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো -

১. উযূর অঙ্গগুলো ধোয়ার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করা।
২. অপরিস্কার ও অপবিত্র স্থানে বসে উযূ করা।
৩. উযূ করা অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় জাগতিক কথা বার্তা বলা।
৪. চেহারা কিংবা উযূর অঙ্গসমূহে সজোরে পানি প্রক্ষেপ করা।
৫. বিনা কারণে তিন বারের অধিক কোনো অঙ্গ ধৌত করা।
৬. ডান হাতে নাক পরিষ্কার করা।
৭. প্রথমে বাম হাত অথবা বাম পা ধৌত করা।
৮. পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অমিতব্যয়ী হওয়া।
৯. নতুন পানি ব্যবহার করে তিন বার মাসাহ করা।
১০. নারীদের ব্যবহৃত পানির অবশিষ্ট পানি দ্বারা উযূ করা।
১১. মসজিদের ভিতরে উযূ করা।
১২. থুথু, কফ, শ্লেষা পানিতে ফেলা।
১৩. পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিনা প্রয়োজনে ব্যয়কুণ্ঠ হওয়া।
১৪. বিনা প্রয়োজনে উযূ করার সময় অঙ্গসমূহ ধৌত করা বা মাসাহ করার ক্ষেত্রে অন্যের সহায়তা গ্রহণ করা।– আদ দুররুল মুখতার ১/২৫৯, ২৬০, ফতাওয়া তাতারখানিয় ১/২৩০, হাশিয়াতুত তহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৮০, ৮১, নুরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ১/৬।

প্রশ্ন ২৯ : কি কি কারণে উযূ ভেঙ্গে যায়? জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : উযূ ভাঙ্গার কারণসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. মলদ্বার অথবা প্রশ্রাবদ্বার দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া

২. ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পূঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।

৩. বিনা রক্তে সন্তান প্রসব হওয়া।

৪. মুখ ভরে বমি করা।

৫. থুথুর সাথে রক্তের পরিমাণ সমান অথবা বেশি হওয়া।

৬. উন্মাদ হওয়া।

৭. মাতাল হয়ে যাওয়া।

৮. অচেতন হওয়া।

৯. নামাযে অট্ট হাসি দেয়া।

১০. চিত, কাত হয়ে কিংবা হেলান দিয়ে ঘুম দেয়া।– সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৬, সহীহ বুখারী হাদীস ১৩৫, সুনানে তিরমিযী হাদীস ৩৩০, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস ৩৮৬, ৪৭৭, মুসনাদে আহমদ হাদীস ২৩১৫, কিতাবুল আসার ১/২১২/১৬৪, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৩৭২, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস ১৩৭৪, সুনানে দারাকুতনী হাদীস ২৭, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৩৬৫, ৩৬৯।

প্রশ্ন ৩০ : গোসল কত প্রকার ও কি কি? জানতে চাই।

উত্তর : গোসল পাঁচ প্রকার। যথা,

১. ফরয।

(ক) সহবাস পরবর্তী গোসল।

(খ) ঋতুশ্রাবোত্তর গোসল।

(গ) প্রসূতি হতে পবিত্র হওয়ার গোসল।

২. ওয়াজিব।

(ক) মৃত ব্যক্তির গোসল।

(খ) অপবিত্র অবস্থায় বিধর্মী ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণোত্তর গোসল।

(গ) ঋতুশ্রাবের মাধ্যমে যৌবনে পদার্পণকারিনী নারীর জন্য ঋতুশ্রাবোত্তর গোসল করা।

(ঘ) স্বপ্নদোষের মাধ্যমে যৌবনে পদার্পণ কারী যুবকের জন্য গোসল করা।

৩. সুন্নত।

(ক) জুমু'আর দিন গোসল করা।

(খ) দুই ঈদের দিন গোসল করা।

(গ) আরাফার দিন গোসল করা।

(ঘ) ইহরামের সময় গোসল করা।

৪. মুস্তাহাব।

(ক) ইসলাম গ্রহণ করে গোসল করা।

(খ) বয়স বিবেচনায় সাবালক হলে গোসল করা।

(গ) মানসিক ব্যধি হতে সুস্থ হয়ে গোসল করা।

(ঘ) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা।

(ঙ) মদীনা শরীফে প্রবেশ করার জন্য গোসল করা।

(চ) মুজদালিফায় অবস্থান করার জন্য গোসল করা।

(ছ) তওয়াফে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য গোসল করা।

(জ) সালাতুল কুসুফের জন্য গোসল করা।

(ঝ) সালাতুল ইস্তিস্কার জন্য গোসল করা।

৫. মুবাহ। নিছক শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও মানষিক প্রফুল্লতা লাভের জন্য গোসল করা।– সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯১, ৩৩০, সুনানে তিরমিযী, হাদীস ২৫৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬, ২০১, ২১৬, নুরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ১/৮, মাসায়েলে নামায ২৮।

প্রশ্ন ৩১ : গোসলের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় ফরয? জানতে আগ্রহী।

উত্তর : গোসলের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় ফরয।

১. যথাযথভাবে কুলি করা।

২. নাকে পানি দেয়া।

৩. ভালভাবে গোটা শরীরে পানি প্রবাহিত করে দেয়া।– সূরা মায়িদা আয়াত নং ৬, সুনানে তিরমিযী, হাদীস ১০৩, রদ্দুল মুহতার ১/১৫১।

প্রশ্ন ৩২ : গোসলের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় সুন্নত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : গোসলের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়গুলো সুন্নত তা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. ফরয গোসলে পূর্বে প্রশ্রাব করা।

২. শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পাঠ করা।

৩. আলাদাভাবে উভয় হাত কব্জিসহ ধৌত করা।

৪. শরীর কিংবা কাপড়ে কোথাও নাপাকি লেগে থাকলে প্রথমে তা তিনবার ধুয়ে পবিত্র করে নেয়া।

৫. গুপ্তাঙ্গ ধৌত করা। এরপর দুই হাত ধৌত করা।

৬. সুন্নত পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ উযূ করা।

৭. প্রথমে মাথায় পানি ব্যবহার করা।

৮. এরপর ডান কাঁধে পানি ব্যবহার করা।

৯. এরপর বাম কাঁধে পানি ব্যবহার করা।

১০. অতঃপর অবশিষ্ট শরীর ভিজিয়ে দেয়া।

১১. সমস্ত শরীরে তিনবার পানি প্রবাহিত করে দেয়া যাতে একটি লোম কূপও শুকনো না থাকে। তবে নদী, পুকুর বা জলাশয়ে গোসল করলে কিছুক্ষণ পানির নিচে ডুব দিয়ে থাকলেই তিনবার পানি ঢালার সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

১২. সমস্ত শরীর ডলে মেজে ধৌত করা।– সহীহ বুখারী হাদীস ২৪৮, ২৪৯, ২৫৪,২৫৬, ২৬০, ২৭৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩২১, সুনানে তিরমিযী, হাদীস ১০৬, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৯, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস ৮১৩, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১২৬৯৪, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস ১০২০।

প্রশ্ন ৩৩ : গোসলের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মুস্তাহাব? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : উযূর ক্ষেত্রে যেসব বিষয় মুস্তাহাব গোসলের ক্ষেত্রে ঠিক সে বিষয়গুলোই মুস্তাহাব হিসেবে পরিগণিত। তবে গোসলের ক্ষেত্রে সতর উন্মুক্ত থাকলে কেবলামুখী হয়ে গোসল করবে না।– নুরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ১/৮।

প্রশ্ন ৩৪ : গোসলের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মাকরূহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যেসব বিষয় উযূর ক্ষেত্রে মাকরূহ হিসেবে পরিগণিত ঠিক সেসব বিষয় গোসলের ক্ষেত্রেও মাকরূহ হিসেবে পরিগণিত।– নুরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ১/৮।

প্রশ্ন ৩৫ : কি কি কারণে গোসল ফরয হয় জানতে চাই।

উত্তর : গোসল ফরয হওয়ার কারণগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. সহবাস করা।

২. উত্তেজনার সাথে দ্রুত বেগে বীর্যপাত হওয়া।

৩. ঋতুশ্রাব থেকে পবিত্র হওয়া।

৪. প্রসূতি অবস্থা থেকে উত্তোরণ।– সহীহ বুখারী হাদীস ২৯১, ৩৩০, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৯, সুনানে তিরমিযী, হাদীস ১১৪, ২৫৬।

প্রশ্ন ৩৬ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ফরয গোসল সম্পন্ন করতেন জানতে চাই।

উত্তর : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয গোসলের সময় প্রথমে দুই হাত ধৌত করতেন। এরপর ডান হাতে পানি নিয়ে বিশেষ অঙ্গ ধৌত করতেন। এরপর নামাযের উযূর মত পূর্ণাঙ্গ উযূ করতেন। এরপর পানি ঢেলে আঙ্গুল দ্বারা চুলের গোড়া ভিজাতেন। চুলগুলো ভালভাবে ভিজে যাবার পর তিন আঁজলা পানি নিয়ে মাথায় দিতেন। এরপর গোটা শরীরে পানি প্রবাহিত করে দিতেন। সবশেষে দু পা ধৌত করতেন।–সহীহ বুখারী হাদীস ২৪৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪৪।

প্রশ্ন ৩৭ : কি কি কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ বলে প্রমাণিত হয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : মূলত তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার দুটি কারণ। ১. পানির সঙ্কট হওয়া। ২. পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া। এ দুটি কারণকে আটটি শাখায় বিভক্ত করা যায়। যথা,

১. ১.৬২ কি.মি. সমীনার ভিতরে উযূ গোসলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পানির চরম সঙ্কট সৃষ্টি হওয়া।

২. পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া।

৩. জলানিষ্ট রোগে(পানি ব্যবহারে যে রোগ বৃদ্ধি পায়) আক্রান্ত হওয়া এবং পানি ব্যবহারের ফলে রোগ নিরাময়ে বিলম্ব হওয়ার ব্যাপারে প্রবল আশংকা বোধ করা।

৪. বর্তমান কিংবা অদূর ভবিষ্যতে পানির মরণাপন্ন প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হওয়া।

৫. পানির অন্বেষণে সম্পদ হানি হওয়ার আশঙ্কা হওয়া।

৬. ক্ষতিকর পর্যায়ের শীত পড়া কিংবা পানি ক্ষতিকর পর্যায়ের শীতল হওয়া।

৭. পানি তোলার উপকরণ বিদ্যমান না থাকা।

৮. নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হওয়া।–আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৪৯৩-৫০৯।

প্রশ্ন ৩৮ : তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে কি কি শর্ত প্রতিপালন করা আবশ্যক? জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : নিম্নে তায়াম্মুমের শর্তগুলো প্রদত্ত হলো।

১. নিয়ত করা।

২. পানির তীব্র সঙ্কট হওয়া এবং পানি ব্যবহারে অক্ষম হওয়া।

৩. মাটি জাতীয় পবিত্র পদার্থ দ্বারা তায়াম্মুম করা।

৪. পুরো মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মাসাহ করা।

৫. পূর্ণ হাত কিংবা হাতের বেশির ভাগ অংশ দ্বারা মাসাহ কার্য সম্পন্ন করা।

৬. উভয় হাত দুবার পবিত্র মাটিতে মেরে তায়াম্মুম করা।

৭. ঋতুস্রাব এবং প্রসূতি অবস্থার মত তায়াম্মুম পরিপন্থী কোনো বিষয় না থাকা।

৮. মোম, চর্বি জাতীয় মাসাহ প্রতিবন্ধক কোনো পদার্থ না থাকা।–সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৬, নূরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ৪০-৪২, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৫২৮।

প্রশ্ন ৩৯ : তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় ফরয? জানতে চাই।

উত্তর : তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় ফরয।

১. নিয়ত করা।

২. পবিত্র মাটিতে হাত মেরে গোটা মুখমণ্ডল মাসাহ করা।

৩. দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা।–সূরা নিসা আয়াত নং ৪৩, সূরা মায়িদা আয়াত নং ৬, সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী হাদীস, নং ১০৩৬, হিদায়া ১/৫০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫।

প্রশ্ন ৪০ : তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় সুন্নত জানতে চাই।

উত্তর : তায়াম্মুমের সুন্নতসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. তায়াম্মুমের শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম পাঠ করা।

২. মাটিতে হাত রাখার সময় আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে রাখা।

৩. মাটিতে রেখে হস্তদ্বয়কে সামান্য আগ পিছ করে মাটিতে ঘর্ষণ করা।

৪. এরপর হস্তদ্বয়কে ঝেড়ে নেয়া।

৫. অঙ্গসমূহ মাসাহ করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৬. চেহারা ও হাত মাসাহ করার মাঝে বিলম্ব না করা।– সহীহ মুসলিম হাদীস ৩৬৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৩০, মুসনাদে আহমদ হাদীস ১২৬৯৪।

প্রশ্ন ৪১ : কি কি বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা যায় জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যেসব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা যায় তা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. পবিত্র মাটি। ২. পাথর। ৩. বালু। ৪. চুনা। ৫. মাটির তৈরী ইট। ৬. ধূলা বালু। ৭. ইট পাথরের তৈরী দেয়াল। ৮. মৃৎপাত্র।– আদদুররুল মুখতার ১/৪০৪, ফতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬।

প্রশ্ন ৪২ : তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মাকরূহ জানতে চাই।

উত্তর : উপরোক্ত তায়াম্মুমের সুন্নতগুলো পরিত্যাগ করা এবং একাধিকবার মাসাহ করা তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে মাকরূহ।–আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৫১৩।

প্রশ্ন ৪৩ : কি কি কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়? জানতে আগ্রহী।

উত্তর : যেসব কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়-

১. যেসব কারণে উযূ এবং গোসল নষ্ট হয়ে যায় সেসব কারণে তায়াম্মুম ও নষ্ট হয়ে যায়।

২. তায়াম্মুম যেসব কারণে বৈধ হয়েছিল সেসব কারণগুলো রহিত হলে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়।

৩. পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়।– আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৫৩২।

প্রশ্ন ৪৪ : হায়েয কি এবং এর বিধান কি? একটু বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : প্রতি মাসে প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের জননেন্দ্রীয় দিয়ে সাধারণত যে রক্ত স্রাব হয় তাকে হায়েয বা ঋতুস্রাব বলে।

হায়েযের বিধান

- সাধারণত নয় বৎসরের পূর্বে মেয়েদের ঋতুস্রাব হয় না। নয় বৎসর বয়সের পূর্বে যদি ঋতুস্রাব দেখা দেয় তবে তা হায়েযের রক্ত হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তা ইস্তেহাযার রক্ত বলে বিবেচিত হবে। পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের পর সাধারণত স্ত্রী লোকদের ঋতুস্রাব হয় না। তবে এ বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি কোনো মেয়ে লোকের ঋতুস্রাব হয় এবং তা কালো অথবা লাল বর্ণের হয় তবে তা হায়েয হিসেবেই গণ্য হবে। আর রং যদি হলুদ, সবুজ অথবা মেটে বর্ণের হয় তবে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তা ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ঐ স্ত্রী লোকের যদি ইতি পূর্বেও হলুদ, সবুজ, বা মেটে বর্ণের রক্তস্রাব হয়ে থাকে তবে এ রক্তকে হায়েয বলেই গণ্য করা হবে।
- হায়েযের সময় সীমার ভিতরে লাল, সবুজ, হলদে, মেটে এবং কালো যে কোনো বর্ণের রক্ত পরিলক্ষিত হবে সবই হায়েযের রক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে যখন নিরেট সাদা রক্ত পরিলক্ষিত হবে তখন মনে করতে হবে, হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে।
- হায়েযের সময় সীমার ভিতরে সর্বক্ষণ রক্ত আসা আবশ্যক নয়; বরং নিয়মিত রক্ত স্রাব হওয়ার পর অভ্যাসের দিনগুলোতে বা দশ দিন দশ রাতের ভিতরে মাঝে মধ্যে দু চার ঘণ্টা বা এক অর্ধ দিন স্রাব বন্ধ থেকে আবার শুরু হলেও মাঝখানের সময়গুলোকে হায়েযের সময় হিসেবে গণ্য করা হবে।
- পবিত্র থাকার সর্বনিম্ন সময় হলো ১৫ দিন। অতিরিক্ত সময়ের কোনো সীমা রেখা নেই।
- ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে নামায আদায় করা এবং রোযা রাখা নিষেধ। তবে এ নামায পরবর্তীতে আদায় করতে হয় না। পক্ষান্তরে পবিত্রতার সময়গুলোতে এ রোযা আদায় করতে হয়।

- ফরয নামায আদায় করার সময় যদি ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায় তাহলে সে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এবং এ নামাযও ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হবে; পরবর্তীতে কাযা করতে হবে না। পক্ষান্তরে নফল নামায পড়াকালীন যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে সে নামায নষ্ট হয়ে যাবে বটে; কিন্তু পরবর্তীতে তা কাযা করতে হবে।
- ফরয নামায এখনো পড়া হয় নি। কিন্তু সময় এখনো আছে। এ মুহূর্তে ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলে এ নামাযও কাযা করতে হবে না।
- রোযা কালীন যদি কারো ঋতুস্রাব শুরু হয়ে যায় তাহলে তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযাদারের মতই অনাহারে থাকতে হবে; পানাহার করা যাবে না। তবে পরবর্তীতে এ দিনটির রোযাও কাযা করতে হবে। চাই সে রোযা ফরয হোক কিংবা নফল হোক।
- যদি কারো দশ দিনের কম সময়ে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং খুব দ্রুত গোসল করে একবার আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করার সুযোগ পায় তাহলে তার জন্য সে ওয়াক্তের নামায আবশ্যক হবে। এমন পরিস্থিতিতে নামায শুরু করার পরমুহূর্তে নামাযের সময় শেষ হয়ে গেলেও সে নামায পূর্ণ করবে। পরবর্তীতে কাযা করতে হবে না। তবে ফজরের সময় নামায শুরু করার পরমুহূর্তে যদি সূর্যোদয় হয়ে যায় তাহলে সে নামায কাযা করতে হবে। আর যদি দ্রুত গোসল সেরে একবার আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করার মত সময় কিংবা সুযোগ না পায় তাহলে তার জন্য সেই ওয়াক্তের নামায আবশ্যক হবে না।
- যদি পূর্ণ দশ দিন দশ রাত শেষে ঋতুস্রাব বন্ধ হয় এবং শুধু একবার আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করার সুযোগ পায়; গোসলের জন্য এতটুকু সময়ও না পায় তাহলেও তার জন্য সে ওয়াক্ত নামায আবশ্যক হবে। পরবর্তীতে কাযা করে নিতে হবে।
- যদি কেউ পূর্ণ দশ দিন দশ রাতের শেষ ভাগে পবিত্র হয় এবং আল্লাহু আকবার বলা পরিমাণ সাহরীর সময় ও পায় তাহলেও তার উপর পরের দিনের রোযা ওয়াজিব হবে। আর যদি দশ দিনের কম সময়ে স্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং শুধু তড়িঘড়ি করে গোসল করার মত সাহরীর সময় পায়; এরপর আল্লাহু আকবার বলার মত সময় না পায় তাহলেও তার উপর সেদিনের রোযা ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় যদি সে গোসল না করে থাকে তবে গোসল না করেই রোযার নিয়ত করে নিবে। আর যদি দ্রুত গোসল করা পরিমণ সময় ও না পায় তাহলে তার জন্য সেদিনের রোজা রাখা জায়েজ হবে না। তবে সারা দিন তাকে রোযাদারের মতই অনাহারে থাকতে হবে এবং পরে কাযা করে নিতে হবে।— আদদুররুল মুখতার ১/৪৭৭, ৪৮২, রদদুল মুহতার ১/৪৮৫, ৪৯১, ৪৯৩, ২/৩৩, ৫০৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৬, ৩৮, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/৪৮২, মারাকিল ফালাহ ৬৭৮, ফাতহুল কাদীর ১/১৭৪, আলফিকহুল হানাফী ফি সাউবিহিল জাদীদ ১/১৩২, শরহুল বিকায়া ১/ ১১৫, বেহেস্তী জিওর মুদাল্লাল ২/১৬১।

প্রশ্ন ৪৫ : ইস্তেহাযা কি এবং মুস্তাহাযা কত প্রকার এবং কি কি? প্রত্যেক প্রকারের বিধান জানতে চাই।

উত্তর : স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গ দিয়ে হায়েযের সর্বনিম্ন সময় তিন দিন তিন রাত তথা বাহাত্তর ঘন্টা থেকে কম কিংবা অভ্যাসের অতিরিক্ত দশ দিন দশ রাতের চেয়ে বেশি সময়ে অথবা নেফাসের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত সময়ে যে রক্তস্রাব হয় তাকে ইস্তেহাযা বলে।

মুস্তাহাযা তথা অনিয়মিত ঋতুমতী নারী তিন প্রকার।

১. মুবতাদি'আ (শুরু জীবন থেকেই বিরামহীন ঋতুমতী)। যেসব মহিলা জীবনে প্রথম ঋতুমতী হয়েছে এবং রক্তস্রাব বিরতিহীনভাবে চালু রয়েছে তাদেরকে মুবতাদি'আ বলা হয়।

বিধান

মুবতাদি'আ প্রকৃতির মহিলারা দশ দিন দশ রাত পর্যন্ত নিজেদেরকে ঋতুমতী হিসেবে গণ্য করবে। এরপর গোসল করে বিশ দিন অবধি নামায এবং রোজা পালন করবে। এরপর আবার দশ দিন দশ রাত দ্বিতীয় ঋতুস্রাব গণ্য করবে। সার কথা, এ প্রকৃতির মহিলারা প্রতি মাসে দশ দিন দশ রাত ঋতুমতী হিসেবে গণ্য হবে এবং বাকি বিশ দিন পবিত্র হিসেবে গণ্য হবে।

২. মু'তাদা (যে নারীর ক্ষেত্রে নিয়মিত অনিয়মিত ঋতুস্রাবের সমন্বয় ঘটেছে)। যেসব মহিলার নিয়মমত দুই বা ততোধিক দফা ঋতুস্রাব হয়ে অবিরতভাবে ঋতুস্রাব চলতে থাকে তাদেরকে মু'তাদা বলা হয়।

বিধান

যদি মু'তাদা মহিলার অভ্যাসগত দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে সে দশ দিন অবধি অপেক্ষা করবে। যদি দশ দিনের পূর্বেই স্রাব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পেছনের সবগুলো দিনকে হায়েযের দিন হিসেবে গণ্য করবে। এবং ধরে নিবে, তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে নতুন রীতিতে শুরু হয়েছে। আর যদি দশ দিনের পূর্বে ঋতুস্রাব বন্ধ না হয় বরং দশ দিনের পরও স্রাব চলমান থাকে তাহলে দশ দিনের অতিরিক্ত যে স্রাব হবে সবই ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

৩. মুতাহাইয়িরা (রক্তস্রাবের ব্যাপারে তুমুল বিভ্রান্তিতে নিপতিত নারী)। যেসব মহিলার প্রথম থেকে কয়েক দফা নিয়মিত স্রাব হয়ে বিরামহীনভাবে চলতে থাকে কিন্তু রক্তস্রাবের সময়কাল কিংবা অভ্যাসগত দিনগুলোর সংখ্যা ভুলে যায় সেসব মহিলাকে মুতাহাইয়িরা বলা হয়।

মুতাহাইয়িরা মহিলা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(ক) আল মুতাহাইয়িরা বিল আদদ। যেসব মুতাহাইয়িরা মহিলা তার অভ্যাসগত দিনগুলোর সংখ্যা ভুলে যায় কিন্তু তার রক্তস্রাবের সময়কাল মনে থাকে তাদেরকে আলমুতাহাইয়িরা বিল আদদ বলা হয়।

বিধান

এ শ্রেণীর মহিলারা তিন দিন অবধি নামায রোজা পালন থেকে বিরত থাকবে। কারণ এ দিনগুলো নিশ্চিতভাবে ঋতুস্রাবের দিন। এরপর সাত দিন প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে। এরপর প্রতি নামাযের সময়ের জন্য উযূ করবে।

(খ) আল মুতাহাইয়িরা বিল ওয়াকত। যেসব মহিলা তার পূর্বের রক্তস্রাব মাসের শুরু ভাগে না মধ্য ভাগে না শেষ ভাগে হয়েছিল তা নিদিষ্ট করে বলতে পারে না তবে অভ্যাসগত দিনগুলোর সংখ্যা স্মরণ আছে তাদেরকে আলমুতাহাইয়িরা বিল ওয়াকত বলা হয়।

বিধান

এ শ্রেণীর মহিলারা ধারাবাহিক চলতে থাকা স্রাবের মাসগুলোর প্রতি মাসের শুরুতে প্রত্যেক নামাযের সময়ের জন্য উযূ করবে অভ্যাসগত দিন অবধি। এরপর মাসের বাকি দিনগুলোতে প্রত্যেক নামাযের সময়ের জন্য গোসল করবে।

(গ) আলমুতাহাইয়িরা বিল আদদ ওয়াল ওয়াকত। যেসব মহিলা তার অভ্যাসগত দিনগুলোর সংখ্যা এবং সময় মনে রাখতে পারে না তাদেরকে আলমুতাহাইয়িরা বিল আদদ ওয়াল ওয়াকত বলা হয়।

বিধান

এ শ্রেণীর মহিলারা প্রতি মাসে তিন দিন যাবত প্রতি নামাযের সময়ের জন্য উযূ করবে এবং মাসের বাকি দিনগুলোতে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে।– হিদায়া ১/৬২, আদদুররুল মুখতার ১/৪৭৬,৪৭৭, শরহুলবিকায়া ১/১২০, রদদুল মুহতার ১/৪৭৮, কানযুদদাকায়েক ১৪, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ১৮/৩০০।

প্রশ্ন ৪৬ : নেফাস কাকে বলে এবং এর বিধান কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর স্ত্রী লোকের জননেন্দ্রীয় দিয়ে যে রক্তস্রাব হয় তাকে নেফাস বা গর্ভপাতজনিত স্রাব বলে।

নেফাসের বিধান

- নিফাসের সর্বোচ্চ সময় সীমা চল্লিশ দিন। এবং এর সর্বনিম্ন কোনো সময় সীমা নেই। চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি রক্ত দেখা যায় তবে তা নেফাসের রক্ত নয়; ইস্তেহাযার রক্ত হিসেবে গণ্য হবে।

- নেফাস বন্ধ হলে গোসল করে নিতে হবে। এ গোসল ফরয। এমনকি সন্তান প্রসবের পর যদি কারো একেবারেই রক্ত না আসে তবুও তাকে গোসল করতে হবে।
- কারো যদি চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও স্রাব বন্ধ না হয় এবং এ নেফাস তার জীবনের প্রথম হয় তাহলে অতিরিক্ত দিনগুলোর স্রাবকে ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্যা করা হবে। আর যদি প্রথম নেফাস না হয় তাহলে তার পূর্ববর্তী নেফাসে যে কয়দিন রক্ত এসেছিল সে কয়দিন পরই তাকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হবে। এবং অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্তকে ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করা হবে। অভ্যাসের অতিরিক্ত যে কয়দিনকে সে নেফাস মনে করে নামায ছেড়ে দিয়েছিল তা কাযা করে নিতে হবে।
- নেফাস অবস্থায় সহবাস ও হাঁটু থেকে নাভী পর্যন্ত স্থান সম্ভোগ করা যাবে না। তবে এক সাথে পানাহার, বিশ্রাম এবং শয্যা গ্রহণে কোনো রকমের অসুবিধা নেই।–সুনানে তিরমিযী হাদীস ২৫৬, বাদাইয়ুস সানায়ি' ১/১৫৭, ১৬০, শরহুলবিকায়া ১/ ১১৬, ১২০, ১২১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৭, ৩৯।

প্রশ্ন ৪৭ : মসজিদে প্রবেশ, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে ঋতুমতী এবং প্রসূতী নারীদের বিধান কি? জানতে আগ্রহী।

উত্তর :

- প্রসূতী, ঋতুমতী এবং গোসল ফরয হয়েছে এমন নারীদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা, কুর'আন শরীফ তেলাওয়াত করা এবং স্পর্শ করা জায়েয নেই। তবে যদি কুরআন শরীফের উপর গেলাফ বা এ জাতীয় কোনো আবরণ থাকে তবে তার উপর দিয়ে কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে কোনো সমস্যা নেই।
- গায়ের জামা, ওড়না কিংবা আঁচল দিয়ে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নেই। তবে গা থেকে আলাদা কাপড় দিয়ে তা স্পর্শ করতে পারবে।
- কুরআনের এক শব্দ কিংবা ছোট্ট এক আয়াতের চেয়ে কম পরিমাণ মুখে উচ্চারণ করা যাবে; এর বেশি উচ্চারণ করা যাবে না।
- কোনো হাফেজা মেয়ের কুরআন হিফজ রাখার নিমিত্ত কুরআন তিলাওয়াতের প্রয়োজন হলে মনে মনে তিলাওয়াত করবে; মুখে উচ্চারণ করে নয়।
- কুরআনের কোনো আয়াত যদি দু'আ কিংবা জিকির সম্বলিত হয় তাহলে তা দু'আ কিংবা জিকিরের নিয়তে পাঠ করতে পারবে।–বাদাইয়ুস সানায়ি' ১/১৬৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৮, ৩৯, আলবাহরুর রায়িক ১/৩৪৬, ৩৫০।

প্রশ্ন ৪৮ : মোজা কত প্রকার এবং কোন ধরনের মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয আছে? জানতে চাই।

উত্তর : কাপড়ের তৈরি মোজা দুই প্রকার।

১. সাখীন। কাপড়ের তৈরি যেসব মোজা এ পরিমাণ স্থুল ও পুরু হয় যা পরিধান করে পাদুকা বিহীন ৪.৮৭ কি. মি. পথ অতিক্রম করা যায় এবং পুরুত্বের কারণে কোনো ধরনের বন্ধন ও গিঁঠ ব্যতীত পায়ের গোছার সাথে লেগে থাকে এবং যাতে দ্রুত পানি শোষিতও হয় না এসব মোজাকে ফিকহবিদদের পরিভাষায় সাখীন বলা হয়। সারকথা, সাখীন মোজার জন্য তিনটি শর্ত প্রজোয্য-

(ক) ন্যূনতম ৪.৮৭ কি. মি. পাদুকা বিহীন পথ চলতে সক্ষম হওয়া এবং তাতে কোনো ধরনের চির না ধরা।

(খ) কোনো ধরনের বন্ধন ব্যতীত পায়ের গোছার সাথে লেগে থাকা।

(গ) দ্রুত পানি শোষণ না করা এবং সিঞ্চিত না হওয়া।

২. রকীক। যে মোজার মাঝে সাখীন মোজার উপর্যুক্ত শর্তগুলোর কোনো একটি শর্ত অনুপস্থিত হয় তাকে রকীক বলা হয়।

কাপড়ের মোজার সাথে চামড়ার সংযুক্তি বিবেচনায় মোজা দু' প্রকার।

১. মুজাল্লাদ। যে মোজার উপরি ভাগ এবং নিম্ন ভাগসহ পুরো পায়ের উপর চামড়া সংযুক্ত করা হয় তাকে মুজাল্লাদ বলা হয়।

২. মুনা'আল। যে মোজার উপরি অংশে কিংবা নিম্নাংশে অথবা উভয় অংশে চামড়া সংযুক্ত করা হয়; কিন্তু পায়ের সম্পূর্ণ অংশে সংযুক্ত করা হয় না তাকে মুনা'আল বলা হয়। মূলকথা, মোজা মোট ছয় প্রকার। যথা,

১. সাখীনে মুজাল্লাদ

২. সাখীনে মুনা'আল

৩. নিছক সাখীন

৪. রকীকে মুজাল্লাদ

৫. রকীকে মুনা'আল

৬. নিছক রকীক

মাসাহ বিধান

সাখীনে মুজাল্লাদ, সাখীনে মুনা'আল, রকীকে মুজাল্লাদ এবং নিছক সাখীনের উপর মাসাহ করা জায়েয আছে। কিন্তু রকীকে মুনা'আল এবং নিছক রকীকের উপর মাসাহ করা জায়েয নেই।– ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ২/৪৮, হামেশে ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৭৫।

প্রশ্ন ৪৯ : মোজা মাসেহের ক্ষেত্রে কি কি শর্ত প্রযোজ্য? জানতে আগ্রহী।

উত্তর : মোজা মাসেহের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত প্রযোজ্য-

১. পবিত্রতা অর্জনের পর উভয় মোজা পরিধান করা।

২. মোজাদ্বয় দ্বারা টাখনুসহ উভয় পা আবৃত হওয়া।

৩. মোজাদ্বয় পরিধান করে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটা চলা করতে সক্ষম হওয়া।

৪. মোজাদ্বয় পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি সমান তিন আঙ্গুল পরিমাণ ফাটনমুক্ত হওয়া।

৫. কোনো রকাম বন্ধন ব্যতিরেকে মোজাদ্বয় পায়ের গোছার সাথে আটকে থাকা।

৬. মোজাদ্বয় পানি শোষণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়া।

৭. পায়ের সম্মুখ ভাগ থেকে ন্যূনতম তিন আঙ্গুল পরিমাণ অবশিষ্ট থাকা।– নূরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ৪৪।

প্রশ্ন ৫০ : মোজার উপর মাসেহের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় ফরয? জানতে চাই।

উত্তর : মোজার উপর মাসেহের ক্ষেত্রে ফরয হলো, মোজাদ্বয়ের সম্মুখভাগে হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসাহ করা।– নূরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ৪৪, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৪২০।

প্রশ্ন ৫১ : মোজার উপর মাসেহের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় সুন্নত? জানতে চাই।

উত্তর : মোজার উপর মাসেহের ক্ষেত্রে সুন্নত হলো, ১. পায়ের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ থেকে শুরু করে পায়ের গোছা পর্যন্ত হাতের আঙ্গুলসমূহ উন্মুক্ত ও ছড়িয়ে রেখে তদ্দ্বারা রেখা টেনে মাসাহ করা। ২. ডান পা ডান হাত দ্বারা এবং বাম পা বাম হাত দ্বারা মাসাহ করা।– নূরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ৪৪, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৪২০।

প্রশ্ন ৫২ : কি কি কারণে মাসাহ ভেঙ্গে যায়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যেসব কারণে মোজার উপর মাসাহ ভেঙ্গে যায়-

১. যেসব কারণে উযূ নষ্ট হয়ে যায় সেসব কারণে মাসাহও নষ্ট হয়ে যায়।

২. উভয় মোজা কিংবা যে কোনো একটি মোজা খুলে ফেললে মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে মোজা পরে নিলেই চলবে; পুনরায় উযূ করার প্রয়োজন নেই।

৩. মোজার ভিতরে পানি ঢুকে সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ পা ভিজে গেলে মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়।

৪. মোজার উপর মাসেহের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়।– নূরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ৪৬।

প্রশ্ন ৫৩ : মোজার উপর মাসেহের সময় সীমা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর :

- শরীয়তগৃহীত সফরের ক্ষেত্রে মাসাহের সময় সীমা হল, তিন দিন তিন রাত। আর স্বাভাবিক অবস্থা হলে এক দিন এক রাত।
- কেউ যদি বাড়িতে থেকে মাসাহ শুরু করে এবং এক দিন এক রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই সফর আরম্ভ করে তাহলে সে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে।
- পক্ষান্তরে কেউ যদি সফরে থেকে মাসাহ শুরু করে এবং এক দিন এক রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই বাড়িতে চলে আসে তাহলে এক দিন এক রাত পূর্ণ হওয়ার পর সে আর মাসাহ করতে পারবে না।– ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ ২/২৬২, বেহেস্তী জিওর মুকাম্মাল ৭৩।

প্রশ্ন ৫৪ : মাসেহের পদ্ধতি কি? জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : হস্তদ্বয়ের আঙ্গুলগুলো পানিতে ভিজিয়ে উভয় পায়ের পাতার অগ্রভাগে রাখবে; যাতে করে সম্পূর্ণ মোজার উপর আঙ্গুলগুলোর ছাপ পড়ে। এরপর হাতের পাতা শূণ্যে রেখে এবং আঙ্গুলগুলোর মাঝে সামান্য পরিমাণ ফাঁকা রেখে ক্রমশঃ আঙ্গুলগুলো পায়ের গোছার দিকে টেনে আনবে।–শরহুল বিকায়া, বেহেস্তী জিওর মুকাম্মাল ৭২।

প্রশ্ন ৫৫ : গোসল করলে কি উযূ সম্পন্ন হয়ে যায় নাকি গোসলের পর আবার নতুন করে উযূ করতে হবে?

উত্তর : গোসল করার দ্বারা উযূ হয়ে যায়। গোসল করার পূর্বে উযূ করা হোক বা না হোক। কেননা গোসলের মধ্যে উযূর অঙ্গগুলো ধৌত হয়ে যায়। তবে গোসলের পূর্বে উযূ করা সুন্নাত। আর গোসলের মাধ্যমে উযূর অঙ্গসমূহ সম্পূর্ণ ভিজে যাওয়া সত্ত্বেও গোসলের পর আবার উযূ করা মাকরূহ।– সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১০৭, রদ্দুল মুহতার ১/২৯৪, মাসাইলে উযূ; পৃষ্ঠা ৩৭, মাসাইলে গোসল; পৃষ্ঠা ৪৮।

প্রশ্ন ৫৬ : জনৈক মহিলা রোযা অবস্থায় বিকাল বেলা রক্ত দেখতে পেল। এ অবস্থায় সে রোযা না ভেঙে সন্ধ্যা করল। পরদিন সে রোযার নিয়ত করল না। তবে সারাদিন উপবাস থাকল। এর পরদিন সাহরী খেল এই নিয়তে যে, যদি রক্ত না আসে তাহলে রোযা রাখব, নতুবা রাখব না। কিন্তু সারাদিন রক্ত এল না এবং এরপরও ঐ মাসে আর রক্ত এল না। এখন প্রশ্ন হলো, (ক) উক্ত মহিলার রোযা অবস্থায় দেখা রক্ত কি হায়েয হিসেবে গণ্য হবে? (খ) গণ্য হলে কয়দিন হায়েয ধরা হবে? (গ) তার প্রথম ও তৃতীয় দিনের রোযার বিধান কী হবে?

উত্তর : (ক), (খ) হায়েযের সর্বনিম্ন সময় তিন দিন তিন রাত। এর চেয়ে কম সময়ে যে রক্ত দেখা যাবে তা হায়েয নয়; বরং ইস্তিহাযা। সুতরাং উক্ত মহিলার এ সময়ে আসা রক্ত হায়েয বলে গণ্য হবে না। (গ) প্রথম দিনের রোযা আদায় হয়ে গেছে। কিন্তু তৃতীয় দিনের রোযা আদায় হয় নি। তাই তা কাযা করতে হবে।– আলহিদায়া ১/৬২, ৬৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৫, খাইরুল ফাতাওয়া ৪/৭৩।

প্রশ্ন ৫৭ : বর্তমানে খুব বেশি সিজারের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করানো হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, সিজারের পর মায়ের শরীর থেকে যে রক্ত বের হয় তা নিফাস বলে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : সিজার করার পর যে রক্ত প্রসূতির জরায়ু থেকে বের হয় তা নিফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি জরায়ু (রেহেম) থেকে বের না হয়ে ক্ষতস্থান থেকে বের হয় তাহলে তা নিফাসের রক্ত হিসেবে গণ্য হবে না।— রদ্দুল মুহতার ১/৪৯৬, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১৪০, খাইরুল ফাতাওয়া ২/১৪৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৬৩।

প্রশ্ন ৫৮ : আমরা নিয়মিত গোসলের পর যে লুঙ্গি ধৌত করে থাকি সে লুঙ্গির সাথে সাধারণত নাপাকি থাকে না। এক্ষেত্রে লুঙ্গি ধোয়া অবশিষ্ট পানির হুকুম কি?

উত্তর : পানি ব্যবহৃত হয় দুই কারণে, ১. নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে, ২. অপবিত্রতা দূর করার জন্য ব্যবহার করলে। আর লুঙ্গি ধোয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের কোনোটির সংশ্লিষ্টতা নেই তাই লুঙ্গি ধৌত করা পানি ব্যবহৃত পানি হিসেবে গণ্য হবে না; বরং সাধারণ পানি হিসেবে ধর্তব্য হবে।– ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/৩৪৫, আলহিদায়া ১/৩৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮/৩০।

প্রশ্ন ৫৯ : ট্যাপ ছেড়ে ওযু করার সময় নিচে রাখা বালতিতে পতিত ওযুর পানি বাথরুমের কমোডে ফেলা যাবে কি না?

উত্তর : ওযুর শেষে ব্যবহৃত যে পানি বালতিতে জমা হয় তা যদি ভাল স্থানে ফেলা সম্ভব হয় তাহলে ভাল স্থানেই ফেলবে। কারণ ওযুর পানির একটা হুরমত বা সম্মান রয়েছে। আর যদি ভাল স্থানে ফেলা সম্ভব না হয় তাহলে বাথরুমের কমোডে ফেলবে। তবে ভিতর থেকে যেন পানির ছিটা না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। উল্লেখ্য, ফিকহের কিতাবগুলোতে ওযু করার সময় সরাসরি গড়িয়ে পড়া ওযুর পানিকে নাপাক স্থানে ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে সরাসরি ওযুর পানির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু ওযু করার সময় যখন পানিটা বালতিতে পতিত হয় তখন সে পানি অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত পানির সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। তখন ওযুর পানির আলাদা কোনো অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং অন্য পানির সাথে মিশ্রিত ওযুর পানিকে নাপাক স্থানে ফেললে ওযুর পানির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না। তাছাড়া কোনো ইমাম ওযুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পানিকে নাজাসাতে গলিজা বলে অভিহিত করেছেন। এ দৃষ্টি কোণ থেকে ওযুর পানির কোনো হুরমতই থাকবে না। উপরন্তু শহর বন্দরে ওযুর পানি যেখানেই ফেলা হোক পাক এবং নাপাক পানির মিলন মোহনা একই। ওযু কিংবা অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত পানির জন্য আলাদা ড্রেন তৈরি করা নেই। সুতরাং শহর বন্দরে সার্বিকভাবে ওযুর পানির হুরমত রক্ষা করা কোনোভাবেই সম্ভব

নয়।–আদদুররুল মুখতার ১/২৬, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদদুর ১/৭৬, আলহিদায়া ১/২০

প্রশ্ন ৬০ : আমাদের মাদরাসায় যে বাথরুম রয়েছে তাতে উযূ করলে উযূর শুরুর কিংবা মাঝের দু'আ পড়া যাবে কি না?

উত্তর : যদি এমন বাথরুম হয় যাতে পায়খানা বা পেশাবখানা রয়েছে এবং উভয়ের মাঝে কোনো দেওয়াল কিংবা পর্দা নেই তাহলে তার মধ্যে কোনো দু'আ পড়া যাবে না। আর যদি মাঝে আড়াল থাকে তাহলে পড়া যাবে।– রদ্দুল মুহতার ১/৩৪৪, ফাতাওয়া উসমানী ১/৩৪৫।

প্রশ্ন ৬১ : অনেক সময় ঠাণ্ডা লাগার কারণে নাক দিয়ে জমাট রক্ত বের হয়। তো এর দ্বারা উযূ ভেঙ্গে যাবে কি না?

উত্তর : সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগার কারণে নাক দিয়ে যদি জমাট রক্ত বের হয় তাহলে এর দ্বারা উযূ ভাংবে না।– রদ্দুল মুহতার ১/১৩৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/২৪২।

প্রশ্ন ৬২ : কেরোসিন তৈল, মোবিল, আলকাতরা জাতীয় তরল খনিজ পদার্থ পাক না নাপাক? এসব জিনিস কাপড়ে লাগলে তা নিয়ে নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : কেরোসিন, মোবিল, আলকাতরা যেহেতু খনিজ দ্রব্য তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে কোনো নাপাক বস্তুর সংমিশ্রণ না ঘটবে ততক্ষণ তা পাক বলে গণ্য হবে। তবে এগুলো দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কারণে কাপড়ে লাগলে ধৌত করা ব্যতীত নামায পড়লে নামায মাকরূহ হবে।– হালবী আলকাবীর; পৃষ্ঠা ৬১০, ফাতাওয়া উসমানী ১/৩৫১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮/২৭৮।

প্রশ্ন ৬৩ : মহিলাদের জন্য মিসওয়াক করার হুকুম কী?

উত্তর : মহিলাদের জন্যও মুখ পরিষ্কার রাখা সুন্নাত। তবে তাদের দন্তমূল পুরুষের দন্তমূলের চেয়ে নরম হওয়ায় মিসওয়াকের ব্যাপারে তাদের জন্য কিছুটা শিথিলতা রয়েছে।– সুনানে নাসাঈ; হাদীস ৮, আসসি'আয়াহ ১/১১৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮/১২০।

প্রশ্ন ৬৪ : পেশাবের পর ঢিলা/টিস্যু ব্যবহার না করে শুধু পানি ব্যবহার করার বিধান কী?

উত্তর : পেশাবের পর ঢিলা/টিস্যু ব্যবহার না করে শুধু পানি ব্যবহার করা জায়েয আছে। তবে উত্তম হলো, ঢিলা ও পানি উভয়টাই ব্যবহার করা। আর এক্ষেত্রে জরুরি হলো পেশাবের ফোঁটা বের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পানি ব্যবহার করা।– রদ্দুল মুহতার ১/৩৩৭, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৪৫, ৪৬, ফাতাওয়া উসমানী ১/৩৬৭।

প্রশ্ন ৬৫ : ফরয গোসল ব্যতীত অন্য গোসলের পূর্বে উযূ করা সুন্নাত কি না?

উত্তর : গোসলের পূর্বে উযূ করা সুন্নাত, চাই ফরয গোসল হোক বা স্বাভাবিক গোসল হোক।– সহীহ বুখারী; হাদীস ২৪৮, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১০৪, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৮৪, দরসে তিরমিযী ১/৩৪০।

প্রশ্ন ৬৬ : যদি প্লাস্টিকের পাত্র তরল পদার্থ লেগে নাপাক হয়ে যায় তবে কি তা শুধু পানি দ্বারা ধৌত করলে পাক হয়ে যাবে?

উত্তর : প্লাস্টিক এবং যে সমস্ত জিনিস নাপাকি শোষণ করে না তাতে যদি নাপাক লেগে যায় তবে তা তিন বার পানি দ্বারা ভালোভাবে ধৌত করলে পাক হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে পাত্রকে প্রত্যেকবার শুকিয়ে নেওয়া জরুরি নয়। তবে নাপাকির প্রভাব যথা সম্ভব দূর করা জরুরি।– রদ্দুল মুহতার ১/৩৩৩, আদদুররুল মুখতার ১/৫৩৫, বাদায়িউস সানায়ে' ১/২৫০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৭০।

প্রশ্ন ৬৭ : মহিলাদের হায়েয অবস্থায় তাসবীহ-তাহলীল, দু'আ-দুরূদ পড়ার হুকুম কী?

উত্তর : মহিলাদের জন্য হায়েয-নেফাস অবস্থায় নামায ও তিলাওয়াতে কুরআন ব্যতীত অন্যান্য যিকির-আযকার, দু'আ-দুরূদ পড়া জায়েয আছে। এমনকি কুরআনের আয়াতও দু'আ হিসেবে পড়া জায়েয আছে।– আদদুররুল মুখতার ১/২৯৩, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৬৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪/৪৯।

প্রশ্ন ৬৮ : যমযমের পানি দ্বারা উযূ-ইস্তিঞ্জা করা যাবে কি না?

উত্তর : যমযমের পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা (শৌচ কার্য সম্পাদন) করা এবং জুনুবী (অপবিত্র) ব্যক্তির জন্য গোসল করা মাকরূহ। এমনিভাবে যার উযূ নেই তার জন্য অন্য পানি থাকাবস্থায় যমযমের পানি দ্বারা উযূ করা মাকরূহ। তবে যদি কেউ উযূ থাকাবস্থায় শুধু বরকত লাভের জন্য উযূ করে কিংবা পানি বিদ্যমান না থাকার কারণে যমযমের পানি দ্বারা উযূ করে তাহলে তার জন্য উযূ করা জায়েয আছে।– রদ্দুল মুহতার ৪/৫২, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫১২, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ২/৬৩।

প্রশ্ন ৬৯ : যদি শরীরের কোনো অংশে সাদা কালি লাগে তাহলে উযূ করলে উযূ হবে কি না?

উত্তর : যদি শরীরের কোনো অংশে কলমের কালি বা অন্য কোনো রঙিন তরল পদার্থ লাগে এবং তা উযূর অঙ্গে পানি পৌঁছতে প্রতিবন্ধক হয় তাহলে উযূ হবে না, অন্যথায় উযূ হয়ে যাবে।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮/১০৭।

প্রশ্ন ৭০ : উযূতে গর্দান মাসাহ করার হুকুম কী?

উত্তর :উযূতে গর্দান মাসাহ করা মুস্তাহাব।– আততালখীসুল হাবীর ১/৩৪, ই'লাউস সুনান ১/১২০, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/২২৬, আদদুররুল মুখতার ১/১২৪, আলবাহরুর রায়েক ১/২৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৮, ফাতাওয়া খানিয়া ১/৩৫, ফাতাওয়া উসমানী ১/৩৪৪।

প্রশ্ন ৭১ : ফরয গোসল করার সময় শরীর থেকে যে পানি ছিটকে পড়ে অথবা শরীরে লেগে থাকে সে পানির হুকুম কি?

নাপাক কাপড় ধোয়ার সময় কাপড় থেকে যে পানি শরীর অথবা কাপড়ে লাগে তার হুকুম কী?

উত্তর : ফরয গোসল করার পর শরীরে যে পানি রয়ে যায় তা পাক। আর শরীরে বাহ্যিক কোনো নাপাকি না থাকলে গোসলের সময় শরীর থেকে ঝরে পড়া পানিও পাক। কিন্তু পানাহার ও উযূ গোসলের জন্য এ পানি ব্যবহার করা যাবে না। তবে বাহ্যিক নাপাকি দূরীকরণের কাজে ব্যবহার করা যাবে। আর যদি শরীরে বাহ্যিক নাপাকি থাকে তাহলে উক্ত পানি নাপাক হিসেবে গণ্য হবে।।– আদদুররুল মুখতার ১/২০১, রদ্দুল মুহতার ১/৩২৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮/৩০৩, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৬৯।

প্রশ্ন ৭২ : নাপাক কাপড় ধোয়ার সময় কাপড় থেকে যে পানি শরীর অথবা কাপড়ে লাগে তার হুকুম কী?

উত্তর : দৃশ্যমান নাপাকি লাগার ফলে নাপাক হয়েছে এমন কাপড় ধোয়ার সময় যতক্ষণ নাপাকির আছর (রং ইত্যাদি) কাপড়ে থাকবে ততক্ষণ যে পানি উক্ত কাপড় থেকে ছিটকে পড়ে অথবা বালতির মাঝে রয়ে যায় তা নাপাক। অদৃশ্যমান নাপাকির কারণে নাপাক হয়েছে এমন নাপাক কাপড় ধোয়ার সময় প্রথম ও দ্বিতীয় বার ধোয়ার পর যে পানি থাকে শুধু তাই নাপাক, তৃতীয় বার ধোয়ার পানি নাপাক নয়।– আদদুররুল মুখতার ১/২০১, রদ্দুল মুহতার ১/৩২৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮/৩০৩, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৬৯।

প্রশ্ন ৭৩ : যদি কোনো ব্যক্তির কাপড়ে নাপাক লেগে যায় আর সে নাপাক লেগে যাওয়া অংশটুকু নির্দিষ্ট করতে না পারে তাহলে সে ঐ কাপড়কে কীভাবে পাক করবে?

উত্তর : কাপড়ের নাপাক অংশটি নির্দিষ্ট করা না গেলে উত্তম হলো, পূর্ণ কাপড়টাকে ধুয়ে ফেলা। তবে কাপড়ের যে কোনো অংশ ধুয়ে নিলেও কাপড় পাক হিসেবে ধর্তব্য হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদি পরবর্তীতে প্রকাশ পায় যে, যে স্থান নাপাক ছিল তা ধোয়া হয় নি; বরং অন্য স্থান ধোয়া হয়েছে তাহলে কাপড়কে পুনরায় ধৌত করতে হবে এবং এ কাপড় পরিধান করে আদায়কৃত নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।– আদদুররুল মুখতার ১/৫২৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪৩, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১৬২, খাইরুল ফাতাওয়া ২/১৬৯।

প্রশ্ন ৭৪ : উযূ করার পর অঙ্গসমূহ মোছার ব্যাপারে সুন্নাত পদ্ধতি কী?

উত্তর : উযূ করার পর অঙ্গসমূহ মোছার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় প্রকারের আমলই বর্ণিত রয়েছে। কখনো তিনি উযূ করার পর অঙ্গসমূহ মুছেছেন আবার কখনো মুছেন নি। তবে মোছার ক্ষেত্রে একটু শিথিলতা অবলম্বন করবে। একদম শুকিয়ে ফেলবে না। যাতে উযূর কিছুটা নিদর্শন অবশিষ্ট

থাকে।– সহীহ বুখারী; হাদীস ২৭৬, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ২৪৫, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৫৩, রদ্দুল মুহতার ১/১৩১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮/১২৭।

প্রশ্ন ৭৫ : যদি কোনো মহিলার এক-দুই মাস গর্ভ স্থির থাকার পর গর্ভপাত হয়ে যায় তাহলে গর্ভপাত পরবর্তী রক্তের হুকুম কী?

উত্তর : গর্ভস্থ বাচ্চার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পাবার পর গর্ভপাত হলে গর্ভপাত পরবর্তী রক্ত নিফাস বলে গণ্য হবে। আর যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পাবার পূর্বেই গর্ভপাত হয় এবং রক্ত কমপক্ষে তিন দিন দেখা যায় তাহলে উক্ত রক্ত হায়েয বলে গণ্য হবে। অন্যথায় ইস্তিহাযা হিসেবে ধরা হবে।– আদদুররুল মুখতার ১/৫০১, বাদায়িউস সানায়ে' ১/১৬১, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/৫৪২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৭, খাইরুল ফাতাওয়া ২/১৪০।

আযান

প্রশ্ন ৭৬ : আযানের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় সুন্নত? জানতে আগ্রহী।

উত্তর : আযানের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় সুন্নত তা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. পূত পবিত্র অবস্থায় থেকে আযান দেয়া।

২. কেবলামুখী হয়ে আযান দেয়া।

৩. উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রেখে পদযুগলকে কেবলামুখী করে রাখা।

৪. (ক) প্রথমে দুই তাকবীর একত্রে এক শ্বাসে বলে থেমে যাওয়া। (খ) এরপর দুই তাকবীর একত্রে এক শ্বাসে বলে থেমে যাওয়া। (গ) এরপর মাঝের বাক্যগুলোর মধ্য হতে এক একটি বাক্য এক শ্বাসে বলা এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকিন করা ও থেমে যাওয়া। (ঘ) শেষের দুই তাকবীর একত্রে এক শ্বাসে বলে থেমে যাওয়া এবং উভয় তাকবীরের শেষে সাকিন করা। (ঙ) সর্বশেষে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আযান শেষ করা।

৫. ডান দিকে চেহারা ফিরানোর পর 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলা এবং বাম দিকে চেহারা ফেরানোর পর 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলা। তবে বুক ও পদযুগল কেবলার দিকে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে।

৬. মহল্লার প্রথম আযান শ্রবণের পর থেকে আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত শ্রোতাগণের তিলাওয়াত, জিকির, তাসবীহ ইত্যাদি বন্ধ রাখা।

৭. আযানের জওয়াব দেওয়া। অর্থাৎ মুয়াজ্জিনের আযানের বাক্য উচ্চারণের ফাঁকে ফাঁকে শ্রোতাগণের হুবহু আযানের বাক্যগুলো পাঠ করা। তবে 'হাইয়া আলাস সালাহ' এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ' এর জবাবে 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা

ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করা। আর ফজরের আযানে 'আসসালাতু খইরুম মিনান নাউম' এর জবাবে 'সদাকতা ওয়া বাররতা' পাঠ করা।

৮. এরপর নিন্মোক্ত দু'আটি পাঠ করা-

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت مُحَمَّدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته انك لا تخلف الميعاد

– সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১১–৬১৩,৬ ১৪,৬৩৪, ৪৭১৯, সহীহ মুসলিম হাদীস ৩৮৫, সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৬৫২, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫০৭, সুনানে বাইহাকী হাদীস ১৯৩৩, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস ১৭৯৯, ১৮০২, ১৮৪৯, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস ২৩৭৭।

প্রশ্ন ৭৭ : ইকামতের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় সুন্নত? জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : ইকামতের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় সুন্নত তা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. পূত পবিত্র অবস্থায় ইকামত দেয়া।

২. কেবলামুখী হয়ে ইকামত দেয়া।

৩. উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রেখে পদযুগলকে কেবলামুখী করে রাখা।

৪. (ক) প্রথম চার তাকবীর একত্রে এক শ্বাসে বলে থামা এবং প্রত্যেক তাকবীরের শেষে সাকিন (স্বরধ্বনিবিহীন/ হসন্ত) করা। (খ) এরপর মাঝের বাক্যগুলোর মধ্য হতে দুই দুই বাক্য একত্রে এক শ্বাসে বলে থামা এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকিন করা। (গ) সর্বশেষে দুই তাকবীরের সাথে 'লাইলাহ ইল্লাল্লাহ' মিলিয়ে একত্রে এক শ্বাসে বলা। এবং উভয় তাকবীরের শেষে সাকিন করা।

৫. ইকামাতেও আযানের ন্যায় ডান দিকে চেহারা ফিরিয়ে 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলা। এরপর বাম দিকে চেহারা ফিরিয়ে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলা।

৬. আযানের জওয়াবের মতই মুসল্লীদের ইকামতের জবাব দেয়া। তবে 'কদ কামাতিস সালাহ' এর জবাবে 'আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলা।– সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৯, ৫২৮, সুনানে তিরমিযী, হাদীস ১৯৫, ২০০, কিতাবুল ফিকহ আলাল মাজাহিবিল আরবা'আ ১/২৯৮, আদদুররুল মুখতার, ১/৩৮৯, মা'আরিফুস সুনান, ২/১৯৫, রদদুল মুহতার ১/৩৮৬।

প্রশ্ন ৭৮ : আযানের ক্ষেত্রে কি কি শর্ত প্রজোয্য? জানতে আগ্রহী।

উত্তর : আযানের শর্তগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. নামাযের সময় প্রবেশ করা।

২. আযানের বাক্যগুলো আরবী ভাষায় হওয়া।

৩. বাক্যগুলো এ পরিমাণ উঁচু আওয়াজে উচ্চারণ করা যাতে কিছু মানুষ শুনতে পায়। এবং একাকী নামাযের ক্ষেত্রে নিজে শুনতে পায় এ পরিমাণ আওয়াজে উচ্চারণ করা।

৪. আযানের শব্দগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৫. আযান দাতা ব্যক্তি মুসলিম হওয়া।

৬. বিবেচনা বোধসম্পন্ন বুদ্ধিমান হওয়া।– আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৬১৪, হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৯৬।

প্রশ্ন ৭৯ : ইকামতের ক্ষেত্রে কি কি শর্ত প্রজোয্য? জানতে আগ্রহী।

উত্তর : ইকামতের শর্তগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. নামাযের সময় প্রবেশ করা।

২. ইকামতের বাক্যগুলো আরবী ভাষায় হওয়া।

৩. বাক্যগুলো এপরিমাণ উঁচু আওয়াজে উচ্চারণ করা যাতে কিছু মানুষ শুনতে পায়। এবং একাকী নামাযের ক্ষেত্রে নিজে শুনতে পায় এ পরিমাণ আওয়াজে উচ্চারণ করা।

৪. ইকামতের শব্দগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৫. ইকামত দাতা ব্যক্তি মুসলিম হওয়া।

৬. বিবেচনা বোধসম্পন্ন বুদ্ধিমান হওয়া।– আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৬১৪, হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৯৬।

প্রশ্ন ৮০ : আযান ইকামতের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মুস্তাহাব? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : আযান ইকামতের মুস্তাহাব বিষয়গুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর আকর্ষণীয় ও বলিষ্ঠ হওয়া।

২. মুয়াজ্জিন ধার্মিক ও খোদাভীরু হওয়া।

৩. আযান ও ইকামতের মাঝে পরিমাণমত সময়ের ব্যাবধান করা।

৪. ইকামত মসজিদের ভিতরে দেয়া।

৫. শরঈ কোনো কারণ না থাকলে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া।

৬. আযানের শব্দগুলো টেনে টেনে থেমে থেমে বলা।

৭. ইকামতের শব্দগুলো তুলনামূলক দ্রুত বলা।

৮. ইমামের বরাবর পেছনে দাঁড়িয়ে ইকামত দেয়া।

৯. আযান শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরুদ পাঠ করা।

১০. মসজিদের বাহিরে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া।– কিতাবুল ফিকহ আলা মাজাহিবিল আরবা'আ ১/২৯৮, হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ১৯৭, আহসানুল ফাতাওয়া ২/২৭৮, ২৮৬।

প্রশ্ন ৮১ : আযান ও ইকামতের জবাব দেয়ার হুকুম কি এবং এ ব্যাপারে কোনো বিধি নিষেধ আছে কি না জানতে চাই।

উত্তর :

- আযান ও ইকামতের জওয়াব দেয়া মুস্তাহাব। এ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সবাই সমান।
- কয়েক স্থানে আযান শোনা গেলে সর্বপ্রথম যে আযান শোনা যাবে সে আযানের জওয়াব দিলেই যথেষ্ট হবে। তবে সব আযানের জওয়াব দিতে পারলে ভাল।
- জুমুআর দ্বিতীয় আযানের জবাব মনে মনে দেয়া যায়।
- কেউ যদি তৎক্ষণাত আযানের জওয়াব না দেয় এবং বেশ বিলম্ব না হয় তাহলেও সে আযানের জবাব দিবে।
- উযূ অবস্থায় আযান হতে থাকলে উযূ করা অবস্থায়ই আযানের জওয়াব দিবে।
- নামায, ঋতুস্রাব, প্রসূতি, খুতবা, স্ত্রী সহবাস, পেশাব-পায়খানা, পানাহার এবং দীনী ইলম বিষয়ে আলোচনার সময় আযানের জওয়াব দেওয়া উচিৎ নয়। তবে কুরআন তেলাওয়াতের সময় আযান হলে তেলাওয়াত বন্ধ করে জওয়াব দেয়া উত্তম।– রদদুল মুহতার ২/৬৫, ৬৬, আদদুররুল মুখতার ২/৬৯ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/১৩২, আহসানুল ফাতাওয়া ২/২৯২, ফাতাওয়া দারুল উলূম ২/৯১।

প্রশ্ন ৮২ : যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদে আযান দিয়ে অন্যত্র জামা'আতের সাথে নামায আদায় করে তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর : মসজিদে আযান হওয়ার পর ফিরে আসার নিয়ত না থাকলে মসজিদ থেকে বিনা কারণে বের হওয়া মাকরূহ। তবে যদি কেউ কোনো কারণবশত যেমন, সে কোনো মসজিদের ইমাম বা মুয়াযযিন, তাহলে তার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে বিনা কারণে আযান দিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে অন্যত্র নামায আদায় করা মাকরূহ হবে।– সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২০৪, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৭৩৪, আদদুররুল মুখতার ২/৫৪, আহসানুল ফাতাওয়া ২/২৯১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/১৫০, খাইরুল ফাতাওয়া ২/২০৭।

প্রশ্ন ৮৩ : যখন চারদিক থেকে আযানের আওয়াজ ভেসে আসে তখন কোন আযানের জবাব দিতে হবে? এক আযানের জবাব দেওয়ার পর অন্য আযানের জবাব দিতে হবে কি না?

উত্তর : যদি চারদিক থেকে একাধিক আযান কানে ভেসে আসে এবং সেগুলো যদি আগে পরে হয় তাহলে প্রথম আযানের জবাব দিবে। আর যদি একই মুহূর্তে একাধিক আযানের ধ্বনি কানে আসে তবে নিকটবর্তী মসজিদের আযানের জবাব দিবে। আর অন্যান্য আযানের জবাব দেওয়া জরুরি নয়। তবে দিতে পারলে ভালো। উল্লেখ্য, আযানের কার্যকারী জবাব দেওয়া ওয়াজিব অর্থাৎ আযান শুনে সক্ষম পুরুষদের জন্য জামা'আতে হাযির হওয়া ওয়াজিব। বিনা ওযরে ঘরে নামায পড়লে ওয়াজিব তরক হবে। আর মৌখিকভাবে আযানের জবাব দেওয়া সুন্নাত।– রদ্দুল মুহতার ১/৩৯৬, আলবাহরুর রায়েক ১/৪৫২, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২০২, আহসানুল ফাতওয়া ২/২৯২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/১৭০।

প্রশ্ন ৮৪ : ইকামত শুরু হলে ইমাম ও মুক্তাদি কখন দাঁড়াবে। কতক মসজিদে দেখা যায়, মুয়াজ্জিন দাঁড়িয়ে ইকামত দেয় আর ইমামসহ মুক্তাদিগণ বসে থাকেন। যখন মুয়াজ্জিন حی علی الفلاح বলেন তখন তারা দাঁড়িয়ে যায়। এদের কাউকে বলতে শোনা যায়, এটাই নাকি সুন্নত। এর বিপরীত করা সুন্নত পরিপন্থী। অতএব এবিষয়টি বিস্তারিতভাবে দলীল প্রমাণসহ জানালে খুবই ভাল হতো।

উত্তর : নামাজে ইমাম ও মুক্তাদিদের দাঁড়ানোর সাথে ইকামতের বিশেষ কোনো শব্দের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ইমামের আগমন থেকে নিয়ে মুয়াজ্জিনের حی علی الفلاح বলা পর্যন্ত যে কোনো সময়ে দাঁড়ানো যেতে পারে। এরপর বসে থাকা মাকরুহ। তবে ইমাম যদি ইকামতের আগ মুহূর্তে মুক্তাদিদের পিছন দিক দিয়ে আসে তাহলে ইমাম যে কাতার অতিক্রম করবে সেই কাতারের লোকদের জন্য তৎক্ষণাত দাঁড়িয়ে যাওয়া উত্তম। আর যদি ইমাম সামনের দিক দিয়ে আসে তাহলে ইমামকে দেখামাত্র সকলের জন্য দাঁড়ানো উত্তম। আর যদি ইমাম ও মুক্তাদিগণ পূর্ব থেকেই মসজিদে উপস্থিত থাকেন তাহলে ইকামতের শুরু থেকে নিয়ে حی علی الفلاح বলা পর্যন্ত যেকোনো সময়ই দাঁড়ানো যাবে। তবে ইকামতের শুরুতেই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করা উত্তম। কেননা এটাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের সাধারণত আমাল ছিল। এতদ সত্ত্বেও যেসকল ফিকহের কিতাবে حی علی الفلاح বলার সময় দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এরপরে বসে না থাকা। তবে বর্তমানে কতক মসজিদে প্রচলিত আছে, ইকামতের আগ মুহূর্তে ইমাম সাহেব এসে জায়নামাজে বসে এবং মুসল্লীদেরকে বসতে বলে। আর মুয়াজ্জিন দাঁড়িয়ে ইকামত দিতে থাকে। এবং حی علی الفلاح বলার সময় সকলে দাঁড়িয়ে যায়। আর এটাকেই সুন্নত বলা হয় এবং এর বিপরীত করাটাকে সুন্নত পরিপন্থী বলা হয়। এটা মূলত কোনো মুজতাহিদ ইমামের মত নয়; বরং নিঃসন্দেহে নব্য সৃষ্ট বিষয়।–সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৬০৫, ৬০৬, সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৬৬৫, সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ২২৭, আদদুররুল মুখতার ২/১৭৭, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদদুর ১/২১৫, আলবাহরুর রায়িক ১/৫৩১, ফাতাওয়া উসমানী ১/৪০৪, জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/২২৩

প্রশ্ন ৮৫ : কখনো কখনো মসজিদে এমন সময় আযান হয় যখন আমরা মাদরাসায় ক্লাসে থাকি অথবা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকি। এমতাবস্থায় কি ক্লাস বা তিলাওয়াত বন্ধ করে আযানের জবাব দিতে হবে?

উত্তর : কুরআন তিলাওয়াত অবস্থায় আযান শুরু হলে তিলাওয়াত বন্ধ করে আযানের জবাব দিবে। আর যদি দরস তাদরীসের মাঝে আযান শুরু হয় তাহলে দরস বন্ধ করে জবাব দেওয়া জরুরি নয়।– আদদুররুল মুখতার ২/৬৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৭, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২০২, খাইরুল ফাতাওয়া ২/২৩০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/১৩৩।

প্রশ্ন ৮৬ : মহিলাদের জন্য আযানের জবাব দেওয়া জরুরি কি না?

উত্তর : আযানের কার্যকারী জবাব দেওয়া তথা আযান শুনে পুরুষের জন্য মসজিদে গিয়ে এবং মহিলাদের জন্য ঘরে নামাযের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে নামাযে মশগুল হওয়া ওয়াজিব। আর আযানের বাক্য পাঠ করে জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলার হুকুম একই। তবে যে সকল মহিলারা ঋতুস্রাব, প্রসূতি অবস্থায় থাকবে তারা আযানের জবাব দেবে না।– রদ্দুল মুহতার ২/৬৫, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২০২, ২০৩, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৬৭।

প্রশ্ন ৮৭ : কোনো এক মুয়াযযিন আযান দিচ্ছেন। কিন্তু তার আযান অশুদ্ধ বা কোনো কারণে শব্দ বোঝা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় কি আযান পুনরায় দিতে হবে?

উত্তর : মুয়াযযিন এমন ব্যক্তি হওয়া উচিত যিনি আযান সংক্রান্ত মাসাইল জানেন এবং আযানের কালিমা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারেন। সুতরাং কোনো মুয়াযযিন যদি আযানের কালিমা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে না পারেন তবে তাকে পরিবর্তন করে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারেন এমন ব্যক্তিকে মুয়াযযিন নিযুক্ত করবে। তবে যে আযান অশুদ্ধ উচ্চারণে দেওয়া হয়েছে কিংবা কোনো কারণে কোনো শব্দ বোঝা যায়নি তা পুনরায় দিতে হবে না।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫৯০, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১৯৭, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৫৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/১৪৪, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪/৯৬।

প্রশ্ন ৮৮ : যখন কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন তার ডান কানে আযান বাম কানে ইকামত দেওয়ার বিধান কী এবং আযান কোনো পদ্ধতিতে দিতে হবে?

উত্তর : যখন কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন তার ডান কানে আযান বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নাত। আযানের পদ্ধতি হলো, সদ্যজাত শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে যিনি আযান দিবেন তিনি শিশুটিকে দু'হাতে ধরে কিবলামুখী হয়ে ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিবে এবং حيعلتين তথা হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় ডানে বামে চেহারা ঘুরাবে। তবে জরুরি নয়। অনুরূপ কানে আঙ্গুল দেওয়া ও আওয়াজকে উঁচু করারও প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য, যদি

কোনো পুরুষ সেখানে উপস্থিত না থাকে তাহলে মহিলারাও আযান দিতে পারবে এবং সন্তানের মা-ও আযান দিতে পারবে। তবে শর্ত হলো, প্রসূতি স্রাব অবস্থায় না হতে হবে। আযানের কোনো সময় বা দিন নির্দিষ্ট নেই। তবে যথাসম্ভব ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই দেওয়া উত্তম। যদি কোনো ওযরবশত বিলম্ব হয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই।– সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১৫১৪, ইমাম বায়হাকী কৃত শু'আবুল ঈমান ৬/৩৯০, রদ্দুল মুহতার ১/৩৮৭, আততাহরীরুল মুখতার ১/৩৮৮, ই'লাউস সুনান ১২/১২৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/১৬৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/১৬০, আহসানুল ফাতাওয়া ২/২৭৬।

প্রশ্ন ৮৯ : اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك হাদীসে বর্ণিত এ দু'আটি পড়ার সময় কখন?

উত্তর : এ দু'আটি মাগরিবের আযানের সময় পড়তে হয়।– মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ৭১৪, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৩৬, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫৩০।

প্রশ্ন ৯০ : আযানের মধ্যে মুয়াযযিন যখন اشهد ان محمدا رسول الله (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) বলে তখন এর জবাবে ﷺ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলা হবে না কি ঐ বাক্যই উচ্চারণ করতে হবে? যদি কেউ শুধু উক্ত দুরূদ পড়ে তাহলে সুন্নাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : আযানের মধ্যে اشهد ان محمدا رسول الله (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) এর জবাবে হুবহু এই বাক্যই বলতে হবে। এটা না বলে শুধু ﷺ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলার দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে না। তবে জবাবে اشهد ان محمدا رسول الله (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) বলার পর ﷺ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলা জায়েয আছে।– সহীহ মুসলিম; হাদীস ৩৮৫, আদদুররুল মুখতার ২/৬৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ২/১২১।

প্রশ্ন ৯১ : জুমু'আর খুতবার পূর্বে খতীবের সামনে যে আযান দেওয়া হয় তার জবাব দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : জুমু'আর দ্বিতীয় আযান যা খতীব সাহেবের সামনে দেওয়া হয় তার জবার মনে মনে দেওয়া যাবে। মুখে উচ্চারণ করে জবাব দেওয়া উচিত নয়।– আলবাহরুর রায়েক ১/৪৫০, রদ্দুল মুহতার ১/৪০০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/১৮৪, ইমদাদুল আহকাম ২/৪৫।

নামায

প্রশ্ন ৯২ : মসজিদে প্রবেশ কালে কি কি বিষয় সুন্নত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : মসজিদে প্রবেশ কালীন সুন্নতগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. বিসমিল্লাহ পাঠ করা।

২. দরূদ শরীফ পাঠ করা।

৩. এরপর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা। 'আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রহমাতিক'

৪. মসজিদে ডান পা প্রথমে প্রবেশ করানো।

৫. মসজিদে প্রবেশ করে ই'তিকাফের নিয়্যত করা।– সহীহ বুখারী, হাদীস ৪২৬, ২০৪২, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭১৩, মুসনাদে আহমদ হাদীস ২৬৪৭২, ২৬৪৭৩।

প্রশ্ন ৯৩ : মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় কি কি বিষয় সুন্নত? জানতে চাই।

উত্তর : মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নতগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. বিসমিল্লাহ পাঠ করা।

২. দরূদ শরীফ পাঠ করা।

৩. এরপর এ দু'আটি পাঠ করা। 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাযলিক"।

৪. মসজিদ থেকে প্রথমে বাম পা বের করা।

৫. এরপর প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরিধান করা। তারপর বাম পায়ে জুতা পরিধান করা।– সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৫৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭১৩, মুসনাদে আহমদ হাদীস ২৬৪৭২, ২৬৪৭৩, মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৯১

প্রশ্ন ৯৪ : নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কয়টি ফরয এবং কি কি জানতে চাই।

উত্তর : নামায আদায়ের ক্ষেত্রে মোট ১৩টি ফরয। মূল নামায শুরু করার পূর্বে ৭টি ফরয প্রযোজ্য। যথা,

১. গোটা শরীর পূত পবিত্র হওয়া।

২. পরিহিত কাপড় চোপড় পবিত্র হওয়া।

৩. নামায আদায়ের স্থান পবিত্র হওয়া।

৪. সতর আবৃত করা। অর্থাৎ পুরুষদের নাভী হতে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং মহিলাদের চেহারা, কব্জি পর্যন্ত দুই হাত এবং পায়ের পাতা ব্যতিরেকে সমস্ত শরীর আবৃত করে রাখা।

৫. কেবলামুখী হয়ে দণ্ডায়মান হওয়া।

৬. নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা।

৭. নির্দিষ্ট নামাযের নিয়্যত করা।

নামাযের ভিতরে ৬টি ফরয। যথা,

১. তাকবীরে তাহরীমা তথা আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করা।

২. ফরয এবং ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা।

৩. কিরাত পাঠ করা। অর্থাৎ কুরআন শরীফ হতে ছোট্ট এক আয়াত পরিমাণ পাঠ করা।

৪. রুকু করা।

৫. দুই সেজদা করা।

৬. শেষ বৈঠক করা। অর্থাৎ নামায শেষে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা। উল্লেখ্য, নামায আদায়কারী ব্যক্তির নিজস্ব কোনো কাজের মাধ্যমে নামায শেষ করাও একটি ফরয।– সূরাহ বাকারাহ, আয়াত নং ১২৫, ১৪৪, ২৩৮, সূরা নিসা, আয়াত নং ১০৩, সূরাহ মায়িদা, আয়াত নং ৬, সূরা আ'রাফ আয়াত নং ৩১, সূরা মুজ্জাম্মিল আয়াত নং ২০, সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত নং ৩,৪, সূরা হজ, আয়াত নং ৭৭, সহীহ বুখারী হাদীস ১, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৯৭০, আলবাহরুর রায়েক, ১/৫১৩।

প্রশ্ন ৯৫ : নামাযের ক্ষেত্রে কয়টি ওয়াজিব এবং কি কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ১৪টি ওয়াজিব। যথা :

১. সূরা ফাতিহা পূর্ণাঙ্গ পাঠ করা।

২. সূরাহ ফাতিহার সঙ্গে অন্য একটি সূরাহ বা ছোট্ট তিন আয়াত পরিমাণ মিলানো।

৩. ফরযের প্রথম দুই রাকাতে কিরাত পাঠ করা।

৪. সূরা ফাতেহাকে অন্য সূরার আগে পাঠ করা।

৫. নামাযের রুকনগুলো ধীর স্থিরভাবে আদায় করা।

৬. তিন অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম বৈঠক করা।

৭. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা।

৮. প্রত্যেক রাকাতের ফরয এবং ওয়াজিবগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৯. ফরয এবং ওয়াজিবগুলোকে স্ব স্ব স্থানে আদায় করা।

১০. বিতরের নামাযে তৃতীয় রাকাতে কিরাতের পর কোনো দু'আ পাঠ করা। অবশ্য দু'আয়ে কুনুত পাঠ করলে ওয়াজিবের সাথে সুন্নতও আদায় হয়ে যাবে।

১১. দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা।

১২. দুই ঈদের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার পর রুকুর জন্য ভিন্নভাবে তাকবীর বলা।

১৩. ইমামের জন্য যোহর, আসর এবং দিনের সুন্নত ও নফল নামাযে কিরাত নিম্ন স্বরে পাঠ করা। আর ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমু'আ, দুই ঈদ, তারাবীহ এবং রমাযান মাসের বিতর নামাযে কিরাত শব্দ করে পাঠ করা।

১৪. সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত ওয়াজিবসমূহের মধ্য হতে কোনো একটি ভুলে ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। সেজদায়ে সাহু আদায় না করলে বা ইচ্ছাকৃত কোনো ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে।– সহীহ বুখারী হাদীস ৬৭৬, ৭৭৬,৭৫৬, ৮২৮, ৮৩০, ৮৩১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১৬৯৯, সুনানে আবুদাউদ, হাদীস ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৯৯৬, ১১৫৩, সুনানে তিরমিযী, হাদীস ২৪৬, ৩০২, মারাসিলে আবুদাউদ, হাদীস ৪১, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস ৫৭০০, ৫৬৮৫, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদীস ৫৭০৪, রদ্দুল মুহতার, ১/৪৫৬, হিন্দিয়া, ১/৭১, বাদায়িউস সানায়ে, ১/৬৮৯।

প্রশ্ন ৯৬ : নামাযে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কয়টি সুন্নত ও কি কি?

উত্তর : নামাযে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ১১টি সুন্নত।

১. উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে রাখা এবং উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল, উর্ধ্বে এক বিঘত পরিমাণ ফাঁকা রাখা।

২. তাকবীরে তাহরিমা বলার সময় চেহারা কেবলার দিকে রেখে দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখা এবং হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝুঁকানো।

৩. উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো। অর্থাৎ উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের লতি পর্যন্ত উঠানো।

৪. হাত উঠানোর সময় আঙ্গুলসহ হাতের তালু কিবলামুখী করে রাখা।

৫. আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিকভাবে রাখা।

৬. ইমামের তাকবীরে তাহরিমা বলার সাথে সাথে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরিমা বলা। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরিমা ইমামের তাকবিরে তাহরিমার পূর্বে শেষ না হয়। এমনটি হলে মুক্তাদীর নামায হবে না।

৭. হাত বাঁধার সময় ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা।

৮. ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা।

৯. অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর স্বাভাবিকভাবে বিছিয়ে রাখা।

১০. নাভীর নিচে হাত বাঁধা।

১১. ছানা পাঠ করা। – সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯১, ৪১৪, ৪১৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭২৭, ৭৭৫, ৭৭৬, সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৮৯২, সুনানে তিরমিযী, হাদীস ২৫২, ৩০৪, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৮১১, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদীস ৩৯৪২, মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১৭৬১, ৮৫৬, মু'জামে তাবারানী আউসাত, হাদীস ৭৮০১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/৭৩, ফতহুলকাদীর ১/২৯২।

প্রশ্ন ৯৭ : নামাযে কিরাতের ক্ষেত্রে কয়টি সুন্নত ও কি কি?

উত্তর : নামাযে কিরাতের ক্ষেত্রে ৭টি সুন্নত

১. প্রথম রাকাতে ছানা পড়ার পর পূর্ণ আউযু বিল্লাহ পড়া।

২. প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মিলানোর পূর্বে পূর্ণ বিসমিল্লাহ পাঠ করা।

৩. সূরা ফাতিহার পর সকলের জন্য নীরবে আমীন বলা।

৪. ফজর এবং যোহরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসাল (লম্বা কিরাত) অর্থাৎ সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত, আসর এবং ইশার নামাযে আউসাতে মুফাসসাল (মধ্যম কিরাত) অর্থাৎ সূরাহ ত্বরিক থেকে সূরাহ লাম ইয়াকুন পর্যন্ত এবং মাগরিবে কিসারে মুফাসসাল (ছোটো কিরাত) অর্থাৎ সূরা ইযা যুলযিলাত থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরা পাঠ করা।

৫. ফজরের প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা লম্বা করা। অন্যান্য নামাযে কিরাতের পরিমাণ সমান রাখা উচিৎ।

৬. কিরাত খুব দ্রুত বা একেবারে ধীর গতিতে না পড়া; বরং মধ্যম গতিতে পড়া।

৭. ফরয নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে শুধু সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা।– সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৭৬, ৭৮০, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৫১, ৭৩৩, সুনানে আবু দাউদ হাদীস ৭৬৪, সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৯৮৩, ৯০৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৮০৭, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস ২৬৭২, সুনানে দারাকুতনী, হাদীস ১২৫৬।

প্রশ্ন ৯৮ : নামাযে রুকুর ক্ষেত্রে কয়টি সুন্নত ও কি কি?

উত্তর : নামাযে রুকুর ক্ষেত্রে ৮টি সুন্নত।

১. তাকবীর বলা অবস্থায় রুকুতে যাওয়া।

২. উভয় হাত দ্বারা হাটু ধরা।

৩. হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে ছড়িয়ে রাখা।

৪. উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা। কনুই বাঁকা না করা।

৫. পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সম্পূর্ণ সোজা রাখা। হাঁটুর সামনের দিক বাঁকা না করা।

৬. মাথা, পিঠ ও কোমর সমান রাখা এবং পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখা।

৭. রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ পাঠ করা।

৮. রুকু হতে উঠার সময় ইমামের সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ এবং মুক্তাদীর রাব্বানা লাকাল হামদ এবং একাকী নামায আদায় কারীর উভয়টি পাঠ করা। উল্লেখ্য, রুকু থেকে উঠে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ দাঁড়ানো আবশ্যক। – সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৮৯, ৭৯০, ৭৩৩, ৮০০-৮০২, ৮২৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৯৮, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭৩৪, ৭৩১, ৮৬৩, ৮৮৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১/৭৪।

প্রশ্ন ৯৯ : নামাযে সিজদার ক্ষেত্রে কয়টি সুন্নত ও কি কি?

উত্তর : নামাযে সিজদার ক্ষেত্রে ১২টি সুন্নত।

১. তাকবীর বলা অবস্থায় সেজদায় যাওয়া।

২. প্রথমে উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা।

৩. এরপর হাঁটু থেকে অনুমানিক এক হাত পরিমাণ দূরত্বে উভয় হাত রাখা এবং হাতের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী করে সম্পূর্ণ মিলিয়ে রাখা।

৪. উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা বরাবর নাক রাখা।

৫. তারপর কপাল রাখা।

৬. অতঃপর দুই হাতের মাঝে সিজদা করা এবং দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগের দিকে রাখা।

৭. সেজদায় পেট উরু থেকে পৃথক রাখা।

৮. পাঁজরদ্বয় থেকে উভয় বাহু পৃথক রাখা।

৯. কনুই মাটি ও হাঁটু থেকে পৃথক রাখা।

১০. সিজদায় কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ পাঠ করা।

১১. তাকবীর বলা অবস্থায় সেজদা থেকে উঠা।

১২. প্রথমে কপাল, তারপর, নাক, তারপর উভয় হাত, তারপর উভয় হাঁটু উঠঅনো। উল্লেখ্য, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সেজদায় যাওয়ার সময় হাঁটু মাটিতে লাগার আগ পর্যন্ত বুক সম্পূর্ণ সোজা রাখা আবশ্যক। নতুবা বিনা ওজরে বুক ঝুঁকে গেলে একাধিক রুকু হয়ে সুন্নত পরিপন্থী হবে। দু সেজদার মাঝে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থির হয়ে বসাও জরুরী। – সহীহ বুখারী, হাদীস ৮০৩, ৮২২, ৮২৫, ৮০৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০১, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৩৮, সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১০৮৯, সুনানে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস ২৯৫৮, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৮৮৮০, ১৮৮৮২, ২৩৬৬২, সহীহ ইবনে খুজাইমাহ, হাদীস ৬৪৩, মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ১৭৬১।

প্রশ্ন ১০০ : নামাযে বসার ক্ষেত্রে কয়টি সুন্নত ও কি কি?

উত্তর : নামাযে বসার ক্ষেত্রে ১৩টি সুন্নত।

১. বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা। ডান পা সোজা করে খাড়া রাখা। উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ সাধ্যমত কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।

২. উভয় হাত রানের উপর হাঁটু বরাবর করে রাখা এবং দৃষ্টি দুই হাঁটুর মাঝ বরাবর রাখা।

৩. আত্তাহিয়্যাতু এর আশহাদু বলার সাথে সাথে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা এক সাথে মিলিয়ে গোলাকার বৃত্ত বানানো এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় মুড়িয়ে রাখা। এবং লাইলাহা বলার সময় শাহাদত আঙ্গুল সামান্য উঁচু করে ইশারা করা। অতঃপর ইল্লাল্লাহ বলার সময় আঙ্গুলের মাথা সামান্য ঝুঁকানো। হাঁটুর সাথে না লাগানো।

৪. শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু শেষ করে দুরুদ শরীফ পাঠ করা।

৫. দুরূদ শরীফের পর দু'আয়ে মাসুর পাঠ করা।

৬. উভয় দিকে সালাম ফিরানো।

৭. ডান দিকে আগে সালাম ফিরানো। উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে আরম্ভ করা এবং সালামের সময় দৃষ্টি কাঁধের দিকে রাখা।

৮. ইমামের উভয় সালামে মুক্তাদী, ফেরেশতা, ও নামাযী জিনদেও প্রতি সালাম করার নিয়্যত করা।

৯. মুক্তাদীগণের উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জিনদের প্রতি সালাম করার নিয়্যত করা।

১০. একাকী নামাযী ব্যক্তির শুধু ফেরেশতাদের প্রতি সালাম করার নিয়্যত করা।

১১. মুক্তাদীগণের ইমামের সালাম ফিরানোর পরপরই সালাম ফিরানো।

১২. দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালাম অপক্ষো আস্তে বলা।

১৩. ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফিরানো শেষ হলে মাসবুকের ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ানো।– সহীহ বুখারী, হাদীস ৮৩৪, ৮৩৮ , সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৩১, ৫৮২, সুনানে আবু দাউদ ৭২৬, সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১২৭৪, ১১৫৮, ১১৫৯, সুনানে তিরমিযী, হাদীস ২৯৫, ৫৯৩, ৩৪৭৭, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস ৩১৪০, ৩১৪৯, ৩১৫২, ৩১৫৭, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, হাদীস ৩০৫৭, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৬১০৬, ।

প্রশ্ন ১০১ : নামায আদায়ের পরিপূর্ণ পদ্ধতি জানতে চাই।

উত্তর : নামায আদায়ের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- নামায আদায়ের জন্য পবিত্র জায়গায় দাঁড়ানো ফরয।

- কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ফরয।
- পদযুগল সোজা কেবলামুখী করে রাখা সুন্নত।
- দুই পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা মুস্তাহাব।
- তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাধা পর্যন্ত হস্তদ্বয় ছেড়ে রাখবে।
- উভয় পায়ের উপর সমান ভর করে দাঁড়াবে; এক পায়ের উপর সম্পূর্ণ ভর করে দাঁড়ানো মাকরূহ।
- নিয়্যত করা ফরয। নিয়্যতের ক্ষেত্রে প্রচলিত লম্বা চওড়া বাক্য বলা নিষ্প্রয়োজন। কোন ওয়াক্তের নামায পড়া হচ্ছে এবং কি নামায পড়া হচ্ছে তা মনে থাকলেই যথেষ্ট হবে।
- তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হস্তদ্বয় কান বরাবর উঠানো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আর মহিলারা কাঁধ বরাবর হাত উঠাবে।
- এক্ষেত্রে আঙ্গুলসহ হাতের তালু কেবলামুখী করে রাখা সুন্নত।
- হাতের আঙ্গুলগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা সুন্নত।
- আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর বলবে। এই তাকবীর ফরয। এটাকে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়।
- হাত কানের লতি বরাবর উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলতে বলতে নামাজ শুরু করা উত্তম।
- হাত বাঁধা সম্পন্ন হওয়ার সাথে আল্লাহু আকবার বলা শেষ হয়ে যাওয়া উত্তম।
- কান বরাবর হাত উঠানোর পর সোজা হাত বেধে ফেলবে; নিচের দিকে ছেড়ে দিবে না বা পেছনের দিকে ঝাড়া দিবে না।
- তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় স্বাভাবিকভাবে সোজা দাঁড়িয়ে থাকবে; মাথা নিচের দিকে ঝুঁকাবে না।
- এরপর নাভীর নিচে হাত বাধবে। এটা সুন্নত।
- ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে।
- ডান হাতের বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে।
- ডান হাতের অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের পিঠের উপর স্বাভাবিকভাবে রেখে দেবে। (মহিলাগণ ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রেখে হাত বাধবে।)
- এরপর সানা পড়বে। সানা হলো, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া তাবারকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া ইলাহা গইরুক।'

- আউযু বিল্লাহি মিনাস শাইতানির রজিম পড়া সুন্নত।
- বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়া সুন্নত।
- সুরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।
- সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াতে ওয়াকফ করে পড়া উত্তম।
- সূরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' পড়া সুন্নত।
- আমীন আস্তে বলা সুন্নত।
- সূরা মিলানোর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব।
- সূরা মিলানো ওয়াজিব।
- পরবর্তী রাকাতগুলোতে কিরাতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী। অর্থাৎ কিরাত সামনের দিক থেকে পড়া; পেছনের দিক থেকে না পড়া।
- এতটুকু শব্দে কিরাত পাঠ করা যাতে নিজে সে শব্দ শুনতে পায়। তাকবীর ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ মাস'আলা প্রযোজ্য।
- কিরাত শেষ করার পর একটু বিরতি দিয়ে রুকুতে যাওয়া সুন্নত।
- রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলা সুন্নত।
- রুকুর সময় আল্লাহু আকবার বলে হাত হাঁটুর দিকে নিয়ে যাবে। হাত সোজা ছেড়ে দিবে না বা পেছনের দিকে ঝাড়া দিবে না।
- রুকুর জন্য ঝোঁকার সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বলা শুরু করবে। এবং রুকুতে গিয়ে সোজা স্থির হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বলা শেষ করবে।
- রুকুতে পিঠ সমান সোজা রাখা সুন্নত।
- কোমর এবং মাথা এক বরাবর রাখবে; সামনে পেছনে ঝুঁকাবে না।
- পাঁজর থেকে বাহুকে পৃথক রাখবে।
- রুকুতে উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে রাখা সুন্নত।
- শক্ত করে হাঁটু ধরা সুন্নত।
- উভয় হাতের কনুই সোজা করে রাখবে; ভাজ করে রাখবে না। মহিলাগণ উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিত অবস্থায় রেখে হাঁটুর উপর হাত রাখবে। হাঁটু ধরবে না। এবং হাতের বাহু পাঁজরের সাথে মিলিত অবস্থায় রেখে অল্প ঝুঁকে রুকু করবে। এবং হাঁটু সামনের দিকে আর পিঠ সামান্য বাঁকা রাখবে।
- রুকুতে চোখের দৃষ্টি পায়ের পাতা বা পায়ের আঙ্গুলে প্রতি নিবদ্ধ রাখবে।
- পুরুষগণ রুকুতে দুই পায়ের মাঝখানে দাঁড়ানোর মত চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখবে এবং মহিলাগণ দু পা মিলিয়ে রাখবে।

- রুকুতে সুবহানা রাব্বিয়াল আ'জীম তিন/ পাঁচ/ সাত বার পঠ করা সুন্নত।
- সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা বলে রুকু থেকে উঠা সুন্নত।
- সোজা হওয়ার সাথে সাথে হামিদাহ বলা শেষ করবে।
- রুকু থেকে সোজা স্থির হয়ে দাঁড়ানো ওয়াজিব।
- সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর রব্বানা লাকাল হামদ বলা সুন্নত।
- সেজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলা সুন্নত।
- সেজদার ভিতরে জমিনে কপাল লাগানোর সাথে সাথে আকবার বলা শেষ করবে। এটা সুন্নত।
- সেজদায় যাওয়ার সময় উভয় হাঁটু একত্রে, তারপর উভয় হাত একত্রে, তারপর নাক, তারপর কপাল জমিনে রাখবে। এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সুন্নত।
- হাঁটু জমিনে রাখার পূর্বে কোমর, মাথা সামনের দিকে ঝুঁকানো মাকরূহ। বরং কোমর সোজা রাখবে।
- সেজদায় যাওয়ার সময় হাটুর উপর হাত দিয়ে ভর করবে না।
- সেজদায় যাওয়ার সময় কাপড় নাড়াচাড়া বা টানাটানি করবে না।
- সেজদায় উভয় হাতের মাঝে চেহারার পরিধি পরিমাণ ফাঁকা রাখবে।
- উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো খুব মিলিয়ে রাখা সুন্নত।
- হাতের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখা সুন্নত।
- উভয় হাতের মাঝখানে বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ের নখ বরাবর নাক রাখবে।
- চোখের দৃষ্টি নাকের উপর রাখবে।
- দুই পায়ের টাখনু কাছাকাছি রাখবে। সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিবে না।
- উভয় পা খাড়া রাখবে।
- পায়ের আঙ্গুলসমূহ জমিনের সাথে চেপে ধরে যথাসম্ভব আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী করে রাখবে।
- অধিকাংশ কপাল এবং নাক জমিনের সাথে লাগিয়ে রাখা ওয়াজিব।
- পুরুষগণ পেট রান থেকে, বাহু পাঁজর থেকে এবং কনুই জমিন থেকে পৃথক রাখবে।
- মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং পেট দুই রানের সঙ্গে, বাহু পাঁজরের সঙ্গে মিলিয়ে এবং কনুই পর্যন্ত হাত জমিনের সাথে লাগিয়ে খুব চেপে ধরে জড়ো সড়ো হয়ে সেজদা করবে।
- সেজদায় তিন/ পাঁচ/ সাতবার সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলা সুন্নত।

- আল্লাহু আকবার বলে সেজদা থেকে উঠা সুন্নত।
- উঠার ক্ষেত্রে প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত জমিন থেকে উঠানো সুন্নত।
- সোজা হয়ে বসার সাথে সাথে আকবার বলা শেষ করবে।
- বাম পা বিছিয়ে তারপর বসা সুন্নত। তবে মহিলাগণ দুই নিতম্বের উপর বসবে।
- বসার সময় পুরুষের জন্য ডান পা সোজা খাড়া রাখা সুন্নত।
- ডান পা জমিনের সাথে চেপে ধরে যথাসম্ভব ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখা সুন্নত। তবে মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে।
- বসার সময় হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝে সামান্য ফাঁকা রাখা মুস্তাহাব।
- হাতের আঙ্গুলগুলো সোজা কেবলামুখী করে রাখা মুস্তাহাব।
- হাতের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ হাঁটুর কিনারা বরাবর রাখবে।
- বসার সময় দৃষ্টি কোলের উপর নিবদ্ধ রাখবে।
- দুই সেজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা ওয়াজিব।
- দুই সেজদার মাঝে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى জাতীয় দু'আয়ে মাসুরা পাঠ করা মুস্তাহাব।
- প্রথম সেজদার মতই দ্বিতীয় সেজদাটি আদায় করবে।
- দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে বসা ছাড়াই দাঁড়িয়ে যাওয়া সুন্নত।
- হাঁটুর উপর হাতে ভর করে উঠা মুস্তাহাব।
- সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বলা শেষ করবে।
- দ্বিতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদা থেকে বসে তাশাহহুদ পাঠ করা ওয়াজিব।
- তাশাহহুদের মধ্যে আশহাদু আল্লা বলতে বলতে ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলের অগ্রভাগ এবং মধ্যমার অগ্রভাগকে মিলিয়ে হালকা বানাবে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে হাতের তালুর সাথে মিলিয়ে রাখবে। এরপর লাইলাহা বলতে বলতে শাহাদত আঙ্গুলকে উপর দিকে উঠাবে। এতটুকু পরিমাণ উপরে উঠাবে যাতে অগ্রভাগ কেবলার দিকে থাকে। এরপর ইল্লাল্লাহ বলার সময় নিচের দিকে নামাবে। তবে বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত রানের সাথে না মিলিয়ে সামান্য উঁচু করে রাখবে। এই হালকা বৈঠক শেষ পর্যন্ত রাখবে।
- তাশাহহুদের পর দুরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নত।
- তারপর দু'আয়ে মাসুরা পাঠ করা মুস্তাহাব।
- এরপর আসসালামু আলাইকুম বলে উভয় দিকে সালাম ফিরানো ওয়াজিব।

- সালাম ফিরানোর সময় দৃষ্টি কাঁধের উপর রাখা মুস্তাহাব।
- ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় ডান দিকের ফেরেশতাকে সালামের নিয়ত করবে। অনুরূপ বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের ফেরেশতাকে সালামের নিয়ত করবে।
- উভয় সালাম কেবলামুখী থাকা অবস্থায় শুরু করবে। এবং কাঁধে দৃষ্টি রেখে শেষ করবে।
- দ্বিতীয় সালামকে স্বল্প দীর্ঘ করা এবং এক্ষেত্রে আওয়াজকে নিচু করা সুন্নত।
- সালামের সময় ঘাড় এতটুকু পরিমাণ ফিরাবে যাতে পেছনে কেউ থাকলে তার চেহারার উক্ত পার্শ্ব দেখতে পায়।
- এতক্ষণ দুই রাকাত নামাযের পূর্ণ বিবরণ পেশ করা হলো। তিন/চার রাকাত বিশিষ্ট নামায হলে দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে। আর সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা বা নফল নামায হলে প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসুরা পাঠ করে দাঁড়ানো উত্তম।
- তিন চার রাকাত বিশিষ্ট নামায ফরয হলে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা উত্তম। আর ফরয ব্যতীত অন্যান্য নামায হলে সূরা মিলানো ওয়াজিব।
- শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নত এবং দু'আয়ে মাসূরা পাঠ করা মুস্তাহাব।– সূরা বাকারা ১৪৪, সূরা মুদ্দাসসির ৩, সূরা নাহল ৯৮, সূরা আ'রাফ ৫৫, সহীহ বুখারী হাদীস ১০৮,৭৩৩, ৭৭৬, ৭৮২,৭৮৯, ৮০০-৮০৩, ৮০৭, ৮২২, ৮২৫, ৩২৩০, সহীহ মুসলিম হাদীস ৩৯৪,৩৯৯, ৪০১,৪৯১,৪৯৮, সুনানে আবুদাউদ হাদীস ৭৫৫-৭৫৭, ৭৭৫, ৮৩৮, ৮৮৬, ১৪১৪, সুনানে তিরমিযী হাদীস ২৬৮, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হাদীস ২৯৫৮, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস ৮৮৮, মুসনাদে আহমদ হাদীস ১৮৮৮০, আদদুররুল মুখতার ২/২২৮-২২৯, আলবাহরুর রায়িক ১/৪৬২, ৪৯৩, ৫০৬, ৫২৮,৫৩২, ৫৩৩, ৫৪৫, ৫১০, ৫৮৭, রদদুল মুহতার ১/৩৩, ৪৬৪, ২/১৫০, ১৫৭, ১৭৫, ১৯৬, ২০২, ২০৩, ২৩৮, ২১৬, ২৪১, ২৪২,বাদাইয়ুস সানায়ি' ১/৩৯৯, ৪৯৪, ৪৯৫, ৫০২, ৫০৩, হিদায়া ১/৭৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/১৪, ২১, ৪১, ২৩, ৪৫, ৪৯, ৫০, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ২/১৫৬, ১৫৭, বেহেস্তী জিওর ২/১১৭,১২১।

প্রশ্ন ১০২ : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে ফরয সময় কি কি জানতে চাই।

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফরয সময়-

ফজর : সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় হলো ফজরের ওয়াক্ত।

যোহর : সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পর থেকে নিয়ে মূল ছায়া ব্যতীত প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত সময় হলো জোহরের ওয়াক্ত। উল্লেখ্য, শ্রাবণ মাসে প্রতিটি বস্তুর মূল ছায়া তার ২১.৪২% হয়ে থাকে। আর শ্রাবণের পূর্বের এবং পরের চার মাসে ১৪.২৮% করে বৃদ্ধি পায়। এর পরের প্রত্যেক মাসে ২৮.৫৬% ভাগ করে বৃদ্ধি পায়। অবশেষে মাঘ মাসে এসে প্রতিটি বস্তুর মূল ছায়া ১৪৯.৯৪% পরিমাণ হয়ে যায়। অর্থাৎ মূল ছায়াটি সংশ্লিষ্ট বস্তুটির সমপরিমাণ হয়েও ৪৯.৯৪% পরিমাণ বেড়ে যায়।

আসর : জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময় হলো আসরের ওয়াক্ত।

মাগরিব : সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পর থেকে নিয়ে পশ্চিম আকাশে লাল বর্ণ শেষ হওয়া অর্থাৎ প্রায় ১.২৫ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় হলো মাগরিবের ওয়াক্ত।

ঈশা : মাগরিবের সময় শেষান্তে আকাশ কালো বর্ণ ধারণ করার পর থেকে নিয়ে সুবহে সাদেক পর্যন্ত সময় হলো ঈশার ওয়াক্ত। আর ঈশার নামায আদায় করার পর থেকে নিয়ে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময় হলো বিতর নামাযের ওয়াক্ত।–হিদায়া ১/৮০-৮৬, মালাবুদ্দা মিনহু ২৪।

প্রশ্ন ১০৩ : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব সময় কি কি জানতে চাই।

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত-

গ্রীষ্মকালে জোহরের নামায বিলম্ব করে আদায় করা, ঈশার নামায রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা এবং ফজরের নামায এই পরিমাণ সময় হাতে রেখে আদায় করা যাতে নামায নষ্ট হয়ে গেলেও পুনরায় তা সূর্যোদয়ের আগে সুন্নত কিরাতসহ আদায় করা সম্ভব হয়। অন্যান্য নামায প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করা উত্তম। – হিদায়া ১/৮০-৮৬।

প্রশ্ন ১০৪ : নামাযের ক্ষেত্রে হারাম সময় কি কি জানতে চাই।

উত্তর : নামায আদায়ের নিষিদ্ধ সময় হলো, সূর্যোদয়ের সময়, ঠিক দুপুরে এবং সূর্যাস্তের সময় নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। তবে সূর্যাস্তের সময় ঐদিনের আসরের নামায আদায় করা জায়েয আছে। – হিদায়া ১/৮০-৮৬।

প্রশ্ন ১০৫ : নামাযের ক্ষেত্রে মাকরূহ সময় কি কি জানতে চাই।

উত্তর : নামায আদায়ের মাকরূহ ওয়াক্ত-

বিকেলে সূর্য হলদে বর্ণ ও রশ্মিহীন হয়ে যাওয়ার পর আসর নামায আদায় করা মাকরূহ। রাত্রির দ্বিপ্রহরের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত ঈশার নামায আদায় করা মাকরূহ। ফজরের সময় ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্য কোনো নফল নামায আদায় করা

মাকরূহ। তেমনিভাবে আসরের নামায আদায় করার পর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নফল নামায আদায় করা মাকরূহ।– হিদায়া ১/৮০-৮৬।

প্রশ্ন ১০৬ : কি কি কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়? জানতে আগ্রহী।

উত্তর : নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. ইচ্ছা কিংবা ভুলক্রমে কথা বার্তা বলা।
২. সালাম দেয়া বা সালামের উত্তর দেয়া।
৩. কারো হাঁচির উত্তর দেয়া।
৪. বহিরাগত কারো দু'আয় আমীন বলা।
৫. দুঃসংবাদ কিংবা সুসংবাদে উত্তর দেয়া।
৬. বিস্ময়কর কোনো কথা শুনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা।
৭. উহ আহ শব্দ করা।
৮. বহিরাগত কারো কুর'আন পাঠে লুকমা দেয়া।
৯. নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পাঠ করা।
১০. কোনো বই বা লিখিত কোনো বিষয় দেখে উচ্চারণ করে পাঠ করা।
১১. আমলে কাসির করা। অর্থাৎ এমন কাজে লিপ্ত হওয়া যাতে মানুষ নামাযী বলে মনে করে না।
১২. বিনা প্রয়োজনে প্রচণ্ডভাবে কাশি দেয়া।
১৩. ইচ্ছা কিংবা ভুলক্রমে কোনো বস্তু আহার করা।
১৪. কুরআন পাঠে ভীষণভাবে অর্থ বিকৃত হয়ে যাওয়ার মত ভুল করা।
১৫. নামাযের ভিতরে হাঁটা হাঁটি করা। তবে প্রয়োজনে এক দু পা এদিক সেদিক করা জায়েয আছে।
১৬. কিবলার দিক থেকে সিনা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়া।
১৭. তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা পরিমাণ সময় এক চতুর্থাংশ সতর অনাবৃত রাখা।
১৮. আল্লাহ তা'লার কাছে পানাহার জাতীয় জাগতিক বিষয়াদি প্রার্থনা করা।
১৯. আল্লাহ এবং আকবার শব্দের আলিফ বা আকবার শব্দের 'বা' কে দীর্ঘ করে উচ্চারণ করা।
২০. নামাযের ভিতরে অট্ট হাসি দেয়া।
২১. একবার সেজদা করা পরিমাণ সময় একই নামাযে নারী পুরুষের একত্রে দণ্ডায়মান হওয়া।
২২. নামাযের ভিতরে তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়ে যাওয়া।
২৩. পূর্ণ সেজদার মাঝে পদযুগলকে সম্পূর্ণ উঁচু করে রাখা; একেবারেই মাটির সাথে স্পর্শ না করানো।
২৪. নামাযের মধ্যে সন্তানের দুগ্ধ পান করা।

২৫. স্ত্রীর নামাযরত অবস্থায় স্বামীর চুম্বন করা।– নুরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ৮৬-৯০, বেহেস্তী জিওর মুকাম্মাল ১২২-২৪।

প্রশ্ন ১০৭ : নামাযের ভিতরে কি কি বিষয় মাকরূহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যেসব বিষয় দ্বারা নামায নষ্ট হয় না তবে দোষণীয় সেসব বিষয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. চাদর বা মাফলার জাতীয় বস্ত্র না পরে উভয় কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা।
২. পরিহিত কাপড় বা শরীরে ধূলো বালি লাগার ভয়ে কাপড় টেনে ধরা অথবা মুখে ফুঁক দিয়ে ধূলোবালি সরানো।
৩. শরীর, পরিহিত কাপড় কিংবা দাঁড়ি নিয়ে খেলা করা।
৪. এমন কাপড়ে নামায আদায় করা যা পরিধান করে মার্কেট অথবা সভা সমিতিতে যেতে সংকোচ বোধ হয়।
৫. কুরআন পাঠে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোনো জিনিস মুখে রেখে নামায আদায় করা।
৬. শৈথিল্য কিংবা অমনোযোগিতার দরুণ শূন্য মাথা অথবা উদাম দেহে নামায আদায় করা।
৭. আঙ্গুল ফুটানো অথবা এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া।
৮. বিনা প্রয়োজনে কোমরে হাত রাখা।
৯. সেজদার ভিতরে হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত বিছিয়ে দেয়া।
১০. নামাযের ভিতরে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করা।
১১. এমন লোকের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা যে তার দিকে মুখ করে আছে।
১২. মাথা বা হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে কারো কথার জবাব দেয়া।
১৩. বিনা কারণে হামাগুড়ি দিয়ে, পা খাড়া করে কিংবা আসন গেড়ে বসা।
১৪. ইচ্ছা করে হাই তোলা অথবা হাই বন্ধ করার চেষ্টা করা।
১৫. সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও একাকী পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা।
১৬. কোনো প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা।
১৭. প্রথম রাকাত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকাত তিন আয়াত বা ততোধিক পরিমাণ দীর্ঘ করা।
১৮. ইমামের জন্য এক বিঘতের চেয়ে উঁচু স্থানে একাকি দাঁড়ানো।
১৯. এমনভাবে চাদর জড়িয়ে নামায আদায় করা যাতে হাত বের করতে অসুবিধা হয়।
২০. নামাযের ভিতরে আড়মোড়া ভাঙ্গা।
২১. টুপি, পাগড়ি অথবা রুমালের ভাঁজে সেজদা করা।

২২. কোনো নামাযে বিশেষ কোনো সূরা নির্দিষ্ট করে সবসময় পাঠ করা।
২৩. কুরআনের আয়াতের ক্রমধারার বিপরীত কুরআন পাঠ করা।
২৪. পেশাব পায়খানার বেগ রেখে নামায আদায় করা।
২৫. প্রচণ্ড ক্ষুধাবস্থায় খাবার প্রস্তুত থাকলে অনাহারে নামায আদায় করা।
২৬. কোনো অসুবিধা না করলে নামাযরত অবস্থায় ছারপোকা, মশা মাছি মারা।
২৭. কনুই পর্যন্ত জামার হাতা গুটিয়ে নামায আদায় করা। আর হাতা কাটা শার্ট পরিধান করে নামায আদায় করা অনুত্তম।– মারাকিল ফালাহ, ৩৪৫-৩৬৪, বেহেস্তী জিওর ১২৪-১২৬।

প্রশ্ন ১০৮ : জামাতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্ব কতটুকু জানতে চাই।

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে জামাতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। জামাতের সীমাহীন গুরুত্ব বিবেচনায় অন্যান্য মাসলাকে জামাতের সাথে নামায আদায়কে ফরয বলা হয়েছে। তবে হানাফী মাসলাক মতে জামাতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব। জামাত পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে শরীয়তে কঠোর হুঁশিয়ারী এসেছে। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার ইচ্ছা করে, কাউকে আযান দিয়ে নামায পড়াতে বলি এবং এক দল যুবককে জ্বালানী সংগ্রহ করতে বলি। এরপর যারা আযান শোনার পরও মসজিদে নামায আদায় করতে আসে না তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও মহিলাদের কারণে তা করি না।– সুনানে আবুদাউদ, হাদীস ৫৪৮, রদ্দুল মুহতার ১/৫১৯, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৭/৩৯২।

প্রশ্ন ১০৯ : কি কি উজরের কারণে জামাত পরিত্যাগ করার অবকাশ রয়েছে জানতে চাই।

উত্তর : যেসব উজরের কারণে জামাত পরিত্যাগ করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ-

১. সতর আবৃত করার মত কাপড়ের সঙ্কট হওয়া।
২. মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়া।
৩. প্রচণ্ড রকমের ঝড় তুফান হওয়া।
৪. স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতকালীন ছাতার সঙ্কট হওয়া।
৫. মসজিদের যাতায়াত পথ ভীষণ রকমের কর্দমাক্ত হওয়া।
৬. প্রচণ্ড শীতের কারণে মসজিদে গমন করলে ব্যধি সৃষ্টি হওয়া কিংবা রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হওয়া।
৭. মসজিদে গেলে ঘরের ধন সম্পত্তি চুরি হয়ে যাওয়ার প্রবল অশঙ্কা বোধ করা।
৮. মসজিদে গেলে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা বোধ করা।

৯. মসজিদে গেলে ঋণদাতার সাক্ষাৎ ও তার মাধ্যমে উৎপীড়িত হওয়ার আশঙ্কা বোধ করা। তবে ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য থাকলে এটা ওজর হিসেবে গণ্য হবে না।
১০. অন্ধকার রাতে পথ দৃষ্টিগোচর না হওয়া এবং আলোর ব্যবস্থা না থাকা।
১১. রোগীর সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির জামাতে গেলে রোগীর কষ্ট অনুভূত হওয়ার আশঙ্কা বোধ করা।
১২. প্রচণ্ড ক্ষুধাবস্থায় খাবার প্রস্তুত হয়ে যাওয়া।
১৩. নামাযের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার মত পেশাব পায়খানার প্রচণ্ড বেগ এসে যাওয়া।
১৪. রোগ ব্যধির কারণে চলা ফেরা করতে অক্ষম হওয়া।
১৫. পা বা চক্ষু প্রতিবন্ধি হওয়ার কারণে জামা'আতে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম হওয়া।
১৬. ভ্রমণকালে যানবাহন ফেল করার আশঙ্কা বোধ করা।– মারাকিল ফালাহ ২৯৭।

প্রশ্ন ১১০ : বিতর নামায আদায়ের সুন্নাহ পদ্ধতি কি? হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : বিতর নামায একই সালামে সর্বনিম্ন তিন রাকাত। দুই রাকাত পড়ে প্রথম বৈঠক করবে এবং এই বৈঠকে কোনো সালাম হবে না। ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে আট রাকাত পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতর পড়তেন। আর ফজর নামাযের পূর্বে দুই রাকাত পড়তেন।

হযরত আয়িশা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাযে দুই রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন না।

ঈশার নামাযের পর থেকে নিয়ে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময় হলো বিতরের সময়। তবে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের পরে বিতর পড়া উত্তম। কিন্তু যার শেষ রাতে উঠার অভ্যাস নেই বা উঠতে পারার ব্যাপারে আস্থা নেই তার জন্য ঈশার পরে বিতর পড়ে নেয়া উচিত। প্রথম রাতে পড়ে নিলে শেষ রাতে পড়ার অনুমতি নেই। বিতর নামাযের তিনো রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা মিলানো ওয়াজিব। বিতরের তৃতীয় রাকাতে সূরা মিলানোর পর তাকবীরে তাহরিমার ন্যায় হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে আবার হাত বাঁধবে। এরপর দুআয়ে কুনুত পাঠ করবে। এরপর রুকু, সেজদা ও বৈঠক করে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করবে। শুধু রমাযান মাসে বিতিরের জামাত করা মুস্তাহাব। এই জামাতে ইমামের ন্যায় মুক্তাদীও দু'আয়ে কুনুত পাঠ করবে।– সুনানে নাসাঈ হাদীস ১৬৯৭, ১৭০৬, আদদুররুল মুখতার ২/২৮,৪৪১।

প্রশ্ন ১১১ : নামায পড়ার সময় কেউ যদি অন্তরে এক নামাযের নিয়ত করে এবং মুখে ভুলবশত অন্য নামাযের নাম উচ্চারণ করে তাহলে তার কোন নামায আদায় হবে? অন্তরের নামায না কি মুখের নামায?

উত্তর : নিয়ত শব্দের অর্থই হলো, ارادة القلب অর্থাৎ মনের ইচ্ছা, মনের সংকল্প। এর সাথে মুখের উচ্চারণের কোনো সম্পর্কই নেই। উপরন্তু মুখের উচ্চারণকে নিয়ত বলা হয় না। অতএব যদি নামায পড়ার সময় কেউ অন্তরে এক নামাযের নিয়ত করে এবং মুখে ভুলবশত অন্য নামাযের কথা উচ্চারণ করে তাহলে অন্তরে নিয়তকৃত নামাযই আদায় হবে। মুখে উচ্চারণকৃত নামায আদায় হবে না। কারণ মৌখিক নিয়ত ধর্তব্য নয়।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০৬, আদদুররুল মুখতার ১/৪১৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/২১৭।

প্রশ্ন ১১২ : কেউ যদি তাহাজ্জুদের সময় বিতর পড়ার নিয়তে ঈশার নামাযের পর ঘুমিয়ে পড়ে এবং তাহাজ্জুদের সময় উঠতে না পারে তাহলে সে উক্ত বিতর নামায কীভাবে আদায় করবে?

উত্তর : কেউ যদি বিতর নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সুবহে সাদেকের পূর্বে জাগ্রত হতে না পারে তাহলে সে জাগ্রত হওয়ার পর উক্ত বিতর নামায কাযা করে নেবে। উল্লেখ্য, উক্ত ব্যক্তি সাহিবে তারতীব অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক নামাযী হলে তাকে ফজরের আগেই বিতর কাযা করে নিতে হবে।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১১, রদ্দুল মুহতার ২/৩, আদদুররুল মুখতার ১/১৮১, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৪৪৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৪৪৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫০৭।

প্রশ্ন ১১৩ : শুধু মহিলাদেরকে নিয়ে তারাবীহর নামায জামা'আতের সাথে পড়ানোর হুকুম কী?

উত্তর : পুরুষের জন্য মহিলা জামা'আতের ইমামতি করা মাকরূহ। তবে যদি সে জামা'আতে কোনো পুরুষ কিংবা ইমাম সাহেবের কোনো মাহরাম মহিলা থাকে তাহলে মাকরূহ হবে না। কিন্তু যদি পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে এভাবে জামা'আতের আয়োজন করা জায়েয হবে না।– ১/৫৬৬, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৩০৪, আলহিদায়া ১/১২৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/৪৩৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৮৪।

প্রশ্ন ১১৪ : জনৈক ব্যক্তি ঈশা এবং বেতের নামাজ আদায়ের পর জানতে পারল, তার ঈশার নামাজ শুদ্ধ হয় নি; কিন্তু বেতের নামাজ হয়েছে। এমতাবস্থায় কি তাকে ঈশার নামাজের সাথে বেতের নামাজ ও পুনরায় পড়তে হবে?

উত্তর : বেতের নামাজ স্বয়ংসম্পন্ন একটি ওয়াজিব নামাজ। অতএব কেউ যদি ঈশা এবং বেতের নামাজ আদায়ের পর জানতের পারে, তার ঈশার নামাজ হয় নি তবে তাকে শুধু ঈশার নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে। বেতের নামাজ পুনরায় পড়তে হবে না। উল্লেখ্য, যদি ঈশার নামাজের ওয়াক্ত থাকাকালীন জানতে পারে, তার ঈশার নামাজ হয় নি তবে সে ঈশার নামাজের সাথে সুন্নতকেও পুনরায় পড়ে নিবে। অন্যথায় পুনরায় পড়তে হবে না।–ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১৫, রদ্দুল মুহতার ২/৬৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/২৪২, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪৫৭

প্রশ্ন ১১৫ : কোনো ব্যক্তি যদি নামাজের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব তরক করে অথবা মাকরূহ কাজ করে তাহলে এনামাজের বিধান কি?

উত্তর : নামাজের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব তরক করা কবিরা গুনাহ। সুতরাং কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব তরক করে কিংবা ইচ্ছয় বা অনিচ্ছায় মাকরূহ তাহরিমী পর্যায়ের কোনো কাজ করে তবে উভয় ক্ষেত্রে পুনরায় নামাজ পড়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যদি নামাজের কোনো ওয়াজিব ভুলে ছুটে যায় তাহলে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। সেজদায়ে সাহু করে নিলে নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। যদি সেজদায়ে সাহু না করে তাহলে নামাজ পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। তবে কেউ যদি কোনো ওযরবশত ওয়াজিব তরক করে, যেমন কেউ নামাজের সময় শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং সূরা ফাতেহা শেখার সুযোগ না পেয়ে নামাজ পড়ে নিলো তবে এক্ষেত্রে তাকে ওয়াজিব তরকের কারণে দ্বিতীয়বার নামাজ পড়তে হবে না।–সহীহ বুখারী হাদীস নং ২২৬, রদ্দুল মুহতার ১/৬৪,৪৫৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪০৪।

প্রশ্ন ১১৬ : মুক্তাদি যদি ইমামের পূর্বে সালাম ফিরিয়ে দেয় তাহলে তার নামাজের বিধান কি?

উত্তর : মুক্তাদি যদি কোনো শরঈ উজরের কারণে তাশাহহুদ পরিমাণ বসার পর ইমামের সালামের পূর্বে সালাম ফিরিয়ে দেয় তাহলে তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে। আর যদি শরঈ কোনো উজর ছাড়াই ইমামের পূর্বে সালাম ফিরিয়ে দেয় তাহলে তার নামাজ মাকরূহে তাহরীমির সাথে আদায় হবে। তবে এনামাজ পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।–সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪২৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৯১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৩২০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/২১০।

প্রশ্ন ১১৭ : কোনো ব্যক্তি যদি নামাজে সেজদায়ে তিলাওয়াত করে উঠে ভুলে সূরায়ে ফাতেহা পড়ে তাহলে তার এনামাজের বিধান কি?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি যদি নামাজে তিলাওয়াতের সেজদা করে উঠে ভুলে সূরা ফাতেহা পুনরায় পড়ে তাহলে তার নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।–ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১২৬, বাদাইউস সানায়ি ১/৪০৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩৯৩, ফাতহুলকাদীর ১/৫২০, ইমদাদুল আহকাম ১/৬৮০, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১১/৪৮৪

প্রশ্ন ১১৮ : কেউ যদি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার পর সিজদায়ে সাহু করতে ভুলে যায় তাহলে তার করণীয় কী?

উত্তর : যদি কারো সিজদায়ে সাহু ভুলে রয়ে যায় অতঃপর সে সালামের পর নামায পরিপন্থি কোনো কাজ না করে থাকে তাহলে সিজদায়ে সাহু করে নামায পূর্ণ করবে। আর যদি নামায পরিপন্থি কোনো কাজ করে তাহলে তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে।– আদদুররুল মুখতার ১/৪৫৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৫২৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৫।

প্রশ্ন ১১৯ : যদি কেউ মাটিতে কপাল ও নাক না রেখে সিজদা করে তাহলে তার সিজদার হুকুম কী?

উত্তর : সিজদার ক্ষেত্রে কপাল যমীনে রাখা শর্ত। যদি কপাল যমীনে না রাখা হয় তাহলে সিজদা আদায় হবে না। আর কপাল ও নাক উভয়টি যমীনে রাখা সুন্নাত। যদি কেউ কোনো ওযরবশত যমীনে কপাল রেখে সিজদা করতে না পারে তাহলে সে ইশারা করে সিজদা করবে। বিনা ওযরে ইশারার মাধ্যমে শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে সিজদা করলে সিজদাই হবে না। কারণ সিজদার সংজ্ঞা হলো- وضع الجبهة على الارض لا على سبيل السخرية অর্থাৎ আনুগত্য ও মর্যাদাবোধ নিয়ে যমীনে ললাট রাখা।– রদ্দুল মুহতার ২/১৩৪, আলবাহরুর রায়েক ১/৫১১, ৫৫৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৭০।

প্রশ্ন ১২০ : আমরা অনেকে কানটুপি পরিধান করি, যা কপালকে ঢেকে নেয়। প্রশ্ন হলো, কানটুপি পরিধান করার দ্বারা কপাল আবৃত থাকাবস্থায় সিজদা করলে সিজদা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : টুপি অথবা পাগড়ীর প্যাঁচ যদি কপালকে ঢেকে নেয় এবং এর উপর সিজদা করা হয় তাহলে সিজদা আদায় হয়ে যাবে। তবে এটা মাকরূহ হবে। আর যদি টুপি বা পাগড়ী কপাল থেকে উপরে হয় এতদসত্ত্বেও শুধু টুপি বা পাগড়ীর উপরের অংশ দ্বারা সিজদা করা হয় তাহলে কপাল দ্বারা সিজদা না করার কারণে সিজদা আদায় হবে না।– রদ্দুল মুহতার ২/২০৫, আলবাহরুর রায়েক ১/৫৫৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৮২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/৩৫৮।

প্রশ্ন ১২১ : মাসবূক ব্যক্তি তার প্রথম ও তৃতীয় রাকা'আতে ইমামের সাথে যখন বৈঠক করবে তখন তাশাহহুদ পড়বে কি না?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকা'আতে শরীক হয় তবে এক্ষেত্রে ইমামের দ্বিতীয় রাকা'আতের বৈঠক যদিও তার প্রথম রাকা'আত হচ্ছে তবুও ইমামের ইকতিদার জন্য তার উপর তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব। এমনিভাবে যখন সে ইমামের সাথে তার তৃতীয় রাকা'আতে বৈঠক করবে তখনও ওয়াজিব।– মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২৫০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/৪০৯।

প্রশ্ন ১২২ : যদি কোনো ব্যক্তি চার রাকা'আত নফল নামাযের নিয়ত করে। অতঃপর ইচ্ছা করে দুই রাকা'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে ফেলে তাহলে এক্ষেত্রে তাকে বাকী দু' রাকা'আত কাযা করতে হবে কি না?

উত্তর : চার রাকা'আত নফল নামাযের নিয়ত করার দ্বারা তার উপর চার রাকা'আত আবশ্যক হয় নি; বরং তার উপর দু' রাকা'আত আবশ্যক হয়েছে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে তার উপর বাকি দু' রাকা'আত কাযা করতে হবে না।– রদ্দুল মুহতার ২/১৭, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১১৪, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৭, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/২৮৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪৯৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/২৯০।

প্রশ্ন ১২৩ : চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম বৈঠক ছুটে গেলে তার নামাযের বিধান কী?

উত্তর : চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম বৈঠক ছেড়ে দিলে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। সিজদায়ে সাহু করলে তার নামায আদায় হয়ে যাবে। তবে যদি সিজদায়ে সাহু না করে নামায শেষ করে ফেলে তাহলে পুনরায় নামায পড়া ওয়াজিব।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১২২৫, রদ্দুল মুহতার ২/৮৪, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১২৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৩১৮।

প্রশ্ন ১২৪ : যদি কোনো ব্যক্তি চার রাকা'আত বিশিষ্ট সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকা'আতে সূরা ইখলাস পড়ে ফেলে তাহলে বাকি রাকা'আতে কোন কোন সূরা পড়বে?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি চার রাকা'আত বিশিষ্ট সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকা'আতে সূরা ইখলাস কিংবা সূরা নাস পড়ে ফেলে তাহলে তার করণীয় হলো, সে দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফালাক, তৃতীয় রাকা'আতে সূরা নাস এবং চতুর্থ রাকা'আতেও সূরা নাস পড়বে। উপরের কোনো সূরা পড়বে না। যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করে থাকে তবে নামায মাকরূহ হবে। অন্যথায় মাকরূহ হবে না। তেমনিভাবে যদি চার রাকা'আত বিশিষ্ট সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকা'আতেই সূরা নাস পড়ে ফেলে তবে বাকি রাকা'আতগুলোতেও সূরা নাস পড়বে অন্য সূরা পড়বে না। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় রাকা'আতকে প্রথম রাকা'আতের তুলনায় তিন বা ততোধিক আয়াত পরিমাণ লম্বা করা মাকরূহ। এর চেয়ে কম প্রলম্বিত করা মাকরূহ নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় রাকা'আতে প্রথম রাকা'আতে পাঠকৃত সূরার উপরের কোনো সূরা পাঠ করা সর্বাবস্থায় মাকরূহ। অতএব উল্লিখিত ক্ষেত্রে সূরা ইখলাসের তুলনায় সূরা ফালাক তিন আয়াত পরিমাণ লম্বা না হওয়ায় মাকরূহ হবে না।– রদ্দুল মুহতার ১/৫৪৬, ৫৪৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৭৮, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৩৫১, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৩১০, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪৪৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/৫০৪।

প্রশ্ন ১২৫ : কিয়ামুল লাইল নামায বসা অবস্থায় পড়া উত্তম না কি দাঁড়ানো অবস্থায়?

উত্তর : কিয়ামুল লাইল নামায দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। তবে বসে পড়া জায়েয আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পূর্ণ সওয়াব পাবে না; অর্ধেক পাবে।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১১১৬, রদ্দুল মুহতার ২/৩৬, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৪০২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/২৬৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/২৮৮।

প্রশ্ন ১২৬ : মসজিদের ভিতরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় যদি মসজিদের বাইরে রাস্তা থেকে কাতার শুরু করা হয় তাহলে কি তাদের ইকতিদা সহীহ হবে?

উত্তর : মসজিদের সিঁড়ির পর রাস্তা থেকে যে কাতার শুরু হয় সে কাতারের সিজদার স্থান থেকে মসজিদের ভিতরের কাতার পর্যন্ত দুই কাতার বা এর চেয়ে বেশি পরিমাণ

স্থান যদি ফাঁকা থাকে তবে তাদের ইকতিদা সহীহ হবে না।— আদদুররুল মুখতার ২/৩৩০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৮৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৩০৬।

প্রশ্ন ১২৭ : আলোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কি অন্ধকারে নামায আদায় করা যাবে?

উত্তর : যদি কিবলার দিক সঠিক হয় তাহলে অন্ধকারে নামায আদায় করাতে কোনো অসুবিধা নেই। উল্লেখ্য, লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, সিজদার জায়গা দেখা না গেলে নামায হয় না বা নামায মাকরূহ হয় —এটা একটা প্রচলিত ভুল মাসআলা।— সুনানে আবূ দাউদ; ৮৭৯, আলবাহরুর রায়েক ১/৫০০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৬৪, আদদুররুল মুখতার ২/১১৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/১২২।

প্রশ্ন ১২৮ : এক পায়ের উপর ভর করে নামায আদায় করার হুকুম কী?

উত্তর : নামাযের ভিতরে উভয় পায়ের উপর ভর করে দাঁড়ানো উচিত। ফুকাহায়ে কেরাম বিনা প্রয়োজনে এক পায়ের উপর ভর করে দাঁড়ানো অথবা এক পা মাটি থেকে উঠিয়ে রাখাকে মাকরূহ বলেছেন। কারণ এতে নামাযের মধ্যে অলসতা প্রকাশ পায়।— সূরা মুমিনীন; আয়াত ২, সূরা বাকারা; আয়াত ২৩৯, রদ্দুল মুহতার ২/১৩১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৬৯, আলজাওহারাতুন নায়্যিরা ১/৬৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৮০, ১৫৪।

প্রশ্ন ১২৯ : যদি কোনো ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করে অথবা কুরআন তিলাওয়াত করে তাহলে তার হুকুম কী? এবং তার নামায বা তিলাওয়াতের হুকুম কী?

উত্তর : অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়া এবং কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম। কেননা কুরআন ও হাদীসে অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তে ও কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি কেউ ভুলবশত অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়ে বা কুরআন তিলাওয়াত করে তবে এ ভুলের কারণে যদিও তার গুনাহ হবে না কিন্তু যে নামায সে অপবিত্র অবস্থায় পড়েছে তা তাকে পুনরায় পড়তে হবে। আর যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে দীনকে অবজ্ঞা করে অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়ে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।— সূরা নিসা; আয়াত ৪৩, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২২৪, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১৩১, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ২০৪৩, আলবাহরুর রায়েক ৫/২০২, রদ্দুল মুহতার ৪/২২২, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৭/৩২২, কিতাবুল ফিকহি আলা মাযাহিবিল আরবা'আ ১/১১৯, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ১৬/৫২, ৫৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/২১৯।

প্রশ্ন ১৩০ : কেউ যদি নামাযের কিরা'আতে প্রথম তিন আয়াতের মধ্যে কিরাআত ভুলে যায় বা জড়িয়ে যায় এবং চেষ্টা করার পরও ছাড়াতে না পারে এবং এমতাবস্থায় অন্য সূরা শুরু করে তাহলে তার নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : নামাযের কিরাআতে প্রথম তিন আয়াতের মধ্যে যদি কিরাআত ভুলে যায় বা জড়িয়ে যায় এবং চেষ্টা করার পরও ছাড়াতে না পারে এবং এমতাবস্থায় অন্য সূরা শুরু

করে তাহলে নামায হয়ে যাবে। এতে কোনো সমস্যা হবে না। তবে যে পরিমাণ কিরাআত পড়লে নামায হয়ে যায় সে পরিমাণ পড়ার পর এমন পরিস্থিতি হলে অন্য সূরা শুরু না করে রুকুতে চলে যাবে।— রদ্দুল মুহতার ১/৬২৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪২০, নিযামুল ফাতাওয়া ২/২৩৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪৪৪।

প্রশ্ন ১৩১ : যদি কোনো ছাত্র তার মাদরাসা থেকে ৪৮ মাইলের চেয়ে কম দূরত্বে তিন দিনের জন্য তাবলীগে যায়, কিন্তু সেখান থেকে তার বাড়ি ৪৮ মাইলের চেয়ে বেশি দূরত্বে অবস্থিত। তাহলে সে কি তাবলীগে কসর করবে?

উত্তর : সফরে নামায কসর করার জন্য সফরটি শরঈ সফর হওয়া শর্ত। এ জন্য কমপক্ষে তিন দিনের দূরত্ব সমপরিমাণ তথা ৪৮ মাইল তথা ৭৮ কি.মি. দূরত্ব পরিমাণ সফরের নিয়ত থাকতে হয়। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত ক্ষেত্রে উক্ত ছাত্র যদি তাবলীগ থেকে মাদরাসায় ফিরে আসার নিয়ত না করে থাকে বরং সেখান থেকেই বাড়িতে যাওয়ার নিয়ত থাকে তাহলে তাবলীগে এবং সেখান থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে নামায কসর করবে। আর যদি তাবলীগ থেকে মাদরাসায় ফিরে আসার নিয়ত থাকে তাহলে তাবলীগে নামায কসর করবে না। তবে মাদরাসা থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে কসর করবে।— আদদুররুল মুখতার ২/৫৯৯, ৬১৪, আলবাহরুর রায়েক ২/২২৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫৬৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৫৬১, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৯৫, আনওয়ারে রহমত ৮৪।

প্রশ্ন ১৩২ : সুদ গ্রহণকারী ইমামের পিছনে নামায আদায় করলে কি নামায সহীহ হবে?

উত্তর : সুদ গ্রহণ করা একটি চরম ঘৃণিত হারাম কাজ। যে সুদ গ্রহণ করে সে ফাসেক এবং মারাত্মক গুনাহে লিপ্ত। তাকে ইমাম বানানো মাকরূহে তাহরীমী। অতএব এ ধরনের ইমামের পিছনে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী।— সূরা বাকারা; আয়াত ২৭৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৯৮, রদ্দুল মুহতার ২/২৯৮, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/২৫১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৪৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/১১৫।

প্রশ্ন ১৩৩ : নামাযের ভিতর বাম হাত ছেড়ে দিয়ে কোনো কাজ করা যাবে কি না?

উত্তর : নামাযের ভেতরে যদি একান্ত প্রয়োজনে শরীর চুলকানো বা অন্য কোনো কাজে হাত ব্যবহার করতেই হয় তাহলে ডান হাত ব্যবহার করবে। আর যদি একান্ত বাম হাতের প্রয়োজন হয় তবে বাম হাতও ব্যবহার করতে পারবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে আমলে কাসীর যেন না হয়। আমলে কাসীর হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, একসাথে দুই হাতের ব্যবহার এবং এক হাতের এমন অধিক ব্যবহার যাতে দর্শক মনে করবে যে লোকটি নামাযে নেই, —আমলে কাসীর হিসেবে ধর্তব্য।— সহীহ বুখারী; হাদীস ১৪৫, রদ্দুল মুহতার ১/৬৪৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/৩৫৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪২৪।

প্রশ্ন ১৩৪ : নামাযরত অবস্থায় যদি কারো মাথা থেকে টুপি পড়ে যায় তাহলে এমতাবস্থায় তার করণীয় কী?

উত্তর : নামাযরত অবস্থায় আমলে কাসীর করার দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায়। আর আমলে কাসীর বলা হয়, এমন কোনো কাজ করা যা করতে দু'হাতের প্রয়োজন হয়। অতএব মাথা হতে পড়ে যাওয়া টুপি নামাযে কিয়াম অথবা রুকুরত অবস্থায় তুলে মাথায় দেওয়া যাবে না। কেউ যদি এমতাবস্থায় টুপি তুলে মাথায় দেয় তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে বসা অথবা সিজদারত অবস্থায় পড়ে যাওয়া টুপি উঠিয়ে পরিধান করা যাবে। বরং পরিধান করাই উত্তম হবে। তবে এক্ষেত্রে দু'হাত ব্যবহার করবে না। এক হাত দিয়ে টুপি তুলে মাথায় পরে নিবে। ।– আদদুররুল মুখতার ১/৪৭৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১০২-১০৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/১২৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪৩৭।

প্রশ্ন ১৩৫ : নামাযরত অবস্থায় যদি কারো পরিধেয় লুঙ্গি খুলে যায় তাহলে এমতাবস্থায় তার করণীয় কী?

উত্তর : যদি নামাযের ভিতরে কারো লুঙ্গি খুলে যায় তাহলে প্রথমে সে এক হাত দ্বারা একপার্শ্ব ঠিক করে নিবে। অতঃপর তিন তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করে অপর হাত দ্বারা অপর পার্শ্ব ঠিক করবে।– আদদুররুল মুখতার ১/৪৭৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১০২-১০৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/১২৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪৩৭।

প্রশ্ন ১৩৬ : কোনো মাসবূক যদি ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে দেয় তাহলে মাসবূকের নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : কোনো মাসবূক যদি ভুলক্রমে ইমামের সাথে একদিকে কিংবা উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে দেয় এবং নামায নষ্ট হওয়ার মতো কোনো কাজে লিপ্ত না হয় তবে সে এই অবস্থায় বাকি নামায পূর্ণ করে সিজদায়ে সাহু করে নামায শেষ করবে। এতে তার নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফিরিয়ে দেয় তবে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।– আদদুররুল মুখতার ২/৯১, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৪৭৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/৪০৫।

প্রশ্ন ১৩৭ : কারো দায়িত্বে যদি কয়েক বছরের নামায কাযা থাকে তাহলে সে কীভাবে তা আদায় করবে?

উত্তর : কারো উপর যদি কয়েক বছরের নামায কাযা হয়ে থাকে তবে তা আদায় করার পদ্ধতি হলো, সে নিয়ত করবে যে, আমার সর্বপ্রথম যোহরের যে নামায কাযা হয়েছে তা আদায় করছি। এরপর পরবর্তী যোহরের নামায। এভাবে প্রত্যেক ওয়াক্তের নিয়ত করতে হবে এবং একই ওয়াক্তের মধ্যে একাধিক ওয়াক্তের কাযাও পড়তে পারবে।– আদদুররুল মুখতার ২/৫৩৮, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৪৪৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৪৪৬।

প্রশ্ন ১৩৮ : নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার প্রয়োজন হলে কতটুকু দূর দিয়ে অতিক্রম করা যাবে?

উত্তর : নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সীমা হলো, ছোটো মসজিদে সুতরা বা আড়াল ব্যতীত নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না। আর বড়ো মসজিদে বা মাঠে নামাযরত ব্যক্তির সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা অবস্থায় যতোটুকু স্থান দৃষ্টিতে আসে তার ভিতর দিয়ে সুতরা ব্যতিরেকে অতিক্রম করা যাবে না। আর এর পরিমাণ হলো, তিন কাতার বা ২.৫ গজ পরিমাণ স্থান। আর সচরাচর মানুষ চলাচলের স্থান হলে সিজদার স্থান বাদ দিয়ে সামনে দিয়েও অতিক্রম করতে পারবে।

উল্লেখ্য, উল্লেখ্য, বড়ো মসজিদ বলতে এমন মসজিদ উদ্দেশ্য যার দৈর্ঘ কমপক্ষে ৪০ গজ হবে। দৈর্ঘ্যে এর চেয়ে ছোটো হলে সেটকে ছোটো মসজিদ হিসেবে ধরা হবে।– আদদুররুল মুখতার ১/৬২৪, রদ্দুল মুহতার ১/৬৩৪, ৬৩৬, আলবাহরুর রায়েক ২/২৭, ২৮, ইমদাদুল আহকাম (নতুন সংস্করণ) ২/৫৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/১৭৮, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৩৪২।

প্রশ্ন ১৩৯ : কোনো ব্যক্তি যদি নামাযরত ব্যক্তির সামনে বসে থাকে তাহলে কি সে সেখান থেকে সরে যেতে পারবে?

উত্তর : কোনো নামাযরত ব্যক্তির সামনে যদি কেউ বসা থাকে আর সে যদি প্রয়োজনে প্রস্থান করতে চায় তাহলে সে কোনো একপাশ দিয়ে প্রস্থান করতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হয় না।– সহীহ বুখারী; হাদীস ৫১৪, রদ্দুল মুহতার ১/৬৩৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৭৯২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/১৭৮।

প্রশ্ন ১৪০ : কেউ যদি চার রাকা'আত ফরয নামাযে শেষ বৈঠক করে সালাম না ফিরিয়ে ভুলে সুন্নাত নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং আরো দু' রাকা'আতসহ মোট ছয় রাকা'আত আদায় করে এবং সাহু সিজদা করে নামায শেষ করে তাহলে তার এ নামাযের বিধান কী?

উত্তর : যদি কেউ চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযের শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরানোর আগে ভুলে পঞ্চম রাকা'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় আর পঞ্চম রাকা'আতের সিজদা করার পূর্বে ভুলের কথা স্মরণ হয় তাহলে বসে পড়বে এবং সিজদায়ে সাহু করে নামায শেষ করবে। আর যদি সিজদা করে ফেলে তবে ঐ রাকা'আতের সাথে আরেক রাকা'আত মিলিয়ে ছয় রাকা'আত পূর্ণ করবে এবং সিজদায়ে সাহু করে নামায শেষ করবে। এক্ষেত্রে চার রাকা'আত ফরয এবং শেষ দু' রাকা'আত নফল বলে গণ্য হবে, সুন্নাত হিসেবে নয়।– আদদুররুল মুখতার ৩/৫৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১২৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৩২।

প্রশ্ন ১৪১ : যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত সুন্নাতে যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া অবস্থায় ইকামত শুরু হয়ে যায় তাহলে করণীয় কী? সালাম ফিরিয়ে ফরয নামাযে শরীক হবে না কি চার রাকা'আত পূর্ণ করবে?

উত্তর : যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত সুন্নাতের প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া অবস্থায় যদি ইকামত শুরু হয়ে যায় তাহলে সালাম ফিরিয়ে ফরয নামাযে শরীক হয়ে যাবে। এই দুই রাকা'আত নামায নফলে পরিণত হবে। আর সুন্নাত চার রাকা'আত ফরয নামাযের পর আদায় করে নেবে।— সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৪২১, শরহে বেকায়া ১/১৮০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১২, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/২৯৯, ৩/৩১২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/২৮৮।

প্রশ্ন ১৪২ : জনৈক ব্যক্তির উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছে। কিন্তু সে ভুলে সিজদায়ে সাহু আদায় না করে সালাম ফিরিয়ে দিয়েছে। এখন তার করণীয় কী? তার নামায হবে কি?

উত্তর : সালামের পর নামাযের প্রতিবন্ধক কোনো কাজ যেমন কথা বলা, কিবলার দিক হতে সীনা ঘুরে যাওয়া ইত্যাদি না করে থাকলে মনে হওয়ার সাথে সাথে সিজদায়ে সাহু আদায় করে যথারীতি নামায শেষ করবে। আর নামাযের প্রতিবন্ধক কোনো কাজ করে থাকলে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।— খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৭৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১২৭, ১২৯, ইমদাদুল আহকাম ২/২৮৩, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ২/৩০০।

প্রশ্ন ১৪৩ : কখন ইকতিদা করলে তাকবীরে উলার ফযীলত পাওয়া যাবে?

উত্তর : মুসল্লী যদি ইমামের সাথে সাথে নিয়ত করে হাত বেঁধে ইকতিদা করে তাহলে এই ক্ষেত্রে সকলের মতে তাকবীরে তাহরীমার সওয়াব পাবে। আর যদি ছানা এবং সূরা ফাতিহার পর রুকুর আগে ইকতিদা করে তাহলে এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, প্রথম রাকা'আত পাওয়ার দ্বারাই তাকবীরে উলার সওয়াব পাওয়া যাবে।— সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৪১, রদ্দুল মুহতার ২/২৪০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৬৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/১, ১২৮।

প্রশ্ন ১৪৪ : বেশ কিছুদিন যাবত আমাদের মাদরাসার হলরুমটি পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এর ফলে হলরুমটি মসজিদে পরিণত হয়েছে কি না এবং সেখানে রাত্রি যাপনকালে কারো স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ কামরা থেকে বের হয়ে যেতে হবে কি না?

উত্তর : মাদরাসার হলরুমে নামায আদায় করার দ্বারা হলরুমটি শরঈ মসজিদে পরিণত হয় নি; বরং মসজিদ বলা হয় এমন স্থানকে, যাকে কোনো মুসলমান ফরয নামাযের জন্য ওয়াকফ করেছেন। অতএব হলরুমে রাত্রি যাপনকালে কারো স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে সাথে সাথে রুম ত্যাগ করা জরুরি নয়। তবে এটা ভিন্ন মাসআলা যে, গোসল ফরয হয়ে গেলে কোনো ওযর না থাকলে তাড়াতাড়ি গোসল করা জরুরি। কেউ

সাথে সাথে গোসল না করলে কমপক্ষে উযূ করে নেবে।— আদদুররুল মুখতার ৪/৩৫৬, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলাদ দুররিল মুখতার ২/৫৩৬, ফাতাওয়া উসমানী ২/৫০৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/৬৯।

প্রশ্ন ১৪৫ : মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করার বিধান কী?

উত্তর : যে সকল মসজিদের ইমাম ও মুয়ায্যিন নির্ধারিত নেই এবং নামাযের কোনো সময়সূচি নেই সে সকল মসজিদে একাধিক জামা'আত করা জায়েয আছে। আর যে মসজিদে ইমাম ও মুয়ায্যিন নির্ধারিত আছে সেখানে দ্বিতীয় জামা'আত করা মাকরূহ। তবে যারা প্রথম জামা'আত করেছে তারা যদি এই মহল্লার অধিবাসী না হয় অথবা এই মহল্লারই অধিবাসী কিন্তু তারা চুপিসারে নামাযের নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রথম জামা'আত কায়েম করেছে তাহলে এমতাবস্থায় দ্বিতীয় জামা'আত কায়েম করা জায়েয আছে। এমনিভাবে ইমামসহ সর্বমোট চার জন হলেও দ্বিতীয় জামা'আত জায়েয আছে, এর বেশি হলে মাকরূহে তাহরীমী হবে।— রদ্দুল মুহতার ২/৬৪, ২৮৮, বাদায়িউস সানায়ে' ১/৩৭৮,৩৭৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৪, ইমদাদুল আহকাম ২/১১১।

প্রশ্ন ১৪৬ : বর্তমানে বিভিন্ন দেশের টাকার মধ্যে মানুষ অথবা অন্যান্য জীব-জন্তুর ছবি থাকে। এ টাকা সাথে রাখা এবং তা নিয়ে নামায আদায় করা যাবে কি না?

উত্তর : নামাযের বাইরে যে কোনো ধরনের ছবিযুক্ত টাকা সাথে রাখা জায়েয। তবে কোনো প্রাণীর আকৃতি বোঝা যায় এমন ছবি নিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। কিন্তু টাকা যদি পকেট, মানিব্যাগ বা অন্য কিছুর দ্বারা ঢাকা থাকে অথবা ছবি যদি এত ছোটো হয় যার আকৃতি বোঝা যায় না তাহলে এমন টাকা সাথে নিয়ে নামায পড়া জায়েয আছে।— রদ্দুল মুহতার ১/৬৪৯, জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩/২৩৭, ৩৩৩, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৪৩৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৯/২৮৮।

প্রশ্ন ১৪৭ : এমন ব্যক্তি যদি ইমাম হয়, যে ব্যক্তি সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না; বরং কিরাআতের মধ্যে লাহনে জলী তথা চরম ভুল পড়ে। আর তার মুক্তাদীদের মধ্যে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারে এমন ব্যক্তিও বিদ্যমান থাকে তাহলে কি সকলের নামায নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর : সহীহ-শুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতকারী যদি অশুদ্ধ তিলাওয়াতকারীর পিছনে ইকতিদা করে তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যে সকল মুক্তাদী সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে জানে না তাদের নামায নষ্ট হবে না।— রদ্দুল মুহতার ১/৫৯৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৮৫, বাদায়িউস সানায়ে' ১/৩৫০, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/২৫৫, আলহিদায়া ১/১২৭, আলকাওয়াদুল রাজেহ ১/৯৪, মাসাইলে নামায; পৃষ্ঠা ১০৮।

প্রশ্ন ১৪৮ : ইমামের জন্য পাগড়ী পরিধান করে নামায পড়ানোর বিধান কী?

উত্তর : ইমামের জন্য পাগড়ী পরিধান করে নামায পাড়ানো মুস্তাহাব। তদ্রূপ মুক্তাদীদের জন্যও পাগড়ী পরিধান করে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। পাগড়ী পরিধান না করে নামায পড়লে নামাযে কোনো ক্ষতি হবে না। তবে যদি এমন শহর হয় যেখানে পাগড়ী পরিধান করা ছাড়া বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়াকে দৃষ্টিকটু মনে করা হয় সেখানে পাগড়ী পরিধান করা ছাড়া নামায পড়ানো মাকরূহ হবে। উল্লেখ্য, কোনো কোনো স্থানে ইমামকে এ উদ্দেশে পাগড়ী পরতে বাধ্য করা হয় যে, ইমামের পাগড়ী পরিধানের ফলে মুক্তাদীরাও পাগড়ী পরিধানের ২৫/৭০ গুণ সওয়াব পেয়ে যাবে। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। একেতো পাগড়ী সংক্রান্ত ২৫/৭০ গুণ সওয়াবের হাদীসটি জাল এবং বানোয়াট। দ্বিতীয়ত ইমামের পাগড়ী পরার দ্বারা মুক্তাদী পাগড়ী পরার মুস্তাহাবের ফযীলতই পাবে না। আর ২৫/৭০ গুণ সওয়াব তো অনেক দূরের কথা।– আলবাহরুর রায়েক ১/৪৬৮, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২১১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/৫৬, মাসাইলে ইমামত; পৃষ্ঠা ১৫২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/১৩৬, তুহফাতুল আহওয়াযী শরহু সুনানিত তিরমিযী (মাকতাবায়ে শামেলা সংস্করণ) ৯/৩৭৩, শরহু সুনানিত তিরমিযী (মাকতাবায়ে শামেলা সংস্করণ) ৯/৪৭৪।

প্রশ্ন ১৪৯ : কেউ যদি চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে তিন রাকা'আত পড়ে ভুলে সালাম ফিরিয়ে দেয় তাহলে ঐ নামাযের হুকুম কী এবং তার করণীয় কী?

উত্তর : যদি কেউ চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাকা'আত অথবা তিন রাকা'আত পড়েই ভুলে সালাম ফিরিয়ে দেয় এই মনে করে যে, তার নামায পূর্ণ হয়ে গেছে, তাহলে তার করণীয় হলো, সালাম ফিরানোর পর নামায ভেঙে যায় এমন কোনো কাজ না করে থাকলে অর্থাৎ কারো সাথে কথা না বলে থাকলে অথবা কিবলা থেকে বক্ষ না ঘুরিয়ে থাকলে সে বাকী নামায পূর্ণ করবে এবং সিজদায়ে সাহু করবে। এক্ষেত্রে নামায পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই। তবে নামায ভেঙে যাওয়ার মতো কোনো কাজ করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। ফলে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।– আদদুররুল মুখতার ২/৯১-৯২, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলাদ দুররিল মুখতার ১/৩১৬, আলবাহরুর রায়েক ২/১৯৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৫০৪।

প্রশ্ন ১৫০ : যদি কেউ একই সূরা একাধিক রাকা'আতে তিলাওয়াত করে তাহলে তার বিধান কী?

উত্তর : যদি কারো শুধুমাত্র একটি সূরা মুখস্থ থাকে আর সে উক্ত সূরাই প্রত্যেক রাকা'আতে তিলাওয়াত করে তাহলে তা মাকরূহ হবে না। তবে যদি কারো একাধিক সূরা মুখস্থ থাকে আর সে ফরয নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে একই সূরা প্রত্যেক রাকা'আতে তিলাওয়াত করে তাহলে এমনটি করা মাকরূহ হবে। কিন্তু ভুলে এমনটি করলে মাকরূহ হবে না। আর নফল নামাযে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কোনো অবস্থায়ই মাকরূহ হবে না।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৮১৬, রদ্দুল মুহতার ১/৫৪৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া

১/৭৮, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৩৫২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/৪৯৭।

প্রশ্ন ১৫১ : যদি কোনো ব্যক্তি তিন অথবা চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম বৈঠক না করে ভুলে দাঁড়িয়ে যায় এবং পরক্ষণেই আবার বসে পড়ে তাহলে এ নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি তিন অথবা চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম বৈঠক না করে ভুলে উঠে যায় এবং বসার নিকটবর্তী থাকাবস্থাতেই স্মরণ হওয়ায় আবার বসে পড়ে তাহলে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। আর যদি সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যায় অথবা দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয় তাহলে বসবে না। এভাবেই নামায শেষ করবে এবং প্রথম বৈঠক পরিত্যাগ করার কারণে সিজদায়ে সাহু আদায় করবে। কিন্তু এরপরও যদি কেউ দাঁড়ানো থেকে বসে যায় তাহলে মাকরূহ হবে, তবে নামায নষ্ট হবে না। সাহু সিজদা করে নিলেই সহীহ হয়ে যাবে।– হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৪৬৭, রদ্দুল মুহতার ২/৮৪, আলবাহরুর রায়েক ২/১৭৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৪৯১, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৪, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৬২০।

প্রশ্ন ১৫২ : জনৈক ব্যক্তি জুমু'আর নামাযে ইমাম সাহেবকে শেষ বৈঠকে পেল। এখন ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পর সে দু' রাকা'আত পড়বে না কি যোহরের নামায পড়বে?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের মধ্যে পায় তাহলে সে সালাম ফিরানোর পর জুমার দু' রাকা'আত পড়বে, যোহর পড়বে না।– রদ্দুল মুহতার ৪/৩৩, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৫২২, খাইরুল ফাতাওয়া ৩/৭৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/৯৫।

প্রশ্ন ১৫৩ : যে ব্যক্তি মাঝে মাঝে নামায ছেড়ে দেয় কিন্তু ক্বিরাআত শুদ্ধ। এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানালে নামায শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায পড়ে না সে মারাত্মক গুনাহে লিপ্ত এবং ফাসিক। এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানানো মাকরূহে তাহরীমী। তবে তার পিছনে যে নামায পড়া হবে তা আদায় হয়ে যাবে, পুনরায় পড়তে হবে না।– রদ্দুল মুহতার ২/২৯৮, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৩০২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/১০৪, ১০৭।

প্রশ্ন ১৫৪ : কুরআন স্পর্শ করার জন্য উযূ করলে সে উযূ দ্বারা নামায পড়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : কুরআন পড়ার জন্য যে উযূ করা হয়েছে তার দ্বারা নামায পড়া জায়েয আছে।– বাদায়িউস সানায়ে' ১/১০৬, রদ্দুল মুহতার ১/১০৭।

প্রশ্ন ১৫৫ : যদি কোনো ব্যক্তি মহিলাদের ইমাম হয়ে এভাবে নামায পড়ায় যে, তার মাঝে ও মহিলাদের মাঝে পর্দা ইত্যাদির অন্তরাল থাকে এবং ইমাম সাহেব চৌকিতে দাঁড়ায় আর মহিলারা নীচে দাঁড়ায় তাহলে এই নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : যদি ইমামের সাথে কোনো পুরুষ বা মাহরাম মহিলা না থাকে তাহলে মাঝে পর্দা থাকুক বা না থাকুক এভাবে অপরিচিত পুরুষের সাথে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। আর যদি পুরুষ বা মাহরাম মহিলা থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। তবে এভাবে জামা'আত করা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

আর ইমাম সাহেব যদি এককভাবে মুকতাদীদের চেয়ে এক হাত বা তার চেয়ে উঁচু স্থানে দাঁড়ায় এবং ইমামের সাথে ঐ চৌকিতে কিছু মুক্তাদী না দাঁড়ায় তাহলে নামায মাকরূহ হবে। অন্যথায় নামায মাকরূহ হবে না। আর চৌকি সাধারণত এক হাতের চেয়ে উঁচু হয়ে থাকে। তাই বর্ণিত ক্ষেত্রে আদায়কৃত নামায মাকরূহ হবে।– রদ্দুল মুহতার ১/৫৬৬, ৬৪৬, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ৬/২১১, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৩৯৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৮৪।

প্রশ্ন ১৫৬ : যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম রাকা'আতে ভুলে বৈঠক করে ফেলে অতঃপর স্মরণে আসার সাথে সাথেই দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকা'আত পূর্ণ করে এবং সিজদায়ে সাহু করে নামায শেষ করে তাহলে তার নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম বা তৃতীয় রাকা'আতে বৈঠক করে এক রোকন তথা তিন বার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলা পরিমাণ সময় বিলম্ব করে ফেলে তাহলে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর যদি তিন তাসবীহ আদায় পরিমাণ সময়ের চেয়ে কম বিলম্ব করে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।– রদ্দুল মুহতার ১/৪৬৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫২৯, ৫৩৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৪৮৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৩৪।

প্রশ্ন ১৫৭ : তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতের আঙ্গুল ও তালু কীভাবে রাখতে হবে?

উত্তর : তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতের আঙ্গুল একেবারে ফাঁকা করে রাখবে না এবং মিলিয়েও রাখবে না; বরং স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে। উভয় হাতের অঙ্গুলী কান বরাবর রাখবে, বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতি বরাবর রাখবে। কানের লতি স্পর্শ করা জরুরি নয় এবং স্পর্শ করতেও কোনো বাধা নেই। হাতের তালু কিবলামুখী করে রাখবে।– রদ্দুল মুহতার ১/৪৭৫, ৪৮২, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৭৩, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৯৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/১৮।

প্রশ্ন ১৫৮ : যদি কোনো ব্যক্তি সালাতুত তাসবীহর মধ্যে তাসবীহ কম-বেশি করে ফেলে তাহলে তার করণীয় কী?

উত্তর : যদি সালাতুত তাসবীহর মধ্যে তাসবীহ পড়া ভুলে যায় বা নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে কম পড়ে তাহলে তা পরের রুকনে আদায় করে নিবে। তবে ছুটে যাওয়া তাসবীহ রুকু থেকে উঠার পর ও দু' সিজদার মাঝে আদায় করবে না। আর যদি নামায শেষ

করার পর স্মরণ হয় যে, তাসবীহ কম পড়েছে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে তাসবীহ বেশি পড়ে তাহলে এ নামায সালাতুত তাসবীহ হিসেবে গণ্য হবে না এবং সালাতুত তাসবীহের যে সওয়াবের কথা বলা হয়েছে তাও পাবে না। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে বেশি পড়লে কোনো সমস্যা নেই। উল্লেখ্য, তাসবীহ কম-বেশি হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।– মিরকাতুল মাফাতীহ ৩/৩৭৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/২১৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/২৬৬।

প্রশ্ন ১৫৯ : ফরয নামাযের পর যে সকল মাসনূন দু'আ পড়া হয় যেমন, তাসবীহে ফাতেমী, আয়াতুল কুরসী এগুলো সুন্নাতের পূর্বে পড়া উত্তম না কি সুন্নাতের পর পড়া উত্তম?

উত্তর : যে সকল ফরয নামাযের পর সুন্নাত আছে সে সকল ফরয নামাযের পর সুন্নাত ও নফল নামায আদায় করে এরপর মাসনূন দু'আ পড়া উত্তম। আর যে সকল ফরয নামাযের পর সুন্নাত নেই যেমন, ফজর ও আছর সে সকল ফরয নামাযের পর পরই মাসনূন দু'আ ইত্যাদি পড়া উত্তম। তবে তিন বার ইস্তিগফার ও اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذاالجلال والاكرام এ দু'আটি প্রত্যেক ওয়াক্তেই ফরযের পর পরই পড়া সুন্নাত।– সহীহ মুসলিম; হাদীস ৫৯১, রদ্দুল মুহতার ১/৫৩০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৩০।

প্রশ্ন ১৬০ : যদি তাশাহ্হুদ পড়ার ক্ষেত্রে দু'একটি শব্দ ছুটে যায় তাহলে কি সিজদায়ে সাহু করতে হবে?

উত্তর : তাশাহুদ পুরা পড়া ওয়াজিব। সুতরাং এর থেকে একটি শব্দও ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।– আদদুররুল মুখতার ২/১৫৯, আলবাহরুর রায়েক ২/১৬৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৮।

প্রশ্ন ১৬১ : সালাতুত তাসবীহ জামা'আতের সাথে আদায় করার বিধান কী?

উত্তর : সালাতুত তাসবীহ নফল নামায। আর নফল নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা মাকরূহ। তবে যদি ডাকাডাকি করা ব্যতীত দু'তিন জন শরীক হয়ে যায় তাহলে এতে সমস্যা নেই। কিন্তু মুসল্লীদের সংখ্যা ৩-এর বেশি হয়ে গেলে মাকরূহ বলে গণ্য হবে।– ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/২৯২, রদ্দুল মুহতার ২/৪৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৮৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৩৭৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/২৬৬।

প্রশ্ন ১৬২ : যদি কোনো ইমাম সাহেব তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও মিলায় তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কী?

উত্তর : সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করা উচিত নয়।– রদ্দুল মুহতার ২/১৫০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৫০৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫০।

প্রশ্ন ১৬৩ : যদি কোনো ব্যক্তি কয় রাকা'আত পড়েছে তা একেবারেই ভুলে যায় তাহলে এমতাবস্থায় তার করণীয় কী?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি ভুলে গেল যে, সে কত রাকা'আত নামায পড়েছে। এটা যদি তার জীবনে প্রথম ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে সে নামায ছেড়ে দিয়ে পুনরায় নতুন করে পড়বে। আর যদি এরূপ ঘটনা তার প্রায়ই ঘটে থাকে তাহলে সে চিন্তা-ভাবনা করে প্রবল ধারণার উপর আমল করবে। প্রবল ধারণা না আসলে একীন তথা সর্বনিম্ন রাকা'আত সংখ্যার উপর আমল করবে। আর বৈঠক হতে পারে এমন প্রত্যেক রাকা'আতে তাশাহ্হুদ পরিমাণ সময় বসবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু করবে। তবে প্রবল ধারণার উপর আমল করার ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে তিন তাসবীহ বা এক রুকন পরিমাণ বিলম্ব হলে সিজদায়ে সাহু করবে; অন্যথায় নয়।– আদদুররুল মুখতার ২/৯৩-৯৪, রদ্দুল মুহতার ২/৯৪, আলহিদায়া ১/১৬০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫৫১, মাসাইলে নামায; পৃষ্ঠা ২৯৯।

প্রশ্ন ১৬৪ : যদি কোনো ব্যক্তি পাখির মুখ থেকে সিজদার আয়াত শ্রবণ করে তাহলে কি তার উপর সিজদা করা ওয়াজিব হবে?

উত্তর : পাখির মুখ হতে সিজদার আয়াত শ্রবণ করার দ্বারা শ্রবণকারীর উপর সিজদা করা ওয়াজিব হবে না।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩২, আদদুররুল মুখতার ২/১০৮, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৪৮৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৫৪৯।

প্রশ্ন ১৬৫ : কেউ যদি নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতের যেকোন রাকা'আতে সূরা ফাতিহা একাধিকবার তিলাওয়াত করে ফেলে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : কেউ যদি নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতের কোনো রাকা'আতে ভুলে সূরা ফাতেহা পূর্ণ বা তিন আয়াত পরিমাণ একাধিকবার তিলাওয়াত করে ফেলে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১২৬, রদ্দুল মুহতার ১/৪৬০, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৩১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৪৮৪।

প্রশ্ন ১৬৬ : বেশির ভাগ আন্তঃনগর ট্রেনে নামাযের কক্ষ রয়েছে। তবে ট্রেন চলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায পড়া কঠিন হয়। কারণ ঝাঁকুনির দরুন পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় বা পড়েও যায়। আবার নামায অবস্থায় ট্রেন দিক পরিবর্তন করলে কেবলা ঠিক রাখা মুশকিল হয়। এমতাবস্থায় কীভাবে নামায আদায় করব?

উত্তর : ট্রেন চলাবস্থায় নামাযের কক্ষে দাঁড়িয়ে এবং কেবলার দিকে ফিরেই নামায আদায় করবে। তবে যদি কোনো ব্যক্তি এমন দুর্বল হয় যে, দাঁড়ালে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাবোধ করে তাহলে সে বসে নামায আদায় করবে। আর যদি নামাযের মধ্যে ট্রেন কেবলার দিক থেকে ঘুরে যায় এবং সে ঘোরার অবস্থা জানতে পারে তাহলে সেও সাথে সাথে কেবলার দিকে ঘুরে যাবে। আর যদি সে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি

নামাযের পরে জানতে পারে তাহলে আর উক্ত নামায পুনরায় আদায় করতে হবে না।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৪৪, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৪৩০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৬০৮, ৬২৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৮৭।

প্রশ্ন ১৬৭ : কোনো ইমাম যদি দাড়ি একমুষ্টি থেকে ছোটো করে ছাঁটে তাহলে তার পিছনে নামায আদায় করার হুকুম কী?

উত্তর : যে ব্যক্তি দাড়ি একমুষ্টি থেকে ছোটো করে ছাঁটে তার পিছনে নামায আদায় করা মাকরূহ। তবে পড়ে ফেললে নামায সহীহ হয়ে যাবে।– হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৩০৩, রদ্দুল মুহতার ২/২৯৮, ৩০১, আলবাহরুর রায়েক ১/৬১০, ফাতাওয়া উসমানী ১/৫১৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/১৩৭।

প্রশ্ন ১৬৮ : জনৈক ইমাম সাহেব নিয়মিত স্কুল টিচার। তিনি যুবতী মেয়েদেরকেও পড়ান। এমন ইমামের পিছনে নামায পড়ার বিধান কী?

উত্তর : যে ব্যক্তি যুবতী মেয়েদেরকে বেপর্দার সাথে পড়ায় সে চরম গোনাহে লিপ্ত। আর এমন গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইমাম বানানো মাকরূহে তাহরীমী। তবে তার পিছনে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু নামায মাকরূহ হবে। উল্লেখ্য, এ ধরনের ইমামকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মুত্তাকী ইমাম নিয়োগ দেওয়া জরুরি।– ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৫৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/৮৯, ৯০, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪/১৮৬।

প্রশ্ন ১৬৯ : চোখ বন্ধ করে নামায আদায় করা জায়েয আছে কী?

উত্তর : চোখ বন্ধ করে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। তবে কেউ যদি নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য চোখ বন্ধ করে থাকে তাহলে মাকরূহ হবে না।– মু'জামুত ত্ববারানী কাবীর ১১/৩৪, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৩৫৪, মাসাইলে নামায; পৃষ্ঠা ১৭৫, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/২০১।

সিজদায়ে তিলাওয়াত

প্রশ্ন ১৭০ : নাবালেগের সিজদায়ে তিলাওয়াতের বিধান কী?

উত্তর : নাবালেগের উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে অপবিত্র, ঋতুবতী ও প্রসূতি নারীদের উপরও ওয়াজিব নয়। চাই তারা নিজে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করুক বা অন্যের তিলাওয়াত শ্রবণ করুক। তবে যদি কেউ অপবিত্র, ঋতুবতী নারী (যদিও তাদের জন্য এমতাবস্থায় তিলাওয়াত নাজায়েয) কিংবা বুঝমান নাবালেগ শিশু থেকে সিজদার আয়াত শ্রবণ করে তবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ পাগল বা অবুঝ নাবালেগ শিশু থেকে সিজদার আয়াত শ্রবণ করে তবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে না।– আদদুররুল মুখতার ২/১০৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৮৭, ১৩২, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৬০।

প্রশ্ন ১৭১ : যদি কোনো হাফেয সাহেব তারাবীহ নামাযের ভিতরে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সাথে সাথে সিজদা না করে এক পৃষ্ঠা তিলাওয়াত করার পর সিজদা করে তাহলে এর হুকুম কী?

উত্তর : নামাযের ভিতরে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর বিলম্ব না করে সিজদা করা ওয়াজিব। সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে সামনে আরো তিন বা ততোধিক আয়াত তিলাওয়াত করা মাকরূহ। এরূপ করলে গুনাহগার হবে। নামায দোহরাতে হবে না। তবে তওবা করতে হবে। আর যদি ভুলে কেউ এই পরিমাণ বিলম্ব করে তাহলে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।।— রদ্দুল মুহতার ২/৫৪৩, ৫৮৪, ৫৮৭, আলবাহরুর রায়েক ২/২১৭, মিনহাতুল খালেক আলাল বাহরির রায়েক ২/২১৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৩-১৩৪, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৪৮৬-৪৮৭, ইমদাদুল আহকাম ১/৬৮৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৬৮৮।

প্রশ্ন ১৭২ : নামাযের রুকু-সিজদার ভিতরে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করলে সিজদা আদায় হবে কি না?

উত্তর : নামাযের রুকু-সিজদার ভিতরে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, ১. আয়াতে-সিজদা তিলাওয়াত করার পর বিলম্ব না করে রুকু-সিজদা করা। আয়াতে-সিজদার পর তিন বা ততোধিক আয়াত তিলাওয়াত করা বিলম্ব বলে গণ্য হয়। তবে আয়াতে-সিজদা সূরার শেষাংশে থাকলে এবং তারপর তিন আয়াত বাকী থাকলে সেগুলো পড়া যাবে। যেমন, সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা ইনশিকাক। এটা বিলম্ব হিসেবে গণ্য হবে না। ২. রুকুর মধ্যে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করতে চাইলে রুকুতে যাওয়ার পূর্বেই রুকুর মাধ্যমে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার নিয়ত করতে হবে। তবে নামাযের সিজদার মাধ্যমে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়ত জরুরি নয়।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, ইমাম সাহেব যদি রুকুর মাঝে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করে আর মুক্তাদীগণ না করে, তাহলে মুক্তাদীদের সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হবে না। এমনকি তারা সিজদার মাঝে নিয়ত করলেও আদায় হবে না। এক্ষেত্রে মুক্তাদীদের জন্য জরুরি হলো, ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করত আবার বৈঠক করে নামায শেষ করা। অন্যথায় মুক্তাদীদের নামায হবে না।— রদ্দুল মুহতার ২/৫৪৩, ৫৮৪, ৫৮৭, আলবাহরুর রায়েক ২/২১৭, মিনহাতুল খালেক আলাল বাহরির রায়েক ২/২১৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৩-১৩৪, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৪৮৬-৪৮৭, ইমদাদুল আহকাম ১/৬৮৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৬৮৮।

প্রশ্ন ১৭৩ : সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য দাঁড়ানো জরুরি কি না? না দাঁড়িয়ে সিজদা করলে সিজদা আদায় হবে কি?

উত্তর : নিয়ম হলো, দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যাবে। অতঃপর সিজদার তাসবীহ পড়বে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদা থেকে মাথা উঠাবে। তবে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। তাই বসা থেকে সিজদা করলেও সিজদা আদায় হয়ে যাবে।— আলবাহরুর রায়েক ২/২২৩, ফাতহুল কাদীর ২/২৫, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৩৪১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৩৭৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৫।

তারাবীহ নামায

প্রশ্ন ১৭৪ : যদি কোনো ব্যক্তি তারাবীহ নামাযে দ্বিতীয় রাকা'আতে বৈঠক না করে এক সালামে চার রাকা'আত পড়ে ফেলে তাহলে এই নামায সহীহ হবে কি না? সহীহ হলে চার রাকা'আতই সহীহ হবে না কি দুই রাকা'আত?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির প্রথম দুই রাকা'আত ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে শেষের দুই রাকা'আত সহীহ হবে। আর খতম তারাবীহ হলে প্রথম দুই রাকা'আতে পাঠকৃত কুরআনের আয়াতসমূহ পুনরায় তিলাওয়াত করতে হবে। সুতরাং তাকে প্রথম দুই রাকা'আত পুনরায় আদায় করতে হবে।— আদদুররুল মুখতার ২/৪৯৬, আলবাহরুর রায়েক ২/১১৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৩৬৬, ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৪০

প্রশ্ন ১৭৫ : জনৈক ব্যক্তি ঈশার নামাযে ফরয আদায় করার পর সুন্নাত পড়ার পূর্বেই তারাবীহ শুরু হয়ে গেছে। এখন সুন্নাত পড়তে গেলে তারাবীহ ছুটে যাবে। এমতাবস্থায় সে আগে সুন্নাত পড়ে নিবে না আগে তারাবীহতে শরীক হবে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তির ফরয আদায় করার পর যদি কোনো কারণে সুন্নাত শুরু করার পূর্বেই তারাবীহ নামায শুরু হয়ে যায় এবং সুন্নাত আদায় করতে গেলে তারাবীহ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে সে ব্যক্তি তারাবীহর জামা'আতে শরীক হয়ে যাবে। সুন্নাত পরে আদায় করবে।— আলবাহরুর রায়েক ২/১১৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/২৪২।

প্রশ্ন ১৭৬ : তারাবীহ ব্যতীত নফল নামাযের জামা'আত করার বিধান কী?

উত্তর : তারাবীহ নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা সুন্নাত। এছাড়া অন্য কোনো নফল নামাযে যদি তিন জনের অধিক মুক্তাদী থাকে তবে তা মাকরূহ। আর যদি মুক্তাদী একজন, দুইজন অথবা তিনজন হয় তাহলে জায়েয আছে, মাকরূহ হবে না।— রদ্দুল মুহতার ২/২৮৮, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩৩৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৩৭৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৩১৮।

মুসাফিরের নামায

প্রশ্ন ১৭৭ : জনৈক ব্যক্তি তিন দিনের জন্য ৪৮ মাইল তথা ৭৮ কি.মি. দূরবর্তী কোনো এলাকায় সফরে গেল। সেখানে গিয়ে সে স্থানীয় লোকদেরকে নিয়ে যোহরের নামায চার রাকা'আত পড়ল। এখন তাদের সকলের নামাযের হুকুম কি?

উত্তর : মুসাফিরের উপর চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামায দুই রাকা'আত পড়া ওয়াজিব। অতএব উল্লিখিত মুসাফির ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে চার রাকা'আত পড়ে থাকে তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার জন্য আবার নতুন করে নামায পড়া ওয়াজিব। আর যদি ভুলবশত এরূপ করে থাকে এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বৈঠক করে তাহলে তার এবং মুসাফির মুক্তাদীদের নামায আদায় হয়ে যাবে, তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর যদি ভুল অথবা ইচ্ছায় দ্বিতীয় রাকা'আতে বৈঠক না করে থাকে তাহলে নামাযের ফরযিয়াত বাতিল হয়ে যাবে। মুসাফির ইমাম ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক যদি চার রাকা'আত পূর্ণ করে ফেলে তাহলে মুকীম মুক্তাদীদের নামায হবে না। তবে যদি তারা শেষ দুই রাকা'আতে ইমামের ইকতিদার নিয়ত না করে তাহলে তাদের নামাযও হয়ে যাবে।।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১০৯০, আদদুররুল মুখতার ২/১২৮, রদ্দুল মুহতার ২/১৩০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৬৪।

প্রশ্ন ১৭৮ : আমি মাদরাসায় লেখাপড়া করি। মাঝে মধ্যে ছুটিতে বাড়ি যাই। সেখানে আমাকে কসর পড়তে হবে কি না?

উত্তর : আপনার মাদরাসা এবং বাড়ির মাঝের দূরত্ব যদি শরয়ী ৪৮ মাইল তথা ৭৮ কি.মি. বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে রাস্তায় আপনার উপর কসর পড়া ওয়াজিব। আর আপনার এলাকার আবাদীতে প্রবেশের সাথে সাথে আপনি মুকীম হয়ে যাবেন। তখন আর কসর পড়া যাবে না।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১০৯০, আদদুররুল মুখতার ২/১২৮, রদ্দুল মুহতার ২/১৩০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৬৪।

প্রশ্ন ১৭৯ : জনৈক আলেম বলে থাকেন যে, চাকরীজীবিগণ নিজ নিজ কর্মস্থলে স্ত্রী পরিবার নিয়ে বসবাস করলে কর্মস্থল তাদের ওয়াতনে আসলী হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা তাদের পিতৃভূমি যা ওয়াতনে আসলী ছিল তা বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তারা ১৫ দিনের কম সময় থাকার নিয়তে পিতৃভূমিতে গেলে মুকীম হবে না। তাই তাদেরকে সেখানে কসর পড়তে হবে। তিনি আরো বলে থাকেন যে, ওয়াতনে আসলী একাধিক হতে পারে না। তার এ কথা কি সঠিক?

উত্তর : কর্মজীবীগণ যদি তাদের কর্মস্থল এলাকাকে বসবাসের জন্য নির্ধারণ করে নেয় এবং সেখান থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা না থাকে তাহলে কর্মস্থল এলাকা তাদের ওয়াতনে আসলী হয়ে যাবে। তবে এতটুকু দ্বারা তাদের পিতৃভূমি যেখানে তারা জন্মলাভ করেছে তা ওয়াতনে আসলী থেকে খারিজ হয়ে যাবে না। কেননা ওয়াতনে আসলী একাধিক হতে পারে। কিন্তু যদি তারা পিতৃভূমিতে আর বসবাস না করার

সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তা আর ওয়াতনে আসলী থাকবে না। অতএব সেখানে শরঈ সফর করে ১৫ দিনের কম সময়ের জন্য গেলে কসর পড়তে হবে।– রদ্দুল মুহতার ২/৬১৪, আলবাহরুর রায়েক ২/২৩৯, বাদায়িউস সানায়ে' ১/২৮০, ফাতাওয়া উসমানী ১/৫৪৬, ৫৪৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/১৭৬।

প্রশ্ন ১৮০ : আমি মাদরাসায় পড়ি। আমাদের বাড়ি মাদরাসা থেকে ৪৮ মাইল তথা ৭৮ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। এখন জানার বিষয় হলো, মাদরাসা কি আমার জন্য ওয়াতনে আসলী না ওয়াতনে ইকামত?

উত্তর : ওয়াতনে আসলী বলা হয়, যেখানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে অথবা যেখানে পরিবার পরিজন নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার নিয়ত করে এবং সেখান থেকে স্থানান্তর হওয়ার ইচ্ছা থাকে না। আর ওয়াতনে ইকামত হলো, যেখানে মানুষ কমপক্ষে ১৫ দিন বা তার অধিক দিন অবস্থান করার নিয়ত করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মাদরাসার ছাত্রদের জন্য মাদরাসা হলো ওয়াতনে ইকামত। সুতরাং ছাত্ররা মাদরাসায় পূর্ণ নামায পড়বে। কেননা ছাত্ররা মাদরাসায় স্থায়ীভাবে থাকে না, একসময় পড়া-লেখা শেষ করে বাড়িতে চলে যায়।– রদ্দুল মুহতার ২/১৩১, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৪২, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ২/৩০৪।

প্রশ্ন ১৮১ : কোনো ব্যক্তি যদি ৪৮ মাইল তথা ৭৮ কি.মি. দূরত্বে সফরের জন্য বের হয় এবং আগে থেকেই সে গন্তব্যস্থলে ১৫ দিনের বেশি থাকার নিয়ত করে তবে এ ক্ষেত্রে সফররত অবস্থায় কসর করতে পারবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি সফররত অবস্থায় কসর করতে পারবে। বরং কসর করা জরুরি।– সূরা নিসা; আয়াত ১০১, রদ্দুল মুহতার ২/১২৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৩৯, মাহমূদিয়া ১১/৫৬১।

প্রশ্ন ১৮২ : যদি কোনো ছাত্র মাদরাসা বন্ধের সময় কোনো কারণবশত মাদরাসায় আসে এবং তিন দিন থাকার পর চলে যায় তাহলে মাদরাসায় এই তিন দিন থাকাবস্থায় সে কি মুসাফির থাকবে না কি মুকীম হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছাত্র মুকীম হবে। কারণ মাদরাসা থেকে সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য সফর করে চলে যাওয়ার দ্বারা তার মাদরাসার ওয়াতনে ইকামত বাতিল হয় নি। সুতরাং সে এখন পূর্ণ নামাযই আদায় করবে।– আদদুররুল মুখতার ২/৬১৪, আলবাহরুর রায়েক ২/২৩৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১০১, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৬৯২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৩৫৩, মাসাইলে সফর; পৃষ্ঠা ১০৬।

প্রশ্ন ১৮৩ : চিল্লার সাথিরা অনেক ক্ষেত্রে একই এলাকায় একেক মসজিদে তিন দিন তিন দিন করে ১৫ দিনের বেশি সময় কাটিয়ে দেন। প্রশ্ন হলো, তখন কি তারা মুকীম হয়ে যাবে না কি মুসাফিরই থাকবে?

উত্তর : চিল্লার সাথিরা যদি কোনো বড়ো শহর বা গ্রামে পনের দিন বা তার থেকে বেশি দিন থাকার নিয়ত করে। অতঃপর সে শহর বা গ্রামেরই বিভিন্ন মসজিদে তিন দিন তিন দিন করে থাকে তাহলে তারা মুকীম হিসেবে পুরো নামাযই আদায় করবে।

আর যদি তারা বড়ো কোনো এলাকায় যায়, যাতে ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলো গ্রাম রয়েছে। এরপর সে গ্রামগুলোর বিভিন্ন মসজিদে তিন দিন তিন দিন করে থাকার নিয়তে পনের দিন বা তার থেকে বেশি দিন থাকে তাহলে তারা মুসাফিরই থাকবে।– আদদুররুল মুখতার ২/৬০৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৪০, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ২/৩০৩ খাইরুল ফাতাওয়া ২/৬৮৫।

প্রশ্ন ১৮৪ : অনেক সময় চলন্ত বাস নামাযের সময় না থামানোর কারণে গন্তব্য পর্যন্ত পৌছতে নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় যাত্রীদের উযূ থাকা এবং না থাকা উভয় অবস্থায় করণীয় কী?

উত্তর : চলন্ত বাস যদি নামাযের সময় না থামানোর কারণে গন্তব্য পর্যন্ত পৌছতে নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে বাসের মধ্যেই যেভাবে সম্ভব নামায আদায় করে নেবে। তবে গন্তব্যে পৌছে পুনরায় সে নামায আদায় করে নিতে হবে। আর যদি উযূ না থাকে তাহলে তায়াম্মুম করে উপরোক্ত নিয়মে নামায আদায় করবে।– ফাতাওয়া খানিয়া ১/৫৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৮, রদ্দুল মুহতার ১/২৩৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৫০৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৮৮।

প্রশ্ন ১৮৫ : মুসাফির ব্যক্তির উপর সফরের হুকুম কখন থেকে শুরু হবে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি যদি তিন দিনের দূরত্বে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ গ্রাম বা শহর অতিক্রম করে তাহলে তখন থেকে তার উপর সফরের তথা মুসাফিরের হুকুম আরোপিত হবে।– সূরা নিসা; আয়াত ১০১, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৬৯১, আদদুররুল মুখতার ২/১২১, আলবাহরুর রায়েক ২/২২৫, মাসাইলে সফর; পৃষ্ঠা ১৭।

প্রশ্ন ১৮৬ : মুসাফির ইমামের পিছনে যদি মুকীম ইকতিদা করে আর মুসাফির ইমাম চার রাকা'আত পূর্ণ করে ফেলে তবে কার নামাযে কী ধরনের সমস্যা হবে?

উত্তর : মুসাফিরের জন্য ওয়াজিব হলো চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের স্থলে দুই রাকা'আত পড়া। সুতরাং কোনো মুসাফির যদি ভুলে চার রাকা'আত পড়ে ফেলে এবং প্রথম বৈঠক করে তবে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু এটা মাকরূহ হবে এবং সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ণ করে থাকে তবে গোনাহগার হবে এবং ঐ নামাযকে পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে।

আর যদি মুসাফির ইমাম এমনটি করে আর মুকীম মুক্তাদী চার রাকা'আতেই তার ইকতিদা করে তবে মুকীম মুক্তাদীর ফরয নামায আদায় হবে না। তবে যদি শেষ দুই রাকা'আতে ইমামের ইকতিদা না করে তাহলে মুক্তাদীর নামায সহীহ হয়ে যাবে।–

আদদুররুল মুখতার ২/৬০৩, রদ্দুল মুহতার ২/৬০৯, ৬১২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৫৮৩।

প্রশ্ন ১৮৭ : বাস বা ট্রেনে সফররত অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গেলে গাড়িতে বসেই নামায আদায় করতে পারবে কি না?

উত্তর : বাড়িতে ও সফরে সর্বাবস্থায় নামায ফরয। অতএব গাড়ি থেকে নেমে নামায পড়া না গেলে গাড়িতেই নামায পড়ে নেবে। সেখানেও ইস্তিকবালে কিবলা (কিবলা অভিমুখী হওয়া) সহ সমস্ত আহকাম ও আরকান যথারীতি পালন করতে হবে। তবে ভিড়ের কারণে যদি কিয়াম করা সম্ভব না হয় তাহলে বসেই নামায আদায় করবে এবং পরবর্তীতে সুযোগমত কাযা আদায় করে নিবে।– আলবাহরুর রায়েক ১/২৪৮, ফাতাওয়া খানিয়া ১/৫৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৮, ফাতাওয়া উসমানী ১/৪০১, ৬১০।

প্রশ্ন ১৮৮ : যদি ট্রেনে সফররত অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে যায় এবং ট্রেন থেকে নেমে নামায পড়া সম্ভব না হয় তাহলে ট্রেনের ভিতরে নামায পড়া যাবে কি না? কোনো কারণে সেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়া না গেলে পরবর্তীতে সে নামায কাযা করতে হবে কি না?

উত্তর : ট্রেনে সফররত অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গেলে সেখানে নামায পড়ে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রেও কিয়াম ফরয। তবে যদি ভিড়ের কারণে দাঁড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে বসে নামায পড়বে। এবং পরবর্তীতে সুযোগমতো কাযা করতে হবে। আর যদি ছাদ নীচু হওয়ার কারণে অথবা মাথা চক্কর দেওয়ার ভয়ে কিংবা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বসে নামায পড়তে হয় তাহলে বসেই পড়বে। পরবর্তীতে উক্ত নামায আর কাযা করতে হবে না।– রদ্দুল মুহতার ২/৫৭২, আলবাহরুর রায়েক ১/২৪৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৪৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫৬৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৭৯।

জুমু'আ ও ঈদ

প্রশ্ন ১৮৯ : কি কি শর্ত সাপেক্ষে জুমুআর নামায ওয়াজিব হয় জানতে চাই।

উত্তর : নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া গেলে জুমুআর নামায ওয়াজিব হয়।

১. মুক্ত স্বাধীন হওয়া।
২. পুরুষ হওয়া।
৩. স্থানীয় (মুকীম) হওয়া।
৪. সুস্থ্য সবল হওয়া।
৫. জামাতে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ওজরগুলো বিদ্যমান না থাকা।

৬. নামায ফরয হওয়ার শর্তগুলো বিদ্যমান থাকা।– আদদুররুল মুখতার ৩/২৬-২৯।

প্রশ্ন ১৯০ : কি কি শর্ত পাওয়া গেলে জুমু'আ শুদ্ধ হবে জানতে চাই।

উত্তর : যেসব শর্তের আলোকে জুমু'আ শুদ্ধ হয় তা নিম্নরূপ–

১. শহর বা শহরতলি হওয়া। উল্লেখ্য, যে গ্রামে তিন চার হাজার লোকের বসতি রয়েছে এবং বাজার ঘাটসহ নাগরিক যথাযথ সুযোগ সুবিধা রয়েছে সে গ্রামকে শহর হিসেবে গণ্য করা হয়।
২. জুম'আর নামায এবং খুতবা জোহরের নামাযের সময়ের মধ্যে আদায় করা।
৩. খুতবা পাঠ করা।
৪. জামা'আত হওয়া। অর্থাৎ খুতবার সময় থেকে নিয়ে জুমু'আর প্রথম রাকাতের প্রথম সিজদা পর্যন্ত অন্তত তিনজন সাবালক পুরুষ ইমামের সাথে জুমু'আয় অংশ গ্রহণ করা।
৫. জুমু'আর জন্য নিঃশর্ত প্রবেশাধিকার থাকা। অর্থাৎ যেখানে জুমু'আ অনুষ্ঠিত হবে সেখানকার সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত থাকা।– আদদুররুল মুখতার ৩/৫,১৮,২৪।

প্রশ্ন ১৯১ : খুতবা চলাকালীন শ্রোতাদের করণীয় কি? জানতে আগ্রহী।

উত্তর :

- জুমু'আর দ্বিতীয় আযানে উচ্চারণ করে কোনো জওয়াব দিবে না এবং এর পরে কোনো দু'আও পড়বে না।
- যখন খতীব খুতবার জন্য দাঁড়াবেন তখন থেকে খুতবার শেষ সময় পর্যন্ত কথা বার্তা বলবে না কিংবা কোনো নফল ইবাদতে মগ্ন হবে না।
- মনোযোগের সাথে খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। দূরত্বের কারণে খুতবার আওয়াজ শোনা না গেলেও নীরবতা বজায় রেখে কান লাগিয়ে থাকা ওয়াজিব।
- সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায়কালীন খুতবা শুরু হয়ে গেলে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাতে থাকলে সুন্নত পূর্ণ করে নিবে। নতুবা দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিবে। এবং এসুন্নত পরে পড়ে নিবে।
- খুতবা চলাকালীন নামাযের মত করে বসার চেষ্টা করবে। এবং কেবলামুখী হয়ে বসবে।
- খুতবার মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম এলে উচ্চারণ করে দুরূদ পাঠ করবে না। তবে মনে মনে পাঠ করার অবকাশ আছে।– আদদুররুল মুখতার ১/৭০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৪৭-৪৮।

প্রশ্ন ১৯২ : জুমু'আর খুতবা আরবীতে দেয়া জরুরী কি না জানতে চাই।

উত্তর : জুমু'আর খুতবা আরবীতে পাঠ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় থেকে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন কর্মধারায় অদ্যাবধি এর উপর আমল হয়ে আসছে। কোনো কালে এর বিপরীত রূপ পরিলক্ষিত হয় নি। আরবী খুতবা পাঠ না করে তার পরিবর্তে শুধু অনুবাদ পাঠ করে দেয়া কিংবা অন্য কোনো ভাষায় ওয়াজ নসিহত করা মাকরূহে তাহরিমী। আলকুর'আনে সূরায়ে জুমু'আর ৯ নং আয়াতে খুতবাকে জিকির বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর জিকির একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। সুতরাং নামাযে পঠিত কিরাতের অর্থ মুসল্লীগণ অনুধাবন করতে না পারলেও যেমন তার অনুবাদ করা যায় না তদ্রূপ খুতবার অরবী পাঠ অনুধাবিত না হলেও তার অনুবাদের অবকাশ নেই।– রদ্দুল মুহতার ১/৪৮৪, ফাতাওয়ায়ে লাক্ষ্ণবী ২২৫, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ২/২৯৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৬৪৭।

প্রশ্ন ১৯৩ : ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি কি শর্ত প্রযোজ্য জানতে চাই।

উত্তর : খুতবা ব্যতীত জুমু'আর নামাযের জন্য যেসব শর্ত প্রযোজ্য ঈদের নামাযের জন্য ঠিক সেসব শর্তই প্রযোজ্য। আর ঈদের নামাযে খুতবা পাঠ করা হলো সুন্নত। তবে ইমাম সাহেব খুতবা পাঠ করলে মুসল্লীদের জন্য তা শ্রবণ করা ওয়াজিব।– আদদুররুল মুখতার ৩/৪৫।

প্রশ্ন ১৯৪ : ঈদের নামায আদায়ের সুন্নাহ পদ্ধতি কি জানতে চাই।

উত্তর : ঈদের নামাযের পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত হলো-

- প্রথমে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরে তাহরিমা বাধবে।
- এরপর সানা পাঠ করবে।
- এরপর নামাযের তাকবীরে তাহরিমার ন্যায় কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলবে এবং হাত ছেড়ে দিবে। এরপর তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা পরিমাণ সময় বিলম্ব করে পুনরায় হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলবে এবং হাত ছেড়ে দিবে। এরপর তৃতীবারের মত আবার হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত বাধবে।
- এরপর আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতেহা ও কিরাত পাঠ করে রুকু সেজদার মাধ্যমে প্রথম রাকাত শেষ করবে।
- এরপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা ও কিরাত পাঠ করে প্রথম রাকাতের ন্যায় অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে। এখানে তৃতীয় তাকবীর বলার পরও হাত ছেড়ে রাখবে। এরপর রুকুর তাকবীর বলে রুকুতে যাবে।
- এরপর সেজদা বৈঠক করে যথা নিয়মে রাকাত শেষ করবে।– হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ৫৩২-৫৩৩।

প্রশ্ন ১৯৫ : ঈদের নামাযের খুতবার বিধান কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর :

- ঈদের নামাযের শেষে দুই খুতবা পাঠ করা সুন্নত।
- এই খুতবা মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে পাঠ করা সুন্নত।
- দুই খুতবার মাঝখানে জুমু'আর খুতবার ন্যায় তিন আয়াত পাঠ পরিমাণ বসা সুন্নত।

উপস্থিত শ্রোতাদের এ খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। দূরত্বের কারণে খুতবা না শুনতে পেলে চুপ করে কান লাগিয়ে রাখা ওয়াজিব।– হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ৫৩৪-৫৩৫।

প্রশ্ন ১৯৬ : যদি এক ব্যক্তি জুমু'আর খুতবা পাঠ করে আর অপর ব্যক্তি নামায পড়ায় তাহলে তা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : যদি এক ব্যক্তি জুমু'আর খুতবা পাঠ করে আর অপর ব্যক্তি নামায পড়ায় তবে তা জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো, যিনি নামায পড়াবেন তাকে খুতবা শ্রবণ করতে হবে। চাই পুরো খুতবা শ্রবণ করুক বা খুতবার কিছু অংশ শ্রবণ করুক। তবে উত্তম হলো, যিনি খুতবা পাঠ করবেন তিনিই নামায পড়াবেন।– রদ্দুল মুহতার ২/১৪০, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১১১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৪১৯, ফাতাওয়া রশীদিয়া ২/৭৩, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৪০৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৬৩৩।

প্রশ্ন ১৯৭ : জুমু'আর পূর্বে বাংলায় খুতবা দিয়ে জুমু'আর নামায আদায় করলে এ নামায পুনরায় পড়তে হবে কি না?

উত্তর : খুতবার রুকন দুইটি ও সুন্নাত পনেরটি। তার মধ্যে একটি সুন্নাত হলো, খুতবা আরবি ভাষায় পাঠ করা। আর জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য জুমু'আর পূর্বে খুতবা পাঠ করা শর্ত। উক্ত খুতবা আরবি ভাষায় পাঠ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ও মুতাওয়ারিসাহ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে' তাবেঈন, চার ইমামসহ সকল ফুকাহা ও উলামায়ে কেরাম আরবিতেই খুতবা পাঠ করতেন। অতএব আরবির পরিবর্তে অন্য ভাষায় খুতবা পাঠ করা মাকরূহে তাহরীমী। তবে খুতবার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না। কিন্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ পরিত্যাগ করার গুনাহ হবে। আর যদি কোনো কারণবশত আরবি ভাষায় খুতবা দেওয়া কিংবা শ্রবণ করা সম্ভব না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্য ভাষায় খুতবা দিয়ে কিংবা শ্রবণ করে নামায আদায় করার অবকাশ আছে।– আদদুররুল মুখতার ১/৪৮৩, বাদায়িউস সানায়ে' ১/৫৮৯, রদ্দুল মুহতার ২/১৩৭, ১৪৭, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ১৯/১৭৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৩৪৮, ৩৪৯, ফিকহী মাকালাত ৩/১২০, ১২৭, জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৩৪৯, ৩৫৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৬৪৭, ৬৫৫।

প্রশ্ন ১৯৮ : জুমু'আর ভিতরে আংশিক হলেও অন্য ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ আছে কি না? কেউ যদি জুমু'আর ভিতরে অন্য ভাষায় দু' একটি বাক্য ব্যবহার করে তবে তার হুকুম কী?

উত্তর : আরবিতে খুতবা পাঠ করার ভিতরে অন্য ভাষায় আংশিক অথবা দু' একটি বাক্য যদি সুন্নাত পরিমাণ খুতবা পড়ার পরে বলে তাহলে জায়েয আছে। তবে এমনটি করা খুতবা দীর্ঘ হওয়ার কারণে সুন্নাতের পরিপন্থি ও অনুত্তম কাজ।– আদদুররুল মুখতার ১/৪৮৩, বাদায়িউস সানায়ে' ১/৫৮৯, রদ্দুল মুহতার ২/১৩৭, ১৪৭, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ১৯/১৭৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৩৪৮, ৩৪৯, ফিকহী মাকালাত ৩/১২০, ১২৭, জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৩৪৯, ৩৫৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৬৪৭, ৬৫৫।

প্রশ্ন ১৯৯ : কোনো ব্যক্তি যদি ঈদের নামায এক রাকা'আত না পায় তাহলে সে উক্ত নামায কীভাবে আদায় করবে?

উত্তর : কেউ যদি ঈদের নামাযে এক রাকা'আত না পায় তাহলে ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর সে দাঁড়িয়ে ছানা, আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ পড়বে অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ে অন্য সূরা মিলাবে। এরপর অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ বলবে। অতঃপর রুকু করে বাকি নামায আদায় করবে।– মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৫৩৪, ফাতাওয়া সিরাজিয়্যা; পৃষ্ঠা ১৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৫১, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৬১৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৪২৮।

প্রশ্ন ২০০ : জুমু'আর খুতবা দেওয়া ও শ্রবণ করা ওয়াজিব। আর ঈদ ও বিবাহের খুতবা দেওয়া সুন্নাত। এখন প্রশ্ন হলো, ঈদ ও বিবাহের খুতবা শ্রবণের হুকুম কী?

উত্তর : জুমু'আর খুতবা শ্রবণ করা যেমনি ওয়াজিব তদ্রূপ বিবাহ ও উভয় ঈদের নামাযের খুতবা শ্রবণও ওয়াজিব। যদিও ঈদের নামায ও বিবাহে খুতবা প্রদান করা সুন্নাত।– আদদুররুল মুখতার ৩/৩৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৫৭৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৬৭৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৩৪৮।

প্রশ্ন ২০১ : আইয়ামে তাশরীক কয় দিন ও কোন কোন দিন? ঈদের প্রথম দিন আইয়ামে তাশরীকের অন্তর্ভুক্ত কি না? অন্তর্ভুক্ত করা না-করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা আছে কি না?

উত্তর : আইয়ামে তাশরীক তিন দিন। সেগুলো হলো, ১১, ১২ এবং ১৩ই যিলহজ। ঈদের দিন তথা ১০ই যিলহজ আইয়ামে তাশরীকের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব ৯ই যিলহজ ফজর নামাযের পর থেকে যে তাকবীর বলা হয় তাকে ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর মতানুযায়ী তাকবীরে তাশরীক বলা সঠিক নয়। কেননা ইমাম সাহেবের মতে, ঈদের দিন আসরের পর তাকবীর শেষ হয়ে যায়।– সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৭৭৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৫, আলফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ ৫/২০৪, হাশিয়াতুল লাক্ষ্ণবী আলাল হিদায়া ১/১৭৪।

প্রশ্ন ২০২ : খুতবার সময় হাতে লাঠি রাখার হুকুম কী?

উত্তর : খুতবার সময় হতে লাঠি রাখা সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ। যেহেতু মুয়াক্কাদাহ নয় তাই মাঝে মাঝে তরক করতে পারবে।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১০৯৬, রদ্দুল মুহতার ২/১৬৩, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৫১৪, ইমদাদুল আহকাম ২/৩৫০।

প্রশ্ন ২০৩ : যদি কোনো খতীব সাহেব পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা থাকার কারণে বসে বসে খুতবা পাঠ করে তাহলে খুতবা আদায় হবে কি না?

উত্তর : জুমু'আর খুতবা দাঁড়িয়ে দেওয়া সুন্নাত। অবশ্য কোনো ওযরের কারণে দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে খুতবা দেওয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু ওযর ব্যতীত বসে খুতবা দেওয়া সুন্নাত পরিপন্থি ও মাকরূহ।– বাদায়িউস সানায়ে' ১/৫৯২, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৫৬৫, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৫১৫, ফাতহুল কাদীর ২/৫৬-৫৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৪১১।

প্রশ্ন ২০৪ : জুমু'আর খুতবার মাঝে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম এসে যায় তখন দুরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে কি না?

উত্তর : জুমু'আর খুতবা দু' রাকা'আত নামায সমতুল্য। অতএব খুতবা চলাকালীন তাসবীহ, দুরূদ কিংবা অযীফা পাঠ করা এবং সালাম দেওয়া ও সালামের জবাব দেওয়াসহ সব ধরনের কথাবার্তা বলা নিষেধ। এমনকি কেউ কথা বললে তাকে নিষেধ করাও নিষেধ। মুসল্লীদের জন্য আবশ্যক হলো, সম্পূর্ণরূপে নীরব থেকে একান্তভাবে খুতবা শ্রবণ করা। তবে খুতবার মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম এসে গেলে মনে মনে দুরূদ পাঠ করবে; মুখে উচ্চারণ করে নয়।– সূরা আ'রাফ; আয়াত ২০৪, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৫৯০, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৫১, মুসনাদে আহমদ (মাকতাবায়ে শামেলা সংস্করণ); হাদীস ২৩০, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ৫৩২৪, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৫৭৪, আদদুররুল মুখতার ২/১৫৯, রদ্দুল মুহতার ২/১৫৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৩৮৭, কিফায়াতুল মুফতী ৩/২৫৬।

প্রশ্ন ২০৫ : জুমু'আর নামাযের পর সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কত রাকা'আত? চার রাকা'আত না ছয় রাকা'আত? যদি কেউ শুধু চার রাকা'আত পড়ে তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর : জুমু'আর ফরযের পর সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামায চার রাকা'আত। তবে যেহেতু ছয় রাকা'আত হওয়ার ব্যাপারেও মত পাওয়া যায় তাই চার রাকা'আতের সাথে আরো দুই রাকা'আত মিলিয়ে মোট ছয় রাকা'আত পড়াই উত্তম। কিন্তু যেহেতু পরবর্তী দুই রাকা'আত সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ সেহেতু চার রাকা'আতের উপর ক্ষান্ত করলেও গোনাহগার হবে না।– সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৮১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১২, আদদুররুল মুখতার ২/১২, আলবাহরুর রায়েক ২/২৪৯, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা

মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৩৮৯, রদ্দুল মুহতার ১/১০৩, ই'লাউস সুনান ৪/১৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪৮৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৪৫৬।

প্রশ্ন ২০৬ : যদি কোনো ব্যক্তি ঈদের জামা'আত না পায় তাহলে কি একাকী ঐ নামাযের কাযা আদায় করতে পারবে?

উত্তর : যদি এক বা একাধিক ব্যক্তি ঈদগাহে গিয়ে দেখে ঈদের জামা'আত শেষ হয়ে গেছে তাহলে তারা ঐ এলাকায় ঈদের নামায পড়বে না। একাকীও না, জামা'আত-বদ্ধভাবেও না। তবে এমন এলাকায় গিয়ে ঈদের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করতে পারবে যে এলাকায় এখনো ঈদের নামায পড়া হয় নি।– রদ্দুল মুহতার ২/১৭৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৫১-১৫২, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৫৩৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৬২৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৪৬৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/১৬৯।

প্রশ্ন ২০৭ : জুমু'আর দিন ঈদ হলে জুমু'আর নামায পড়বে না কি যোহরের নামায পড়বে?

উত্তর : জুমু'আ এবং ঈদের নামায উভয়টিই পৃথক পৃথক ওয়াজিব। একটি আদায় করার দ্বারা অপরটি কারো যিম্মা থেকে রহিত হবে না। সুতরাং জুমু'আ এবং ঈদ উভয়টাই আদায় করা জরুরি।– সূরা জুমু'আ; আয়াত ৯, সুনানে নাসাঈ; হাদীস ১৪২৩, আলবিনায়াহ ৩/৩৫০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৩৯৮।

প্রশ্ন ২০৮ : আমি একবার আমার বান্ধবীর কথায় তার সাথে গিয়ে মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করি। পরবর্তীতে জানতে পারি, আমার বান্ধবী আহলে হাদীস। আর এও জানতে পারি যে, মহিলাদের উপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব নয়। তাহলে আমি যে জুমু'আর নামায আদায় করেছি তার কী হবে? আমাকে কি যোহরের নামায কাযা করতে হবে?

উত্তর : মহিলাদের উপর জুমু'আর নামায ওয়াজিব নয়। এরপরও যদি কোনো মহিলা জুমু'আর নামায আদায় করে তাহলে তা আদায় হবে এবং ঐ দিনের যোহরের নামায তাকে আর আদায় করতে হবে না। তবে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া উচিত নয়।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১০৬৭, বাদায়িউস সানায়ে' ১/৫৮২, আলবাহরুর রায়েক ২/২৬৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৪৪, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৫২০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৩৪০।

প্রশ্ন ২০৯ : জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের বর্তমান খতীব (২০১২ইং) মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেবের পিছনে নামায পড়লে নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : দেশের শীর্ষস্থানীয় হক্কানী উলামায়ে কেরামের মতে মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব একজন ব্যতিক্রম বিশ্বাসে বিশ্বাসী খতীব। তার এ ব্যতিক্রম বিশ্বাস যদি কুফর বা শিরকের পর্যায়ের হয় তাহলে তার পিছনে নামায সহীহ হবে না। আর যদি কুফর

পর্যায়ের না হয়ে ফিসকের পর্যায়ের হয় তাহলে তার পিছনে নামায আদায় হয়ে যাবে। তবে মাকরূহ হবে।– আদদুররুল মুখতার ১/৫৬১, রদ্দুল মুহতার ১/৫৬০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৮৪, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৪৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৯০।

প্রশ্ন ২১০ : বর্তমানে ঈদের নামায এবং জুমু'আর নামাযের খুতবার পূর্বে যে বয়ান করা হয় তার শরঈ বিধান কী?

উত্তর : ঈদের নামায এবং জুমু'আর খুতবার পূর্বে বয়ান করা জায়েয আছে। বরং ইলমে দীন সম্পর্কে জনসাধারণের অজ্ঞতার যুগে বয়ান করাটাই উত্তম। সাহাবা যুগে এ রকম বয়ান-আলোচনার নযীর রয়েছে। তবে সময়ের প্রতি খতীব সাহেবদের লক্ষ্য রাখা উচিত।– মুসতাদরাকে হাকেম (মাকতাবায়ে শামেলা সংস্করণ) ১/৩৯০, ৫/২৪৫, ফাতাওয়া উসমানী ১/৫৫৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/১৪০।

জানাযা

প্রশ্ন ২১১ : মৃত মহিলাকে কাফন পরানোর পর খাটিয়ায় রেখে চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া জায়েয আছে কি না? কিংবা চাদর দিয়ে ঢেকে না দিলে কোনো গুনাহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ! মৃত মহিলাকে কাফনের পর খাটিয়ার উপর রেখে চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া জায়েয আছে। বরং এক্ষেত্রে চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া মুস্তাহাব। তবে যদি কোনো কারণে ঢেকে দেওয়া না-ও হয় তাহলে এই মুস্তাহাব পরিত্যাগ করার কারণে গুনাহ হবে না।– আল-মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়া ৩/২১৫, রদ্দুল মুহতার ৩/১৪২, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬১০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/২৪১, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৫/২৬০।

প্রশ্ন ২১২ : অনেক সময় কবর খননের পর কবরের মাঝে পানি-কাদার সমস্যা সৃষ্টি হয় এমতাবস্থায় বাক্সে লাশ দাফন করা বৈধ আছে কি না?

উত্তর : কবরে পানি উঠে গেলে কিংবা অন্য কোনো সমস্যার কারণে দাফন করা না গেলে মায়্যিতকে বাক্সে দাফন করা বৈধ আছে। কিন্তু কোনো ওযর ছাড়া বাক্সে দাফন করা মাকরূহ।– রদ্দুল মুহতার ৩/১৪০, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া ৩/৬৮-৬৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/২৩৮।

প্রশ্ন ২১৩ : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির নিকটে বসে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে কি না?

উত্তর : উল্লিখিত ক্ষেত্রে কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ। তবে যদি দূরে বসে তিলাওয়াত করে তাতে অসুবিধা নেই।– রদ্দুল মুহতার ২/১৯৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩১৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৭/১৬১।

প্রশ্ন ২১৪ : যদি কোনো মাইয়্যেতকে কোনো কারণবশত মাইয়্যেতের জানাযা না পড়িয়ে দাফন করে দেওয়া হয় তাহলে কতদিন পর্যন্ত তার কবরের উপর জানাযা পড়া যাবে?

উত্তর : যতোদিন মৃত ব্যক্তির শরীর পঁচা-গলা হতে নিরাপদ ও অবিকৃত থাকবে ততোদিন পর্যন্ত কবরের উপর জানাযা পড়া যাবে। তবে মৃত ব্যক্তির দেহ নিরাপদ ও অবিকৃত থাকা না থাকার বিষয়টি মাটি ঠাণ্ডা-গরম হওয়ার উপর নির্ভর করে। এজন্য উত্তম হলো, প্রবল ধারণার উপর আমল করবে। অর্থাৎ যতোদিন ধারণা হবে যে, মুর্দার দেহ ভালো আছে ততোদিন কবরের উপর জানাযা পড়তে পারবে।– সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৫৮, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৯৫৩, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩২০৩, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১৫২৭, বাদাইয়ুস সানায়ে' ২/৫৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৩, আল-হিদায়া ১/১৮০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৪৩৬।

প্রশ্ন ২১৫ : পুরাতন কবরে মাটি দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কবরস্থানের মর্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক। সে মতে পুরাতন কবরে প্রয়োজন হলে মাটি দেওয়া জায়েয আছে। তবে প্রয়োজন ব্যতীত বরকত লাভ কিংবা প্রথা পালনের উদ্দেশ্যে কোনো কবরে মাটি দেওয়া জায়েয নেই।– ফাতাওয়া নাওয়াযিল ১২৩, ফাতাওয়া সিরাজিয়্যা ২৪, রদ্দুল মুহতার ৩/১৪৪, আলবাহরুর রায়েক ২/২৪০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৭৫৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/৩০৭।

প্রশ্ন ২১৬ : কবরের চারপাশে দেওয়াল তৈরি করার বিধান কী?

উত্তর : কবর সংরক্ষণের জন্য কবরের চারপাশে দেওয়াল তৈরি করা জায়েয আছে।– ফাতাওয়া খানিয়া ১/১৯৪, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৫০৪, কিফায়াতুল মুফতী ৪/৫৯, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৩/৮২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/৪২৮।

প্রশ্ন ২১৭ : পোস্ট মর্টেমের জন্য কবর থেকে লাশ উত্তোলন করার বিধান কী?

উত্তর : পোস্ট মর্টেম করার জন্য কবর থেকে লাশ উত্তোলন করা সীমাহীন গর্হিত কাজ এবং হারাম।– হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬১৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/২৯৭, আযীযুল ফাতাওয়া; পৃষ্ঠা ৩৪৬।

প্রশ্ন ২১৮ : মৃত ব্যক্তিকে দেখার বিধান কী?

উত্তর : জীবিত অবস্থায় যাদেরকে দেখা জায়েয মৃত্যুর পরও তাদেরকে দেখা জায়েয। জীবিত অবস্থায় যাদেরকে দেখা জায়েয নেই মৃত্যুর পরও তাদেরকে দেখা জায়েয নেই।

দাফনের পূর্বে মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখা জায়েয আছে। তবে কবরে নামানোর পর দেখা উচিত নয়। কারণ এ সময় অনেকের চেহারায় কবর জগতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে। তবে বর্তমানে আয়োজন করে মুখ দেখানোর যে রীতি রয়েছে তা পরিহার

করা উচিত। কারণ, (১) সাধারণত মুখ দেখাকে সওয়াবের কাজ মনে করা হয়, (২) এতে দাফন কার্যে বিলম্ব হয়, (৩) মাইয়্যেতের চেহারা বিকৃত হয়ে গেলে তা সকলের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে সমাজে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫১, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১২১, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৩/৭৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৪৬৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২১৯।

প্রশ্ন ২১৯ : মাইয়্যেতকে কবরস্থ করার পর অদূরে দাঁড়িয়ে দু'আ করার বিধান কি?

উত্তর : মাইয়্যেতকে কবরস্থ করার পর তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দু'আ করা জায়েয আছে এবং তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩২২১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৬, রদ্দুল মুহতার ৩/১৪৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/৯৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২২৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৫/৩৯৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/২৭২।

প্রশ্ন ২২০ : যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তারা কি শরীয়তের দৃষ্টিতে শহিদ বলে গণ্য হবেন?

উত্তর : যারা শত্রুর হাত থেকে দেশের মুসলিম, অমুসলিম নাগরিকেদর জান-মাল রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে তারা যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে শহিদ বলে গণ্য হবে। অন্য কোনো উদ্দেশে যুদ্ধে মারা গেলে শহিদ বলে গণ্য হবে না।– রদ্দুল মুহতার ৩/১৬৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৮, আলবাহরুর রায়েক ২/৩৪৫, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৪৭৫, বাদায়িউস সানায়ে' ১/৩২৩।

প্রশ্ন ২২১ : আমরা জানি, শহিদের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে বান্দার হক্বও কি মাফ হয়ে যায়?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত মতে বান্দার হক্ব তথা মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট-ব্যক্তি হতে মাফ করিয়ে নেয়া ছাড়া তা মাফ হবে না। তবে শহীদের ব্যাপারে আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা তার হক্বদারকে স্বীয় ধনভাণ্ডার থেকে কিছু দিয়ে খুশি করিয়ে শহিদকে মাফ করে দিবেন।– সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৮৮৪, রদ্দুল মুহতার ৬/১৯৬, মিরকাতুল মাফাতীহ ১/১৭৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/৪৬০।

প্রশ্ন ২২২ : মৃত ব্যক্তির নখ বা চুল কাটার বিধান কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির নখ বা চুল কাটা জায়েয নেই। তবে যদি নখ ভাঙা থাকে তাহলে ছুটিয়ে ফেলতে অসুবিধা নেই।– আলবাহরুর রায়েক ২/৩০৪, আদদুররুল মুখতার ৩/৮৯, রদ্দুল মুহতার ৩/৮৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/৬১।

প্রশ্ন ২২৩ : মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম করতে গিয়ে তার বাড়ির কোনো কিছু খাওয়া বা পান করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম করতে গিয়ে কুরআন খতমের বিনিময় স্বরূপ কোনো কিছু খাওয়া বা পান করা জায়েয নেই।– তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/২০০, রদ্দুল মুহতার ৬/৫৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/৩৭৬।

প্রশ্ন ২২৪ : কোনো হিজড়া মারা গেলে তার জানাযার নামায পড়ার বিধান কি? জানাযা নামায পড়তে হলে কী দু'আ পড়বে?

উত্তর : হিজড়া যদি মুসলিম হয় তাহলে তার জন্যও জানাযার নামায পড়া ফরযে কিফায়া। সুতরাং যদি সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে তার জানাযায় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার দু'আ পড়বে। আর যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং ছেলেদের নিদর্শন প্রকাশ পায় তাহলে ছোটো ছেলেদের দু'আ পড়বে। যদি মেয়েদের নিদর্শন প্রকাশ পায় তাহলে ছোটো মেয়েদের দু'আ পড়বে। তবে যদি নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হয় তাহলে ছেলে ও মেয়ের দু'আ হতে যে দু'আ ইচ্ছা পড়বে।– সূরাহ তাওবা; আয়াত ১০৩, আদদুররুল মুখতার ৩/১০২, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৬৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/৩৯, খাইরুল ফাতাওয়া ৩/৩০৩।

প্রশ্ন ২২৫ : মৃত ব্যক্তিকে বরই পাতার পানি দ্বারা গোসল দেওয়ার তাৎপর্য কী?

উত্তর : বরই পাতার গরম করা পানি দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো মুস্তাহাব। বরই পাতা দ্বারা গোসল দেওয়ার কারণ হলো, এর দ্বারা গোসল দেওয়া হলে খুব দ্রুত ময়লা দূর হয়, লাশের দ্রুত পচন রোধ হয় এবং পোকামাকড় হতে লাশ নিরাপদ থাকে। এসব কারণে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে বরই পাতার গরম পানি ব্যবহার করার কথা বলা হয়। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত দেহকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে বরই পাতার পানি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১২৬৬, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১২০৬, আদদুররুল মুখতার ২/১৯৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৫৮, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী; পৃষ্ঠা ৫৬৮।

প্রশ্ন ২২৬ : জানাযা নামাযে এক কাতার অপর কাতারের সাথে মিলে মিলে দাঁড়াবে না কি উভয় কাতারের মাঝে রুকূ-সিজদা পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে?

উত্তর : জানাযার নামাযের ক্ষেত্রে এক কাতারকে অপর কাতারের সাথে মিলিয়ে দাঁড়ানো জায়েয আছে। তেমনিভাবে সিজদা পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে দাঁড়ানোও জায়েয আছে।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১৩১৮, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/২০৮।

প্রশ্ন ২২৭ : জানাযার নামাযের কাতার বেজোড় হওয়া জরুরি কি না? এবং বেজোড় হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ফযীলত আছে কি না?

উত্তর : জানাযার নামাযের কাতার বেজোড় হওয়া জরুরি নয়। তবে হাদীসের ভাষ্য মতে জানাযা নামাযে তিন কাতার হওয়া মুস্তাহাব। তিন কাতার জানাযার নামাযের ফযীলত সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো মুসলমান যখন মারা যায় এবং মুসলমানদের তিনটি কাতার তার জানাযার নামায আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। অন্য বর্ণনা মতে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন।– সুনানে আবূ দাউদ ৩/৩৮০, রদ্দুল

মুহতার ২/২১৪, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৬৪, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৬৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/২০৫, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৪৪৭।

প্রশ্ন ২২৮ : মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রাখার পর যে চাদর বা কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হয় তাতে কালিমা বা কুরআনের আয়াত ইত্যাদি লেখার বিধান কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির খাটিয়ার উপর যে চাদর দেওয়া হয় সে চাদরে কালিমা অথবা কুরআনের আয়াত লেখা মাকরূহ। কেননা এর দ্বারা কালিমা ও কুরআনের আয়াতের অমর্যাদা হয়।− রদ্দুল মুহতার ২/২৪৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/৭৭।

প্রশ্ন ২২৯ : জানাযার সাথে যারা কবরস্থানে যাবে তারা উচ্চস্বরে তাকবীর বা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে পারবে কি না?

উত্তর : যারা জানাযার সাথে যাবে তাদের জন্য উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা বা কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ।− আদদুররুল মুখতার ২/২৩৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/২৩৪।

প্রশ্ন ২৩০ : যদি কোনো ব্যক্তি জানাযার নামাযে দু'এক তাকবীর চলে যাওয়ার পর উপস্থিত হয় তাহলে সে কি আসা মাত্রই নামাযে শরীক হবে না কি পরবর্তী তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করবে?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি জানাযার নামাযে ইমামের দু'এক তাকবীর বলার পর উপস্থিত হয় তাহলে সে ইমামের পরবর্তী তাকবীরের অপেক্ষা করবে এবং ইমাম যখন তাকবীর বলবে তখন সে তাকবীর দিয়ে নামাযে শরীক হবে। অতঃপর ইমামের সালাম ফিরানোর পর মাইয়্যেতকে তুলে নেয়ার আগেই অবশিষ্ট তাকবীরগুলো দিয়ে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করবে।− আদদুররুল মুখতার ৩/১১৪, রদ্দুল মুহতার ৩/১১৫, ফাতাওয়া খানিয়া ১/১৯২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/১০৫।

প্রশ্ন ২৩১ : বর্তমানে নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি মারা গেলে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু সময় নীরবতা পালন করা হয়। ইসলামে এই ধরনের নীরবতা পালনের কোনো অবকাশ আছে কি না?

উত্তর : ইসলাম মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছে। কারো মৃত্যু উপলক্ষে কিছু সময় নীরবতা পালন ইসলাম সমর্থিত নয়; বরং এটি একটি বিজাতীয় কালচার। সুতরাং মুসলমানদের জন্য এর অনুসরণ করা জায়েয নেই। অতএব এ ধরনের গর্হিত প্রথা পালন হতে বেঁচে থাকা আবশ্যক।− রদ্দুল মুহতার ৩/১৩৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১১৬, খাইরুল ফাতাওয়া ৩/২১৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৪৪৮।

প্রশ্ন ২৩২ : জনৈক ব্যক্তি এই মর্মে অসিয়ত করে যে, আমার জানাযার নামায অমুক ব্যক্তি পড়াবে। অথচ তার ছেলেও একজন আলেম। এ ব্যক্তির অসিয়ত কার্যকর করা জরুরি কি না?

উত্তর : মৃত্যুর পূর্বে কাউকে জানাযা নামায পড়ানোর জন্য অসিয়ত করলে তা পালন করা জরুরি নয়। সুতরাং কেউ যদি এমন অসিয়ত করে যায় তাহলে তার ওয়ারিস বা অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত তা বাস্তবায়ন করা যাবে না। তারা অনুমতি দিলেই কেবল অসিয়তকৃত ব্যক্তি জানাযা নামায পড়াতে পারবে।− রদ্দুল মুহতার ৩/১২২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৯০, খাইরুল ফাতাওয়া ৩/২৮৪, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১২৪।

প্রশ্ন ২৩৩ : মসজিদে জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কোনো ওযর ব্যতীত মসজিদে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ। চাই মাইয়্যেতকে মসজিদের ভিতরে রাখা হোক বা বাহিরে রাখা হোক। তবে ওযর বশত মসজিদে জানাযা পড়া জায়েয আছে।− রদ্দুল মুহতার ৩/১২৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৫, ফাতাওয়া উসমানী ১/৬১৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১৮৩।

প্রশ্ন ২৩৪ : যদি কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তাহলে তার জানাযার নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : ইসলামে আত্মহত্যা করা কবীরা গুনাহ। তথাপি আত্মহত্যাকারীর জানাযা নামায পড়া ফরয। তবে যদি সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সতর্ক করার জন্য এ ধরনের ব্যক্তিদের জানাযা নামায না পড়ে তাহলে এর অবকাশ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য লোকজন অবশ্যই জানাযা নামায পড়বে।− রদ্দুল মুহতার ৩/১০৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৫৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১৯৬।

প্রশ্ন ২৩৫ : যদি বড়ো কোনো দুর্যোগ-দুর্ঘটনার সময় নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোরের অনেক লাশ একত্রে উপস্থিত হয় তখন জানাযা নামায কীভাবে আদায় করতে হবে? প্রত্যেক মাইয়্যেতের জন্য কি পৃথক পৃথক জানাযা পড়তে হবে না কি সকলের জন্য এক জানাযাই যথেষ্ট হবে?

উত্তর : যদি পুরুষ-মহিলা, ছেলে-মেয়েসহ অনেক জানাযা একত্রিত হয়ে যায় তবে উত্তম হলো, প্রত্যেক মাইয়্যেতের জন্য পৃথক পৃথক জানাযা নামায আদায় করা। তবে সকলের জানাযা এক জামা'আতে পড়াও জায়েয আছে। এক্ষেত্রে ইমামের সামনে প্রথমে পুরুষ, তারপর ছেলে, তারপর মহিলা, তারপর মেয়েদের খাটিয়া পর্যায়ক্রমে রাখবে।− আদদুররুল মুখতার ৩/১১৮, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৫৯২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/১০৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২০৮।

প্রশ্ন ২৩৬ : বর্তমানে দেখা যায় যে, জানাযা কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বহনকারীরা এবং উপস্থিত লোকজন উচ্চস্বরে কালিমা পড়তে থাকে এবং তিলাওয়াত করতে থাকে। এই সময় এই ধরনের যিকির ও তিলাওয়াত জায়েয আছে কি না?

উত্তর : জানাযা বহনকারী এবং তার অনুগামীদের জন্য উচ্চস্বরে তিলাওয়াত ও যিকির করা মাকরূহ। কেউ যিকির বা তিলাওয়াত করতে চাইলে মনে মনে করবে।– আদদুররুল মুখতার ৩/১৩৮, আলবাহরুর রায়েক ২/৩৩৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/১২০।

প্রশ্ন ২৩৭ : গায়েবানা জানাযা নামায পড়ার বিধান কী?

উত্তর : জানাযার নামায সহীহ হওয়ার জন্য মাইয়্যেত মুসল্লিদের সামনে থাকা শর্ত। অতএব গায়েবানা জানাযা নামায জায়েয নেই।– আলবাহরুর রায়েক ২/৩১৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৪, ইমদাদুল আহকাম ২/৪৪৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/৪৫, আদদুররুল মুখতার ৩/১০৪।

প্রশ্ন ২৩৮ : যদি কোনো ব্যক্তি ইন্তিকালের সময় কাউকে অসিয়ত করে যায় যে, আমার ইন্তিকালের পর আমার জন্য এক লাখ পঁচিশ হাজার বার সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করবে এবং তার সওয়াব আমার উদ্দেশে পাঠিয়ে দিবে। তাহলে তার এই অসিয়ত পূর্ণ করা জরুরি কি না?

উত্তর : অসিয়ত শুদ্ধ হওয়ার জন্য ধন-সম্পদ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় হওয়া জরুরি। অতএব উল্লিখিত অসিয়তের মধ্যে এ বিষয়টি না পাওয়া যাওয়ায় অসিয়তটি শুদ্ধ হয় নি। সুতরাং এটা পূর্ণ করাও আবশ্যক নয়। তথাপি যাকে অসিয়ত করা হয়েছে সে যদি তা পূর্ণ করে মরহুমকে তার সওয়াব হাদিয়া করে দেয় তাহলে তা জায়েয আছে এবং মরহুম এই সওয়াব দ্বারা উপকৃত হবে ইনশা-আল্লাহ।– বাদায়িউস সানায়ে' ৬/৪৫৭, আদদুররুল মুখতার ১০/৩৩৮, রদ্দুল মুহতার ৩/১৫১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৬/৯০, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৫/৪৩০।

প্রশ্ন ২৩৯ : মৃত ব্যক্তির বাড়িতে খানা পাঠানোর হুকুম কী?

উত্তর : পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির শোকার্ত পরিবারের জন্য একদিন একরাত পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পাঠানো মুস্তাহাব। কেননা এ সময় তারা শোকে মুহ্যমান থাকে। খাবারের ব্যবস্থাপনার প্রতি তাদের কোনো খেয়াল থাকে না, বা থাকলেও এ বিষয়টি তাদের জন্য কষ্টকর। সুতরাং আত্মীয় বা প্রতিবেশী হওয়ার কারণে ইকরামুল মুসলিমীন হিসেবে খানা পাঠানো মুস্তাহাব।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩১৩২, রদ্দুল মুহতার ৩/১৪৮, ফাতহুল কাদীর ২/১৫১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪৯, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১/৩২৮।

প্রশ্ন ২৪০ : বর্তমানে দেখা যায়, কারো মৃত্যু হলে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মাইকিং করে মরহুমের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হয়। এভাবে মাইকিং করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মাইয়্যেতের জানাযায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে মাইকিং করা জায়েয আছে। তবে মাইকিং দ্বারা মাইয়্যেতের সুনাম-সুখ্যাতি প্রচার করা উদ্দেশ্য হলে এভাবে মাইকিং করা মাকরূহ হবে।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১৩১৮, ১৩২০, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৯৫১, রদ্দুল মুহতার ৩/৮৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৫৭, খাইরুল ফাতাওয়া ৩/২৮০।

প্রশ্ন ২৪১ : জানাযার নামাযের সালাম ফিরানোর পর হাত উঠিয়ে দু'আ করার বিধান কী?

উত্তর : জানাযা নামাযই একটি দু'আ। তাই ইসলামী শরীয়তে জানাযার নামাযের পর আলাদা করে হাত উঠিয়ে দু'আ করার কোনো ভিত্তি ও প্রমাণ নেই। ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরনের দু'আ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।– খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২৫, ফাতাওয়া সিরাজিয়্যা; পৃষ্ঠা ২৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৯০, ইমদাদুল আহকাম ১/১৯৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/১৯৪।

কবর

প্রশ্ন ২৪২ : কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার হুকুম কি?

উত্তর : কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার অনুমতি আছে যদি এর সাথে কোনো শরীয়ত গর্হিত কাজ করার উদ্দেশ্য না থাকে। যেমন, কবরকে সিজদা করা বা মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৮৯, মুসনাদে আবূ হানীফা; হাদীস ১৯১, মুসনাদে আহমদ; হাদীস ১২৩৭, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১০৫৫, আলবাহরুর রায়েক ২/৩৪১, ৩৪৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/৪৪৬, খাইরুল ফাতাওয়া ৩/২০৫, ফাতাওয়া উসমানী ১/১১৫।

প্রশ্ন ২৪৩ : কোনো মহিলা মারা গেলে তার স্বামী তাকে কবরে রাখতে পারবে কি না?

উত্তর : মৃত্যুর দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তাই স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তবে দেখার অনুমতি আছে। যদি মৃত ব্যক্তির মাহরাম উপস্থিত থাকে তাহলে তারাই কবরে নামাবে। তাদের অনুপস্থিতিতে পর্যায়ক্রমে স্বামী কিংবা অন্যান্যদের জন্যও কবরে নামানোর অনুমতি আছে।– আলহিদায়া ২/৩২৪, রদ্দুল মুহতার ২/১৯৯, আদদুররুল মুখতার ২/১৯৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৬, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬০৫, আলবাহরুর রায়েক ২/১৯৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৭৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/২৪৪।

প্রশ্ন ২৪৪ : মহিলারা কি কবর যিয়ারত করতে পারবে?

উত্তর : যদি শরীয়ত গর্হিত কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তবে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বয়স্কা মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করার অনুমতি আছে। যুবতী নারীদের জন্য কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার অনুমতি নেই।– সুনানে

তিরমিযী; হাদীস ১০৫৬, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৯৭৭, আলবাহরুর রায়েক ২/৩৪০, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬২০, রদ্দুল মুহতার ৩/১৫১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৭৫৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/৩২৬, খাইরুল ফাতাওয়া ৩/২৩৮।

প্রশ্ন ২৪৫ : কোনো ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে তার পিতাকে হত্যা করে তাহলে এ হত্যাকারীর জানাযা নামাজ পড়া যাবে কি না?

উত্তর : ইসলামী বিধান মতে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা কবিরা গুনাহ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। আর নিজের জন্মদাতা পিতাকে হত্যা করা আরো জঘন্যতম অপরাধ। এধরনের পাপাচারীদের লাঞ্ছনা পার্থিব জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। তাই যদি কোনো পিতৃঘাতককে কিসাস আইনে মৃত্যু দণ্ড দেয়া হয় তবে তার উপর জানাযা নামাজ পড়া যাবে না। তবে যদি সে মৃত্যুদণ্ড থেকে ছাড় পেয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে তাহলে তার জানাযা নামাজ পড়তে হবে। কিন্তু যদি সে পিতৃ হত্যার মত জঘন্যতম গুনাহ থেকে তওবা না করে থাকে এবং অনুতপ্ত না হয়ে থাকে তাহলে কোনো আলেম তার জানাযা নামাজ পড়বে না। এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাতে অংশগ্রহণ করবে না।–সূরা নিসা ৯৩, সূরা আনআম ১৫২, রদ্দুল মুহতার ২/২১২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৩, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬০২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া১৩/১৭২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৯৭।

প্রশ্ন ২৪৬ : কবরস্থানের পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দু'আ করার বিধান কি?

উত্তর : কবরস্থানের পাশে দাঁড়িয়ে কবরবাসীদের জন্য হাত তুলে দু'আ করা জায়েজ আছে। তবে কবরকে সামনে রেখে দু'আ করা যাবে না। বরং এক পাশে দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে দুয়া করবে।–সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৯৭, রদ্দুল মুহতার ২/২৪২, আলবাহরুর রায়েক ২/৩৪২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৭৩০, ফাতাওয়া উসমানী ১/৩০৮।

রোযা

প্রশ্ন ২৪৭ : রোজা কত প্রকার ও কি কি প্রত্যেক প্রকারের বিধান জানতে চাই।

উত্তর : রোজা মোট ছয় প্রকার। যথা:

১. ফরয। যেমন, রমাযানের রোজা, কাফফারার রোজা।
২. ওয়াজিব। যেমন, মান্নতের রোজা, বিনা কারণে ভেঙ্গে ফেলা নফল রোজা কাযা রোজা।
৩. মাসনূন। যেমন, নবম অথবা এগারো তারিখসহ আশুরার রোজা।
৪. মানদুব। যেমন, প্রতি মাসের তের চৌদ্দ এবং পনের তারিখের রোজা, প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবারের রোজা এবং শাওয়ালের ছয় রোজা ইত্যাদি।

৫. নফল। যেমন, উপরোক্ত রোজা ব্যতীত অন্যান্য দিনের রোজা।
৬. মাকরূহ। মাকরূহ দুই প্রকার- ১. মাকরূহে তাহরিমী। যেমন, দুই ঈদে এবং আইয়ামে তাশরিকে রোজা পালন করা। ২. মাকরূহে তানযিহী। যেমন, নবম অথবা এগারো তারিখ ব্যতীত শুধু আশুরার দিনের রোজা আদায় করা।

উল্লেখ্য, অবশ্য পালনীয় রোজা মোট তেরো প্রকার। তন্মধ্য হতে সাত প্রকারের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক। যথা : ১. রমাযানের রোজা ২.কাফফারায়ে কতলের রোজা (হত্যা প্রসূত প্রায়শ্চিত্তের রোজা) ৩. কাফফারায়ে ইয়ামীনের রোজা (শপথ ভঙ্গ প্রসূত প্রায়শ্চিত্তের রোজা) ৪. কাফফারায়ে জেহারের রোজা (স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করার প্রায়শ্চিত্তের রোজা) ৫. ইচ্ছাপূর্বক রমাযানের রোজা ভেঙ্গে ফেলার কাফফারার রোজা ৬. নির্দিষ্ট মান্নতের রোজা ৭. অনির্দিষ্ট মান্নতের রোজা (যদি এদুই মান্নতের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার নিয়ত করা হয়ে থাকে)। তবে প্রথম প্রকার এবং সপ্তম প্রকার ব্যতীত বাকি পাঁচ প্রকার রোজার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ভেঙ্গে ফেলা হলে নতুন করে শুরু থেকে রোজাগুলো ধারাবাহিকভাবে পালন করতে হবে। রমাযানের রোজা এবং নির্দিষ্ট মান্নতের রোজার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা না হলে রোজাগুলো শুরু থেকে পালন করতে হবে না। আর বাকি ছয় প্রকার রোজার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক নয়। ছয় প্রকার রোজা হলো, ১. রমাযানের কাযা রোজা ২. মুত'আর রোজা (হজ্জে তামাত্তুর ক্ষেত্রে কুরবানী পালন না করার রোজা) ৩. সময় আসার পূর্বে মাথা মুণ্ডানোর রোজা ৪. পশু শিকারের বিনিময়ে রোজা ৫. ধারাবাহিকতার নিয়ত না করা মান্নতের রোজা ৬. শপথের রোজা।– সূরা বাকারা ১৯৫, সূরা মায়িদা ৯৪, সহীহ বুখারী হাদীস ১৯২৪, ১৯৭৫, ১৯৮১, ১৯৮৪, ১৯৯০,১৯৯৮,২০০১, সহীহ মুসলিম হাদীস ১১৬২, ২৫৬৫, সুনানে আবুদাউদ হাদীস নং ২৪৫১, ফাতহুল কাদীর ৪/২৬৯, রদদুল মুহতার ৭/৩২৮, হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬৩৮, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২৮/৮, ৯, মাসায়েলে রোজা ৮৪।

প্রশ্ন ২৪৮ : কি কি কারণে রোজা ভেঙ্গে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয় জানতে চাই।

উত্তর : যেসব কারণে রোজা ভেঙ্গে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. কানে বা নাকে ওষুধ ব্যবহার করা।
২. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করা।
৩. কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশত কণ্ঠনালীতে পানি চলে যাওয়া।
৪. স্ত্রী বা কোনো নারীকে স্পর্শ জাতীয় কিছু করার কারণে বীর্যপাত হওয়া।
৫. কাঠ, লোহা জাতীয় অনাহার্য জিনিস আহার করা।

৬. বিড়ি, সেগারেট বা হুক্কা পান করা।
৭. আগরবাতি প্রভৃতির ধোঁয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে গ্রহণ করা।
৮. ভুলে পানাহার করার পর রোজা ভেঙ্গে গেছে বলে মনে করে আবার পানাহার করা।
৯. রাত আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পর সেহরী খাওয়া।
১০. দিন বাকি থাকতে ইফতারীর সময় হয়ে গেছে মনে করে ইফতারী করে ফেলা।
১১. দ্বিপ্রহরের পর রোজার নিয়ত করা।
১২. থুথুর সাথে রক্তের পরিমাণ বেশি হয়ে কণ্ঠনালীর নিচে চলে যাওয়া।
১৩. জোরপূর্বক রোজাদারের মুখে কোনো কিছু প্রবেশ করিয়ে দেয়ার পর তা কণ্ঠনালীর নিচে পৌঁছে যাওয়া।
১৪. দাঁতে আটকে থাকা ছোলা-বুট পরিমাণ খাদ্য কণা গিলে ফেলা।
১৫. হস্ত মৈথুনের ফলে বীর্যপাত হওয়া।
১৬. প্রশ্রাবের রাস্তায় বা স্ত্রীর যোনিতে ওষুধ প্রবেশ করানো।
১৭. পানি বা তেল আদ্রিত ভিজা আঙ্গুল যোনিতে বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করানো।
১৮. শুকনো আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে পুরোটা বা কিছুটা বের করে আবার প্রবেশ করানো।
১৯. মুখে পান রেখে ঘুমন্ত অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়া।
২০. নস্যি গ্রহণ করা বা কানে তেল ঢালা।
২১. রোজার নিয়ত না করা।
২২. স্ত্রীর বেহুঁশ কিংবা অসচেতন অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা।
২৩. রমাযান ব্যতীত অন্য নফল রোজা ভেঙ্গে ফেললে ও শুধু কাযা ওয়াজিব হয়।
২৪. এক দেশে রোজা শুরু করার পর অন্য দেশে চলে গেলে সেখানে যদি নিজের দেশের তুলনায় আগে ঈদ হয়ে যায় তাহলে নিজের দেশের হিসেবে যে কয়টা রোযা বাদ পড়ে গেছে তার কাযা করতে হবে। আর যদি সেখানে গিয়ে রোজা এক দুটো বেড়ে যায় তাহলে তা রাখতে হবে। – ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৩৭৬, ৩৮৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০২,২০৩,২০৪, হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬৬৪, ৬৭৫, ৬৭৬, মাসায়েলে রোজা ৬৪, ৬৮,৭২,৭৪,৭৬,৭৭,৭৮, ৭৯, ৮৩, ১১৩।

প্রশ্ন ২৪৯ : কি কি কারণে রোজা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয় জানতে চাই।

উত্তর : যেসব কারণে রোজা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয় তা হলো নিম্নরূপ-

১. রোজার নিয়ত করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা।

২. রোজার নিয়ত করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সম্ভোগ করা।
৩. রোজার নিয়ত করার পর পাপ হওয়া সত্ত্বেও পায়ুপথে স্ত্রী সম্ভোগ করা।
৪. রোজা অবস্থায় কোনো বৈধ কাজ করার পর রোজা ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা।– ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৩৭৬, ৩৮৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০২,২০৩,২০৪, হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬৬৪, ৬৭৫, ৬৭৬, মাসায়েলে রোজা ৬৪, ৬৮,৭২,৭৪,৭৬,৭৭,৭৮, ৭৯, ৮৩, ১১৩।

প্রশ্ন ২৫০ : কি কি কারণে রোজা মাকরূহ হয়ে যায় জানতে চাই।

উত্তর : যেসব কারণে রোজা মাকরূহ হয়ে যায় তা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. বিনা প্রয়োজনে কোনো জিনিস চর্বন করা।
২. তরকারী ইত্যাদির স্বাদ বা লবণ পরখ করা।
৩. দাঁত মাজার জন্য মাজন, কয়লা, গুল বা টুথপেষ্ট ব্যবহার করা।
৪. গোসল ফরয অবস্থায় সারা দিন অতিবাহিত করা।
৫. কোনো রোগীর জন্য নিজের রক্ত দেয়া।
৬. দোষচর্চা, ছিদ্রান্বেষণ, মিথ্যা কথা বা অনর্থক কথা বার্তা বলা।
৭. বকা ঝকা বা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া।
৮. ক্ষুৎপিপাসার কারণে অস্থিরতা প্রকাশ করা।
৯. অধিক পরিমাণ থুথু একত্র করে গিলে ফেলা।
১০. দাঁতে আটকে থাকা ছোলা বুটের চেয়ে ছোটো খাদ্য কণা মুখের ভিতরে থাকাবস্থায় গিলে ফেলা। মুখ থেকে বের করে গিলে ফেললে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।
১১. নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না থাকার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করা।
১২. নিজের মুখে চিবিয়ে কোনো কিছু শিশুর মুখে তুলে দেয়া।
১৩. মলদ্বার এত পরিমাণ ধৌত করা যাতে ভিতরে পানি পৌঁছে যাওয়ার শঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়।
১৪. ঠোঁটে লিপিষ্টিক লাগানোর ফলে মুখের ভিতরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা হওয়া।– সহীহ বুখারী হাদীস ১৯২৭, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২৮/৮৩, মাসায়েলে রোজা ৬৬, ৬৭, ১২১, ১৬২।

প্রশ্ন ২৫১ : রোজার কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি কি জানতে চাই।

উত্তর :

- একটি রোজার কাফফারার জন্য ৬০টি রোজা পালন করতে হয়। এই ৬০টি রোজা একাধারে রাখা আবশ্যক। মাঝখানে এক দুটি ছুটে গেলে পুনরায়

একাধারে ৬০টি রোজা রাখতে হবে। এই ৬০ দিনের মাঝে রমাযান বা প্রসূতি অবস্থা (নিফাস) এসে গেলে কাফফারা আদায় হবে না।

- কাফফারার রোজা এমন দিন থেকে আরম্ভ করবে যাতে মাঝে কোনো নিষিদ্ধ দিন এসে না যায়। উল্লেখ্য, পাঁচ দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ বা হারাম। আর তা হলো, ইদুল ফিতরের একদিন এবং ঈদুল আযহার সময় জিলহজের তের তারিখসহ ঈদের তিন দিন।
- কাফফারার রোজা পালনকালে ঋতুশ্রাবের কারণে যে বিরতি হবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।
- কাযা রোজার ন্যায় কাফফারার রোজার নিয়তও সুবহে সাদিকের পূর্বে হওয়া আবশ্যক।
- যদি সহবাসের কারণে এক বা একাধিক রমাযানের একাধিক রোজা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে প্রতিটি রোজার জন্য আলাদা কাফফারা আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে অন্য কোনো কারণে যদি এমনটি হয় তাহলে একটি কাফফারাই যথেষ্ট হবে হবে।
- কাফফারার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ৬০ দিন রোজা রাখা সম্ভব না হলে পূর্ণ আহার গ্রহণ করতে পারে এমন ৬০ জন সত্যিকার দরিদ্র ব্যক্তিকে অথবা একজনকে ৬০ দিন দু বেলা করে পরিতৃপ্তসহকারে আহার করাতে হবে। নতুবা সদকায়ে ফিতর পরিমাণ খেজুর, কিসমিস, গম বা তার মূল্য প্রত্যেককে দিয়ে দিতে হবে। এই গম বা মূল্য দেয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০ দিনেরটা একই দিনে দিয়ে দিলে কাফফারা আদায় হবে না। ৬০ দিন আহার করানো বা মূল্য দেয়ার ক্ষেত্রে ২/১ দিন বিরতি পড়লে কোনো ক্ষতি নেই।–রদদুল মুহতার ৩/৩৯০,৩৯১,৩৯২, ৪/৩৪৪, হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬৭০, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৫/২০০, মাসায়েলে রোজা ৯৮।

প্রশ্ন ২৫২ : রোজার ফিদয়ার বিধান এবং পরিমাণ জানতে চাই।

উত্তর :

- ফিদয়া অর্থ ক্ষতিপূরণ। রোজা আদায় করতে না পারলে কিংবা কাযা আদায় করতে সক্ষম না হলে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাকে ফিদয়া বলে। প্রতিটি রোজার পরিবর্তে সদকায়ে ফিতর পরিমাণ পণ্য বা তার মূল্য দান করাই হলো একটি রোজার ফিদয়া।
- যে ব্যক্তির দায়িত্বে রোজা রয়ে গেছে; জীবদ্দশায় আদায় হয় নি মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ ফিদয়া আদায় করে দিবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত বা উইল করে যায় তাহলে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে ফিদয়া আদায় করবে। আর যদি ওয়াসিয়ত না করে যায় এবং ওয়ারিশগণ নিজেদের

সম্পত্তি থেকে ফিদয়া আদায় করে দেয় তবুও আশা করা যায় আল্লাহ তা কবুল করবেন এবং মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিবেন।

- বার্ধক্য জনিত কিংবা দীর্ঘ মেয়াদী কোনো দুরারোগ্যের কারণে পূর্ণ সুস্থতার সম্ভাবনা না থাকলে প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে ফিদয়া আদায় করার অবকাশ রয়েছে। তবে এধরনের ব্যক্তি যদি পুনরায় কখনো রোজা রাখার সক্ষমতা লাভ করে তবে তকে রোজা কাযা করতে হবে। এবং দানকৃত ফিদয়ার সওয়াব সে পৃথকভাবে লাভ করবে।–সূরা বাকারা ১৮৪, বাদাইয়ুস সানায়ে' ২/২৫২।

প্রশ্ন ২৫৩ : যদি কোনো ব্যক্তি শাওয়ালের বিশেষ ছয় রোযার মধ্যে কাযা রোযার নিয়ত করে তাহলে একত্রে ফরয রোযার কাযা এবং শাওয়ালের নফল রোযা আদায় হবে কি না?

উত্তর : শাওয়ালের বিশেষ ছয় রোযার মধ্যে কাযা রোযার নিয়ত করলে কাযা রোযাই আদায় হবে, শাওয়ালের নফল রোযা আদায় হবে না। হাদীসে শাওয়ালের রোযার যে ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে তা-ও পাওয়া যাবে না; বরং তার জন্য শাওয়াল মাসের মধ্যে পৃথক ছয়টি রোযা রাখতে হবে।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৩০।

প্রশ্ন ২৫৪ : রমাযান মাসে শিশু সন্তানকে দুগ্ধ দানকারিণী মহিলার জন্য রমাযানের রোযা রাখা জায়েয হবে কি?

উত্তর : দুগ্ধ দানকারিণী মহিলা রোযা রাখার দ্বারা যদি নিজের বা সন্তানের জীবনের আশঙ্কা বোধ করে অথবা যদি দুধ শুকিয়ে যাওয়ার ভয় হয় যার দ্বারা সন্তানের কষ্ট হবে তাহলে উক্ত মহিলার জন্য রোযা না রাখার অবকাশ রয়েছে। তবে পরবর্তীতে রোযাগুলো কাযা করে নিতে হবে- ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭, বাদায়িউস সানায়ে' ২/২৫০, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৭০, মাসাইলে রোযা; পৃষ্ঠা ১১৯।

প্রশ্ন ২৫৫ : রমাযান মাসের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফের হুকুম কী?

উত্তর : রমাযানের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। সুতরাং কোনো একজন মহল্লার মসজিদে ই'তিকাফে বসলে মহল্লার সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ না বসলে মহল্লার সকলেই সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ পরিত্যাগ করার গোনাহগার হবে।– আদদুররুল মুখতার ২/৪৪১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/২৫৭।

প্রশ্ন ২৫৬ : রোযা রাখা অবস্থায় রক্ত গ্রহণ করলে কি রোযা ভেঙে যাবে?

উত্তর : রোযা রাখা অবস্থায় রক্ত গ্রহণ করলে রোযার কোনো ক্ষতি হয় না।– রদ্দুল মুহতার ২/১৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩, আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৯, আলহিদায়া ১/২০০, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৩৭৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৫৩, ফাতাওয়া

হাক্কানিয়া ৪/১৬৪, ফাতাওয়া খানিয়া ১/২০৫, ফাতাওয়া উসমানী ১/১৮১, খাইরুল ফাতাওয়া ৪/৭৪।

প্রশ্ন ২৫৭ : রমাযান মাসে যে মহিলার রোযা রাখা নিষিদ্ধ সে মহিলা কি পানাহার করতে পারবে নাকি রোযাদারদের ন্যায় দিন অতিবাহিত করবে?

উত্তর : যে সকল মহিলারা শরঈ ওযরের কারণে রমাযান মাসে রোযা রাখতে পারে না তাদের জন্য রোযাদারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা জায়েয নেই; বরং তারা পানাহার করবে। তবে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে পানাহার করবে না।— রদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৩, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৬৭৮, ইমদাদুল আহকাম ২/১৩৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/২৬১।

প্রশ্ন ২৫৮ : গোসল ফরয অবস্থায় সাহরী খাওয়ার হুকুম কী?

উত্তর : গোসল ফরয অবস্থায় সাহরী খাওয়া জায়েয আছে। তবে খাওয়ার পূর্বে কুলি করে নিবে, অন্যথায় মাকরূহ হবে। তবে বিনা কারণে ফরয গোসলে বিলম্ব করা উচিত নয়।— রদ্দুল মুহতার ১/১৭৫, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৩৫, খাইরুল ফাতাওয়া ২/৭৫।

প্রশ্ন ২৫৯ : যদি কোনো ব্যক্তি রমাযান মাসে রোযা রেখে স্ত্রী সহবাস করে, কিন্তু তার জানা ছিল না যে, স্ত্রী সহবাসের দ্বারা রোযা ভেঙে যায় তাহলে তার উপর কাযা কাফ্ফারা উভয়টাই ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : কেউ যদি রমাযান মাসে রোযা রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তার উপর কাযা কাফ্ফারা উভয়টাই ওয়াজিব হবে। আর এক্ষেত্রে মাসআলা না জানা ওযর হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে যদি সে দারুল হারবে থাকে এবং মাসআলা জানার কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে মাসআলা না জানা ওযর হিসেবে বিবেচিত হবে।— সূরা নিসা; আয়াত ১৭, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১১১১, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ২২৪, মিশকাত শরীফ; হাদীস ২১৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০২, ২০৫, আদদুররুল মুখতার ২/৪০৯, আলহিদায়া ২/৩১৭, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪৩০, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৪৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/১৮২।

প্রশ্ন ২৬০ : কোনো ব্যক্তি যদি অসুস্থতার কারণে রোযা রাখতে সক্ষম না হয় এবং ঐ অবস্থায়ই মারা যায় তাহলে তার ছুটে যাওয়া রোযাগুলোর ফিদয়া দেওয়া কি ওয়াজিব?

উত্তর : না, এক্ষেত্রে তার ছুটে যাওয়া রোযাগুলোর ফিদয়া দেওয়া ওয়াজিব নয়।— আদদুররুল মুখতার ২/৪২৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/২১৭।

প্রশ্ন ২৬১ : জনৈক ব্যক্তি রমাযান মাসে যোহরের পর মুসলমান হলো। এখন তার জন্য কি ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি যদি রমাযান মাসে যোহরের পর মুসলমান হয় তাহলে তার জন্য ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে না। এমনকি ফজরের পূর্বেও যদি মুসলমান হয় তবুও ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে না। তবে দিনের বাকী সময় রোযাদারের মতো অনাহারে থাকবে।— বাদায়িউস সানায়ে' ২/২৩৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪২৯, আলবাহরুর রায়েক ২/৫০৪।

প্রশ্ন ২৬২ : ফিদয়া কখন কিভাবে দিতে হয় এবং এর পরিমাণ কত?

উত্তর : মৃত্যুকালে কোনো ব্যক্তির দায়িত্বে যদি কোনো ফরয, ওয়াজিব নামায কিংবা রোযা কাযা থেকে যায় এবং মৃত্যুর পূর্বে সে ঐ নামায, রোযার ফিদয়া আদায়ের ব্যাপারে অসিয়ত করে যায় তাহলে ওয়ারিসদের জন্য তার মীরাসের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে ফিদয়া আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি ফিদয়া আদায়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ সম্পদের বেশির প্রয়োজন হয় তাহলে এক্ষেত্রে অন্যান্য ওয়ারিসদের অনুমতি আবশ্যক।

এক ওয়াক্ত নামায ও একটি রোযার নির্ধারিত ফিদয়ার পরিমাণ হলো, আধা সা' তথা পৌনে দুই সের গম/আটা কিংবা সমমূল্যের অর্থ। বিত্রসহ দৈনিক ছয় ওয়াক্ত নামায হিসেবে ফিদয়া আদায় করতে হবে। একজন হতদরিদ্র ব্যক্তিকে একাধিক বা সমস্ত ফিদয়া দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। তবে এক ব্যক্তিকে এক ফিদয়ার কম দেওয়া জায়েয নেই।— রদ্দুল মুহতার ২/৫৩২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১২৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৪৬৭, ৪৬৯।

প্রশ্ন ২৬৩ : জনৈক ব্যক্তি রমাযান মাসে রোযা রাখার নিয়তে সাহরী খেল। অতঃপর সে দিনের বেলা বললো যে, আজকের দিনের রোযা রাখব না। এই বলে সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রকার ওযর ছাড়াই খানা খেল। তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তির জন্য বিনা ওযরে এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয হয়েছে। তাকে উক্ত রোযার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টিই আদায় করতে হবে। আর কাফ্ফারা হলো, একজন গোলাম আযাদ করা, যদি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম না হয় তাহলে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোযা রাখবে। আর যদি রোযা রাখতেও সক্ষম না হয় তাহলে ষাট জন মিসকীনকে দুই বেলা খানা খাওয়াবে। সাথে সাথে তওবা ইস্তিগফারও করতে থাকবে।— ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৫, আদদুররুল মুখতার ২/৪০৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/১৭২, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪২৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/১৯৯।

ই'তিকাফ

প্রশ্ন ২৬৪ : ই'তিকাফ কি ও কত প্রকার এবং এর জন্য কি কি শর্ত প্রযোজ্য? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর :

- ই'তিকাফ অর্থ স্থির থাকা, অবস্থান করা। পরিভাষায় জাগতিক যাবতীয় কার্যকলাপ ও পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূণ্য লাভের উদ্দেশে মসজিদ বা ঘরের নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়।
- ই'তিকাফ তিন প্রকার। যথা,

১. ওয়াজিব। যেমন, মান্নতের ই'তিকাফ। এ ই'তিকাফের জন্য রোজা শর্ত।

২. সুন্নতে মুয়াক্কাদা কেফায়া। যেমন, রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা। অর্থাৎ বড়ো গ্রাম বা শহরের প্রত্যেকটা মহল্লা এবং ছোটো গ্রামের পূর্ণ বসতিতে এক দুজন ই'তিকাফ করলে সকলেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর কেউ ই'তিকাফ না করলে সুন্নত পরিত্যাগের জন্য সবাই দায়ী হবে। বিশ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত এ ই'তিকাফের সময়।

৩. মুস্তাহাব। যেমন, ওয়াজিব, সুন্নত ই'তিকাফ ব্যতীত যে কোনো সময় ই'তিকাফ করা। এর জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। সামান্য সময়ের জন্যও এ ই'তিকাফ হতে পারে। এ ই'তিকাফের কোনো কাযা নেই। – সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৯৯৮, সুনানে আবু দাউদ হাদীস ২৪৭৩, আদদুররুল মুখতার ৩/৪২৯-৪৩৪, বাদাইয়ুস সানায়ি' ২/২৭৫, হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬৯৯, ৭০০, ৭০১।

প্রশ্ন ২৬৫ : ই'তিকাফের জন্য কি কি শর্ত প্রযোজ্য? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ই'তিকাফের জন্য পাঁচটি শর্ত প্রযোজ্য। যথা :

১. মুসলিম হতে হবে।

২. বিবেচনা বোধসম্পন্ন হতে হবে।

৩. সুন্নত ও ওয়াজিব ই'তিকাফ এমন মসজিদে হতে হবে যেখানে জামাতের সাথে নামায আদায় হয়। এ শর্ত পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহিলাগণ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে ই'তিকাফ করবে।

৪. ই'তিকাফের নিয়ত করতে হবে।

৫. ঋতুস্রাব বা প্রসূতি অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হবে।– সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৯৯৮, সুনানে আবু দাউদ হাদীস ২৪৭৩, আদদুররুল মুখতার ৩/৪২৯-৪৩৪, বাদাইয়ুস সানায়ি' ২/২৭৫, হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬৯৯, ৭০০, ৭০১।

প্রশ্ন ২৬৬ : কি কি কারণে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যায়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যেসব কারণে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যায় তা নিম্নরূপ:

১. স্ত্রী সহবাস করা।

২. চুম্বন ও আলিঙ্গনের কারণে বীর্যপাত হওয়া।

৩. ই'তিকাফের স্থান থেকে শরীয়ত সম্মত বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত বের হওয়া।

৪. ধর্মচ্যুত হওয়া।

৫. মাতাল হওয়া।

৬. দীর্ঘ সময় অজ্ঞান ও উন্মাদ হয়ে থাকা।

৭. ঋতুশ্রাব ও প্রসূতি অবস্থা সৃষ্টি হওয়া।

৮. সুন্নত এবং ওয়াজিব ই'তিকাফের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় দিনের বেলা আহার করা।– আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/১৪৫, রদদুল মুহতার ৩/৪৩১,৪৩২,৪৩৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৫০৫।

প্রশ্ন ২৬৭ : যদি কোনো মু'তাকিফ (ই'তিকাফকারী) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হয়ে কোনো কথাবার্তা বলে তাহলে তার ই'তিকাফের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো মু'তাকিফ শরীয়ত অনুমোদিত কোনো প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হয় এবং কারো সাথে দু-একটি কথা বলে তাহলে ই'তিকাফ বাতিল হবে না। তবে যদি বিনা প্রয়োজনে মসজিদের বাহিরে দাঁড়িয়ে শুধু শুধু গল্প-গুজব করতে থাকে তাহলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে।– মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৭০২, রদ্দুল মুহতার ২/৪৪৫, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/২০৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/২৯১।

প্রশ্ন ২৬৮ : হাদীসে এসেছে, لا اعتكاف الا بصوم (রোযা ব্যতীত কোনো ই'তিকাফ হয় না)। এতদসত্ত্বেও কিছু লোক তাবলীগের কাজ করে আর রোযাবিহীন অবস্থায় মসজিদে ই'তিকাফের নিয়তে থাকে, খাওয়া-দাওয়া করে। আমার প্রশ্ন হলো, তাদের রোযাবিহীন ই'তিকাফ ও মসজিদে থাকা খাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : ওয়াজিব এবং সুন্নাত ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে। কিন্তু নফল ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরি নয়। সুতরাং তাবলীগ জামা'আতের ভাইদের জন্য নফল ই'তিকাফের নিয়তে রোযাবিহীন অবস্থায় মসজিদে থাকা খাওয়া জায়েয আছে।– উমদাতুল কারী শরহুল বুখারী (মাকতাবায়ে শামেলা সংস্করণ) ১৭/১৮৭, আদদুররুল মুখতার ২/৪৪২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১১, আলবাহরুর রায়েক ২/৫২৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৭৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/১৯৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/২৫২।

প্রশ্ন ২৬৯ : কোনো ই'তিকাফকারী যদি জানাযার নামায পড়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হয় তবে তার ই'তিকাফের হুকুম কি?

উত্তর : উক্ত ই'তিকাফকারীর ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।– রদ্দুল মুহতার ২/৪৪৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/২৮৬।

প্রশ্ন ২৭০ : যদি কোনো ব্যক্তি ই'তিকাফ অবস্থায় দিনের বেলায় চাকরিতে যোগদান করে এবং রাতে মসজিদে অবস্থান করে তাহলে তার ই'তিকাফ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : ই'তিকাফ অবস্থায় প্রাকৃতিক প্রয়োজন যেমন, পেশাব-পায়খানা অথবা শরঈ প্রয়োজন যেমন, জুম'আর নামাযে শরীক হওয়া ইত্যাদি ব্যতীত মসজিদের বাহিরে যাওয়া নিষেধ। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি ই'তিকাফ অবস্থায় দিনের বেলায় নিজ কর্মস্থলে যোগদান করে এবং রাতে মসজিদে থাকে তাহলে তার ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে, সহীহ হবে না। তাকে পুনরায় কাযা করতে হবে। এটা ওয়াজিব এবং রমাযানের ই'তিকাফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নফল ই'তিকাফের ক্ষেত্রে বাহিরে যাওয়া জায়েয আছে।– আদদুররুল মুখতার ২/৪৪৪, ৪৪৬, রদ্দুল মুহতার ২/৪৪৫, আলবাহরুর রায়েক ২/৫২৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২৮৩।

হজ ও উমরা

প্রশ্ন ২৭১ : হজের বিধান কি এবং কোন শ্রেণীর মানুষের উপর হজ ফরয? জানতে চাই।

উত্তর :

১. সামর্থবান ব্যক্তিদের উপর জীবনে একবার হজ পালন করা ফরয। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেন, যেসব মানুষ মক্কায় গমনের সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহ তা'লার জন্য এ ঘরের হজ পালন করা ফরয। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি। ১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ তা'লা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'লার রাসূল ২. নামায প্রতিষ্ঠা করা ৩. যাকাত প্রদান করা ৪. আল্লাহর ঘরের হজ পালন করা ৫. রমাযানের রোজা রাখা।

২. যে ব্যক্তির নিকট মক্কা শরীফ থেকে হজ পালন করে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত পরিবারের আবশ্যকীয় ব্যয় ব্যতিরেকে মক্কা শরীফ যাতায়াতের মোটামুটি খরচ পরিমাণ অর্থ রয়েছে তার উপর হজ পালন করা ফরয। হজ ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক পণ্য এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমির মূল্য ও বিবেচিত হবে।

৩. মেয়েলোকের জন্য নিজ স্বামী বা নিজের কোনো বিশ্বস্ত ধার্মিক মাহরাম ব্যতীত হজ পালন করা অনুমোদিত নয়।অন্ধ এবং নাবালক শিশুর উপর হজ পালন করা ফরয নয়।– সূরা আলে ইমরান ৯৭, সহীহ বুখারী, হাদীস ৮, আদদুররুল মুখতার ৩/৪৫০, ৪৬৪, বাদাইউস সানায়ি' ২/৩৬৪

প্রশ্ন ২৭২ : হজ্জের ফরযসমূহ কি কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : হজের ক্ষেত্রে ফরয বিষয়গুলো হলো,

১. ইহরাম বাঁধা।
২. উকুফে আরাফা।
৩. তওয়াফে যিয়ারত। – আদদুররুল মুখতার ৩/৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৩, নূরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ১/৭৫, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৪৮২।

প্রশ্ন ২৭৩ : হজ্জের ওয়াজিবসমূহ কি কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : হজের ওয়াজিব বিষয়গুলো হলো,

১. উকুফে মুজদালিফা।
২. সাফা মারওয়ায় সায়ী করা।
৩. পাথর নিক্ষেপ করা।
৪. হজ্জে কিরান বা তামাত্তুর ক্ষেত্রে কুরবানী করা।
৫. মাথা মুণ্ডানো বা চুল খাটো করা।
৬. তওয়াফে বিদা ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে সার্বিক মূলনীতি হলো, হজের যেসব কাজ পরিত্যাগের ফলে দম তথা রক্তপণ প্রদান করতে হয় সেসব কাজ হজের ক্ষেত্রে ওয়াজিব বলে গণ্য।–আদদুররুল মুখতার ৩/৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৩, নূরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ১/৭৫, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৪৮২।

প্রশ্ন ২৭৪ : হজ্জের সুন্নতসমূহ কি কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : হজের ক্ষেত্রে সুন্নতসমূহ,

১. সুগন্ধি ব্যবহার করা।
২. হজের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা।
৩. প্রত্যেক নামাযের পর তালবিয়া পাঠ করা।
৪. বাইতুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি নিম্ন স্বরে পাঠ করা-
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم هذا بيتك عظمته وشرفته وكرمته فزده تعظيماً وتشريفاً وتكريماً
৫. দু'আ প্রার্থনা, বিনম্রতা ও একাগ্রতার প্রতি খুব মনোযোগী হওয়া।
৬. দিনের আলো বিকশিত হওয়া পর্যন্ত মুজদালিফায় অবস্থান করা।
৭. জিলহজের ৮ তারিখ ভোরে মিনায় গমন করা।
৮. ইয়াউমে আরাফার দিনে মিনায় রাত্রি যাপন করা।
৯. ইয়াউমে তারবিয়ায় মিনাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ।
১০. ইয়াউমে নাহরের রাত্রে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।
১১. তাশরীকের রাত্রিগুলোতে মিনাতে রাত্রি যাপন করা।
১২. মিনা থেকে মক্কায় প্রস্থান করার পর মুহাসসাব উপত্যাকায় অবতরণ করা।

১৩. হজের খুতবা প্রদান করা।
১৪. উমরা আদায়ের পূর্বে হজ পালন করা।
১৫. উকুফে আরাফার পূর্বে মক্কায় প্রবেশকারীদের জন্য তওয়াফে কুদুম করা।
১৬. তওয়াফে কুদুম আদায়ান্তে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু রাকাত নামায আদায় করা।
১৭. ইহরাম আদায়কালে সেলাইকৃত, বয়নকৃত এবং গিঁঠযুক্ত বস্ত্রাদি এবং জুতা-মুজা পরিধান থেকে বিরত থাকা। এবং সম্ভব হলে নতুন সাদা লুঙ্গি এবং চাদর নতুবা পরিস্কার লুঙ্গি এবং চাদর পরিধান করা।
১৮. ইমাম সাহেবের চারটি খুৎবা প্রদান করা।
১৯. নিম্নোক্ত কার্যাবলির উদ্দেশে গোসল করা : ১. ইহরাম বাঁধা ২. হারাম এবং মক্কা শরীফে প্রবেশ করা ৩. উকুফে আরাফা ৪. উকুফে মুযদালিফা ৪. আইয়ামে তাশরিকের দিনগুলোতে রমি করা ৫. মদীনা শরীফে প্রবেশ করা।
২০. যমযমের পানি পান করা। – আদদুররুল মুখতার ৩/৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৩, নূরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ১/৭৫, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৪৮২।

প্রশ্ন ২৭৫ : হজ্জের ক্ষেত্রে মুস্তাহাবসমূহ কি কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : হজ আদায়ের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব কার্যাবলী।

১. ব্যয়কুণ্ঠ না হওয়া; বরং উদার হস্তে ব্যয় করা।
২. সার্বক্ষণিক পাক পবিত্র অবস্থায় থাকা।
৩. সর্বদা ভাষাকে সংযত রাখা।
৪. মাতা পিতা, ঋণদাতা এবং জামিনের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা।
৫. স্থানীয় মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করে বিদায় হওয়া।
৬. পরিচিতজনদের থেকে বিদায় গ্রহণ করা।
৭. আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের থেকে মাফ চেয়ে নেয়া এবং মাফ করে দেয়া।
৮. তাদের থেকে দু'আ গ্রহণ করা।
৯. হজের উদ্দেশে বের হওয়ার সময় কিছু পরিমাণ দান করা।
১০. সম্ভব হলে বৃহস্পতি, সোম অথবা শুক্রবার গৃহ ত্যাগ করা।
১১. তওবা এস্তেগফার করে বের হওয়া।
১২. হজ যাত্রা কোন পথে, কার সাথে করবে প্রভৃতি বিষয়ে এস্তেখারা করা।– আদদুররুল মুখতার ৩/৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৩, নূরুল ইযাহ ওয়া নাজাতুল আরওয়াহ ১/৭৫, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৪৮২।

প্রশ্ন ২৭৬ : হজ কত প্রকার ও কি কি এবং কোন প্রকার হজ পালন করা তলনামূলক উত্তম জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : হজ তিন প্রকার। যথা, ১. হজ্জে ইফরাদ ২. হজ্জে কেরান ৩. হজ্জে তামাত্তু। এই তিন প্রকার হজের মধ্য হতে প্রথমত হজ্জে কেরান করা উত্তম, এরপর হজ্জে তামাত্তু এরপর হজ্জে ইফরাদ।– আদদুররুল মুখতার ৩/৫৫৩।

প্রশ্ন ২৭৭ : ইহরাম কি? ইহরাম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি জানতে চাই।

উত্তর :

১. নির্দিষ্ট বস্ত্র পরিধান পূর্বক হজ অথবা উমরা কিংবা হজ ও উমরা উভয়টির নিয়ত করত তালবিয়া পাঠ করা এবং বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ ও সাফা মারওয়া সায়ী করার পর মাথা মুণ্ডন করে বা চুল ছেটে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অবস্থাকে ইহরাম বলে।হজ বা উমরার উদ্দেশে যাত্রা করলে মীকাত তথা ইহরাম বাধার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করার পূর্বেই ইহরাম বেধে নেয়া আবশ্যক। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় হাজ্জীদের জন্য ইহরাম বাধার নির্দিষ্ট স্থানটি হলো ইয়ালামলাম। ইয়ালামলাম মক্কা থেকে দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত একটি পর্বত শৃঙ্গের নাম। প্লেন এ স্থান বরাবর রেখা কখন অতিক্রম করে তা উপলব্ধি করা বেশ দুস্কর। তাই প্লেন যোগে হজ বা উমরা যাত্রীদের জন্য প্লেনে আরোহণ করার পূর্বেই ইহরাম বেধে নেয়া উচিৎ। বিমান বন্দরে গিয়ে, হাজী ক্যাম্প থেকে, বাসা বা মসজিদ যেকোনো স্থান থেকে ইহরাম বাধার অবকাশ রয়েছে।
২. যারা প্রথমে মদীনা শরীফ গমনের ইচ্ছা পোষণ করেন তারা ইহরাম না বেধেই যাত্রা করবেন। কারণ মদীনা থেকে মক্কা গমনকারী হাজ্জীদের মীকাত হলো যুলহুলাইফা। বর্তমানে বীরে আলী নামে পরিচিত। তারা মদীনা যিয়ারত করে এ স্থান থেকে ইহরাম বেধে মক্কা শরীফ গমন করবেন।
৩. মক্কা শরীফে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গ যদি নফল উমরা পালন করতে চান তাহলে ইহরাম বাধার জন্য তাদেরকে হারামের সীমানার বাহিরে গিয়ে ইহরাম বেধে আসতে হবে। এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী এবং উত্তম স্থান হলো, তানয়ীম। বর্তমানে সেখানে মসজিদে আয়িশা নামে একটি মসজিদ রয়েছে। এ মসজিদে আয়েশায় গিয়ে ইহরাম বেধে নফল উমরা পালন করবেন। জে'রানা নামক স্থান থেকেও ইহরাম বেধে আসা যায়।
৪. ইহরাম বাধার ইচ্ছা হলে নখ কর্তন, বগল ও নিম্নাঙ্গের লোম পরিস্কারসহ যাবতীয় ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করা মুস্তাহাব। মাথা মুণ্ডানোতে অভ্যস্ত হলে মাথা মুণ্ডিয়ে নিবে নতুবা চুল আঁচড়িয়ে নিবে।
৫. এরপর ইহরামের নিয়তে ভাল করে গোসল করে নিবে। নতুবা উযূ করে নিবে। এটা সুন্নত।

৬. এরপর সেলাই বিহীন একটি সাদা লুঙ্গি এবং একটি চাদর পরিধান করবে। এক্ষেত্রে মহিলাগণ যে কোনো পোষাক পরিধান করতে পারেন। ইহরামের কাপড় নতুন বা পরিষ্কার হওয়া উত্তম।

৭. তারপর সুগন্ধি ব্যবহার করুন। এটা সুন্নত। এরপর ইহরামের নিয়তে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করবে। এটা সুন্নত। এ নামায মাথায় টুপি দিয়ে বা মাথা আবৃত করে আদায় করতে হয়।

৮. নামাযের পর টুপি খুলে রেখে কেবলামুখী অবস্থায় ইহরামের নিয়ত করতে হবে। বসে বসেই মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা উত্তম।

৯. এরপর তালবিয়া পাঠ করবে। তালবিয়া পাঠ করা সুন্নত। তবে নিয়তের সাথে তালবিয়া বা যেকোনো জিকর হওয়া শর্ত। তালবিয়া উঁচু আওয়াজে তিনবার পাঠ করা সুন্নত। তবে মহিলাদের জন্য উঁচু আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করা নিষিদ্ধ। তারা এতটুকু শব্দ করে তালবিয়া পাঠ করবে যাতে নিজ কানে শুনতে পারে। এরপর দুরুদ শরীফ পাঠ করবে এবং আল্লাহর কাছে নিজের উদ্দীষ্ট বিষয়ে দু'আ প্রার্থনা করবে। নিয়ত করে তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে ইহরাম বাধা সম্পন্ন হয়ে গেল।

১০. মহিলাগণ ঋতুশ্রাব বা প্রসূতি অবস্থায় হলে নামায না পড়ে শুধু নিয়ত করে তালবিয়া পড়ে নিলেই ইহরাম শুরু হয়ে যাবে।– আদদুররুল মুখতার ৩/৪৮০, ৩৮৬-৩৮৮,৪৯২, রদদুল মুহতার ৩/৪৮৪, ফাতাওয়া হক্কানিয়া ৪/২৩৪, ২৬৫, কামূসুল ফিকহ ২/৪৪।

প্রশ্ন ২৭৮ : ইহরাম অবস্থায় কি কি বিষয় নিষিদ্ধ জানতে চাই।

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় যেসব বিষয় নিষিদ্ধ তা নিম্নরূপ :

১. পুরুষের জন্য শরীরের পরিমাপ অনুসারে তৈরিকৃত সেলাই যুক্ত বস্ত্র পরিধান করা।
২. পুরুষের জন্য মাথা ও চেহারা এবং মহিলাদের জন্য শুধু চেহারা আবৃত করা।
৩. পুরুষের জন্য পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢাকা পড়ে যায় এমন জুতা বা সেন্ডেল পরিধান করা।
৪. সর্বপ্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৫. নখ, চুল বা লোম ইত্যাদি কর্তন করা।
৬. স্থল ভাগের প্রাণী শিকার করা বা তাতে কোনো রূপ সহযোগিতা করা। তবে মশা, মাছি জাতীয় কষ্টদায়ক প্রাণী মারাতে কোনোরূপ অসুবিধা নেই।
৭. স্ত্রী সহবাস করা বা এতদ সম্পর্কিত কোনো আলোচনা বা শৃঙ্গার করা।
৮. ঝগড়া-বিবাদ বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়া।– রদদুল মুহতার ৩/৪৯৯, ৫৭১, আলবাহরুর রায়িক ২/৫৬০।

প্রশ্ন ২৭৯ : ইহরাম অবস্থায় কি কি বিষয় মাকরূহ জানতে চাই।

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় মাকরূহ বিষয়গুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা।
২. চুল, দাড়ি বা শরীরে সাবান ব্যবহার করা।
৩. চুল বা উকুন পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় এমনভাবে চুলকানো।
৪. দাড়ি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় এমনভাবে দাড়ি খিলাল করা।
৫. ইহরামের কাপড় সেলাই করে, গিরা দিয়ে বা পিন ইত্যাদি দিয়ে আটকানো।
৬. বালিশের উপর মুখ দিয়ে উপুড় হয়ে শয়ন করা।
৭. সুগন্ধিযুক্ত খাদ্য যদি পাকানো না হয় তা আহার করা।
৮. উত্তেজনাসহকারে স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ দর্শন করা।
৯. নাক, গলা কাপড় দিয়ে আবৃত করা।
১০. এলাচি, লবঙ্গ বা সুগন্ধিযুক্ত তামাক বা জর্দাসহকারে পান খাওয়া।– বাদাইউস সানায়ি' ২/৪০৮, ৪১৫, ৪১৮, আদদুররুল মুখতার ৩/৫০১, ৫৭৬,৫৭৭, হিদায়া ১/২৭০।

প্রশ্ন ২৮০ : সায়ী কি? সায়ী সংক্রান্ত জরুরী বিষয়গুলো জানতে চাই।

উত্তর :

- সাফা মারওয়া নামক দু'টি পাহাড়ের মাঝে বিশেষ নিয়মে সাতটি চক্কর দেয়াকে সায়ী বলা হয়।
- তওয়াফ ও তদানুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পন্ন করার পর সায়ী করার উদ্দেশে সাফা পাহাড় অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে হজরে আসওয়াদকে যথা নিয়মে চুমু দিবে। এটা মুস্তাহাব।
- তওয়াফের পর বিলম্ব না করেই সায়ী করা সুন্নত।
- সায়ী করার জন্য সাফা ফটক দিয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব। এরপর সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী গিয়ে এ দু'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব : أبدأ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِرِ الله
- সাফা পাহাড়ের এতটুকু উঁচুতে আরোহণ করা সুন্নত যেখান থেকে কা'বা শরীফ দৃষ্টিগোচর হয়।
- কা'বা শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে কা'বার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে তিনবার শব্দ করে এ দু'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব: الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله
- এরপর নিম্নস্বরে দুরুদ শরীফ পাঠ করে নিজের জন্য এবং সকলের জন্য দু'আ করবে। এটা দু'আ কবুল হওয়ার স্থান।

- সায়ীর নিয়ত করে নেয়া উত্তম।
- এরপর দু'আ কালাম পাঠ করতে করতে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হবে। যথাসাধ্য মধ্যবর্তী জায়গা দিয়ে সায়ী করার চেষ্টা করবে। চলার গতি থাকবে স্বাভাবিক। মাঝখানে সবুজ দুটি স্তম্ভ চোখে পড়বে। এই স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানটুকু পুরুষের জন্য কিছুটা দ্রুত গতিতে চলা সুন্নত। নারীরা এ স্থানেও স্বাভাবিক গতিতে চলবে। এ সময় এ দু'আটি পাঠ করবে-رب اغفروارحم انت الاعز الاكرم
- পুরুষের জন্য ভীড়ের কারণে দ্রুত চলা সম্ভব না হলে ভীড় কমার অপেক্ষা করবে। মধ্যবর্তী এ স্থানটুকু পার হওয়ার পর আবার স্বাভাবিক গতিতে চলতে চলতে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে যাবে। মারওয়া পাহাড়ের সামান্য উঁচুতে আরোহণ করে কা'বামুখী হয়ে পূর্বের ন্যায় হাত উঠিয়ে তিনবার এ দু'আটি পাঠ করবে এবং অন্যান্য দু'আ করবে- الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله
- পূর্বোক্ত নিয়মে সাফা মারওয়ার মাঝে সাতটি চক্কর দিবে। সপ্তম চক্করটি মারওয়ায় গিয়ে শেষ করবে।
- মহিলাগণ ঋতুশ্রাব অবস্থায় সায়ী করতে পারেন। তবে পবিত্র হওয়ার পর সায়ী করা সুন্নত।
- সায়ীর সপ্তম চক্কর শেষ হওয়ার পর মসজিদে হারামের ভিতরে এসে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করা মুস্তাহাব।– আলমাউসু'আতুল ফিকহিয়্যা ২৫/১১, আদদুররুল মুখতার ৩/৫১৩, রদদুল মুহতার ৩/৫১৩, ৫১৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৭, ২৩৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৫০২, আলমাবসূত ১/,৩১,৩২, হিদায়া ১/২৩৮।

প্রশ্ন ২৮১ : তওয়াফের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি জানতে আগ্রহী।

উত্তর :

- তওয়াফ শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে চাদরের ডান অংশকে ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে দিবে। এরূপ করাকে ইজতিবা বলে। সম্পূর্ণ তওয়াফে এরূপ অবস্থা ধরে রাখাতে হবে। ইজতিবা করা সুন্নত। তওয়াফ ব্যতীত অন্য কোনো সময় ইজতিবা করবে না। যে তওয়াফের পর সায়ী নেই সে তওয়াফেও ইজতিবা করবে না। অতঃপর কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে হজরে আসওয়াদকে ডান দিকে রেখে দাঁড়াবে।
- এরপর তওয়াফের নিয়ত করবে। নিয়ত করার পর বাইতুল্লাহর দিকে মুখ থাকাবস্থায়ই ডান দিকে এতটুকু স্থান সরে দাঁড়াবে যাতে হজরে আসওয়াদ ঠিক বরাবর সামনে এসে যায়। এরপর নামাযের তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে হজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে নিম্নেক্ত দু'আটি পাঠ করবে-

بسم الله الله اكبر لا اله الا الله ولله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ايمانا بك وتصديقابكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك مُحَمَّد ﷺ

- এরপর হাত নামিয়ে ফেলবে। এরপর কাউকে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হলে হজরে আসওয়াদকে চুমু দিবে। চুমু দেয়া সুন্নত। তিনবার চুমু দেয়া মুস্তাহাব। চুমুতে শব্দ হবে না। প্রতিবার চুমু দেয়ার পর মাথা হজরে আসওয়াদের উপর রাখা ও মুস্তাহাব। ভিড়ের কারণে চুমু দেয়া সম্ভব না হলে হাত দ্বারা হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে হাতে চুমু দিবে। তাও সম্ভব না হলে কোনো লাঠি দ্বারা স্পর্শ করে তাতে চুমু খাবে। তাও সম্ভব না হলে দুই হাতের তালু দিয়ে হজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে দুই হাতে চুমু খাবে। এ সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে-

الله اكبر لا اله الا الله والحمد لله والصلاة على سيد المصطفى ﷺ

উল্লেখ্য, আজকাল অনেকে হাজরে আসওয়াদ, মুলতাযাম, রুকনে ইয়ামানী, প্রভৃতি স্থানে সুগন্ধি মেখে এসে থাকেন। তাই এহরাম অবস্থায় যে তওয়াফ হয় তাতে সরাসরি এসব স্থান স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। কারণ এহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ।

- চুমু দেয়ার পর পা শক্ত রেখে একটু ডান দিকে ঘুরবে। এরপর কা'বা শরীফকে বাম দিকে রেখে তওয়াফ শুরু করবে। তওয়াফের সময় কা'বা শরীফের দিকে বুক, দৃষ্টি এবং মুখ ফিরাবে না। তওয়াফের সাত চক্করের মধ্য হতে প্রথম তিন চক্করে বীরের ন্যায় বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে ঘন ঘন পা ফেলে কিছুটা দ্রুত গতিতে চলতে হবে। এরূপ করাকে রমল বলা হয়। রমল করা সুন্নত। তবে যে তওয়াফের পর সায়ী নেই সে তওয়াফে রমলও নেই। রমল, এজেতেবা শুধু পুরুষের জন্য মহিলাদের জন্য নয়।
- তওয়াফ হাতীমের বাহির দিয়ে করা ওয়াজিব। ভীড় না থাকলে এবং কাউকে কষ্ট দেয়া না হলে পুরুষের জন্য যথা সম্ভব বাইতুল্লাহর কাছাকাছি দিয়ে তওয়াফ করা উত্তম।
- প্রত্যেক চক্করে রুকনে ইয়ামানীতে (কা'বা শরীফের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ) পৌঁছে সম্ভব হলে দুই হাতে কিংবা শুধু ডান হাতে রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করবে।
- এরপর রুকনে ইয়ামানী থেকে হজরে আসওয়াদের কোণে যাওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব। প্রত্যেক চক্করেই এ স্থানে এ দু'আটি পাঠ করবে- بنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
- এরপর হজরে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছে গেলে এক তওয়াফের এক চক্কর পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর সম্ভব হলে بسم الله اكبر বলে আবার পূর্বের নিয়মে হজরে আসওয়াদে চুমু খাবে বা হাতে স্পর্শ করে বা ইশারা করে হাতে চুমু খাবে। প্রত্যেক চক্করের শুরুতেই এভাবে চুমু খাবে। তবে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে না।

এভাবে সাত চক্কর শেষ হওয়ার পর আবার হজরে আসওয়াদে পূর্বের নিয়মে চুমু খাবে। এটা হলো সপ্তম চুমু। এ চুমুর মাধ্যমে তওয়াফ শেষ হলো। এবার চাদরের ইজতিবা খুলে ডান কাঁধ ঢেকে নিবে।

- তওয়াফ শেষ করার পর যদি ভীড় না হয় তাহলে হজরে আসওয়াদ ও কা'বা ঘরের ফটকের মধ্যবর্তী স্থানকে আঁকড়ে ধরবে। বুক চেহারা দেয়ালের সাথে লাগাবে। উভয় হাত উপরে উঠিয়ে দেয়ালে স্থাপন করে খুব কাকুতি মিনতি সহকারে দু'আ করবে। এ স্থানকে মুলতাযাম বলা হয়। এটা দু'আ কবুলের স্থান। এ স্থানে এরূপ দু'আ করা সুন্নত।
- এরপর সম্ভব হলে কা'বা শরীফের দরজা মুবারকের চৌকাঠ ধরে খুব দু'আ করবে। সম্ভব হলে গেলাফ আঁকড়ে ধরে খুব কান্না কাটি করবে।
- এরপর দুই রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব। এ নামাযকে সালাতুত তওয়াফ বলা হয়। তেমনিভাবে নফল তওয়াফের পরও দু রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব। এ নামায মাকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়া মুস্তাহাব। মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে তওয়াফ শেষে বিলম্ব না করে এ নামায পড়ে নেয়া সুন্নত। আর তখন নিষিদ্ধ বা মাকরূহ ওয়াক্ত হলে অন্য সময় পড়ে নিবে। এ নামাযের পর দু'আ কবুল হয়ে থাকে। মাকামে ইবরাহীমের দিকে যাওয়ার সময় এ আয়াতাংশটুকু পাঠ করবে- واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى
- তওয়াফের দুই রাকাত নামায আদায় করার পর যমযমের পানি পান করবে। এবং দু'আ করবে। এটাও দু'আ কবুলের স্থান। যমযমের পানি কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে পান করা মুস্তাহাব। যমযমের পানি পান করার সময় এ দু'আটি পাঠ করা মুস্তাহাব- اللهم انى اسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
- হজ্জে কিরান আদায়ের ক্ষেত্রে উমরার তওয়াফ, নফল তওয়াফ এবং তওয়াফে কুদুমের সময় তালবিয়া পাঠ করার অবকাশ রয়েছে। তেমনিভাবে হজ্জে ইফরাদের ক্ষেত্রে তওয়াফে কুদুম এবং নফল তওয়াফের সময় তালবিয়া পাঠ করা যাবে। তবে উঁচু আওয়াজে পাঠ করবে না। তবে এক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত দু'আগুলো পাঠ করা উত্তম। আর হজ্জের সায়ী যদি তওয়াফে যিয়ারতের পরে আদায় করা হয় কিংবা উমরার সায়ী হয় তাহলে এসায়ীতে তালবিয়া পাঠ করবে না। তবে যদি হজ্জের সায়ী তওয়াফে কুদুমের পর আদায় করা হয় তাহলে সে সায়ীতে তালবিয়া পাঠ করা উত্তম।– সূরা বাকারাহ ১২৫, সহীহ বুখারী হাদীস ১৬০১, সহীহ মুসলিম হাদীস ১২১৮,১২৩৪, ১২৬১, ১২৬২, সুনানে আবুদাউদ ১৮৮৪, ১৮৯২, সুনানে তিরমিযী ৮৬১, আলমুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন হাদীস ১৭৩৯, আলমাবসূত ১/২৩,২৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৫,২২৬, ২৩৬, ২৩৮, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪৯৭, ফাতহুলকাদীর ২/৪৬৬, রসায়েলে ইবনে আবিদীন ৩৪৯, রদদুল মুহতার ৮/২৪৬, হিদায়া ১/২৩৮, ২৪০, মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ মা'আল হামিশ ১০৪।

প্রশ্ন ২৮২ : উমরার ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়গুলো জানতে চাই।

উত্তর : সাধ্য থাকলে জীবনে একবার উমরা করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তিনটি কার্যক্রমের সমষ্টিকে উমরা বলা হয়। যথা,

১. ইহরাম বাধা।
২. তওয়াফ করা।
৩. সায়ী করা। সায়ী করার পর মাথা মুণ্ডন করে বা চুল ছোটো করে ইহরাম খুলতে হয়।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া–১/২৩৭, সিফাতুল হজ ওয়াল উমরা ৪।

প্রশ্ন ২৮৩ : বদলী হজের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো কি জানতে আগ্রহী।

উত্তর :

- যদি কোনো ব্যক্তি হজ ফরয হওয়ার পর দারিদ্র, পঙ্গু, অন্ধ ও লেংড়া প্রভৃতি ব্যধি, যানবাহনে চড়তে অক্ষম হওয়ার মত বৃদ্ধ বয়স, অনিরাপদ যাতায়াত পথ কিংবা মাহরাম অনুপস্থিতির কারণে হজ পালন করতে না পারে তাহলে তার জন্য মৃত্যুর পূর্বে তার পক্ষ থেকে বদলী হজ করানোর ওয়াসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। ওয়াসিয়ত না করলে গুনাহ হবে।
- মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মাধ্যমে যদি বদলী হজ করানো সম্ভব হয় তাহলে উত্তরাধিকারীদের উপর ওয়াসিয়ত অনুযায়ী বদলী হজ করানো ওয়াজিব। আর এর চেয়ে বেশি অর্থের প্রয়োজন হলে বদলী হজ করানোর ব্যাপারটি উত্তরাধিকারীদের ইচ্ছার উপর ন্যাস্ত থাকবে।
- মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়ত না করে গেলে যদি ওয়ারিশগণ তার পক্ষ থেকে নিজেদের অর্থ দিয়ে বদলী হজ করায় তবুও আশা করা যায় মৃত ব্যক্তির হজ আদায় হয়ে যাবে।
- বদলী হজ এমন ব্যক্তি দ্বারা করানো উত্তম যিনি ১. ভাল মানুষ রূপে পরিচিত ২. হজের মাসায়েল সম্বন্ধে সম্মক অবগত ৩. এবং পূর্বে নিজের হজ আদায় করেছেন।
- মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নফল হজ বা নফল উমরা অন্যের দ্বারা করানো যায়। এমনকি জীবিত সক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকেও নফল হজ বা উমরা অন্যের দ্বারা করানো যায়।
- বদলী হজের ক্ষেত্রে হজ্জে ইফরাদ করবে। তবে অনুমতি হলে হজ্জে কেরান ও করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু কেরান হজ করলে কুরবানী হজকারীর অর্থ থেকে আদায় করতে হবে। তবে অনুমতি প্রাপ্ত হলে মূল মালিকের অর্থ থেকেও আদায় করা যাবে।

- বদলী হজের ক্ষেত্রে ইহরাম বাধার সময় কার পক্ষ থেকে হজের ইহরাম বাধা হচ্ছে সেটা মুখে উচ্চারণ করে নেয়া উত্তম।

প্রশ্ন ২৮৪ : বদলী হজের ক্ষেত্রে কয়টি শর্ত প্রযোজ্য?

উত্তর : ফিকহের কিতাবগুলোতে আলাদা শিরোনামে বদলী হজের বিশটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। শর্তগুলো নিম্নরূপ-

১. ইহরাম বাধার সময় প্রতিনিধি হাজীর প্রধান হাজীর পক্ষ থেকে নিয়ত করা।
২. প্রকৃত অর্থে প্রধান হাজীর যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকা সত্ত্বেও নিজে হজ পালনে অক্ষম হওয়া।
৩. অক্ষমতা আমৃত্যু স্থায়ী হওয়া।
৪. হজ ফরয হওয়া।
৫. বদলী হজ করানোর পূর্বে অক্ষমতা সৃষ্টি হওয়া।
৬. হজ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় ব্যয় বা অধিকাংশ ব্যয় প্রধান হাজীর অর্থ থেকে নির্বাহ হওয়া।
৭. প্রধান হাজী যেভাবে নির্দেশনা দিবে সেভাবে প্রতিনিধি হাজীর জন্য মীকাত থেকে ইহরাম বাধা।
৮. প্রধান হাজীর পক্ষ থেকে বদলী হজের ব্যাপারে নির্দেশনা আসা।
৯. বদলী হজ পালনের বিনিময়ে কোনো রকম পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা।
১০. প্রতিনিধি হাজীর মাঝে হজ আদায়ের যাবতীয় শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা।
১১. প্রতিনিধি হাজীর জন্য যানবাহনে আরোহী হয়ে হজযাত্রা সম্পন্ন করা।
১২. প্রধান হাজীর পরিত্যাক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মাধ্যমে যদি বদলী হজের ব্যয়নির্বাহ সম্ভব হয় তাহলে প্রধান হাজীর স্বদেশ থেকে হজযাত্রা আরম্ভ করা। নতুবা যেখান থেকে ব্যয়নির্বাহ সম্ভব সেখান থেকেই হজ সম্পন্ন করা।
১৩. প্রধান হাজী যদি নির্দিষ্ট করে যায় তাহলে প্রতিনিধি হাজীর নিজে নিজেই বদলী হজ সম্পন্ন করা। অন্যের মাধ্যমে সম্পন্ন না করানো।
১৪. প্রতিনিধি হাজীর এ বদলী হজকে নষ্ট করে না দেয়া।
১৫. প্রধান হাজী যে হজ পালনের নির্দেশ দিবে সে হজই পালন করা। এক্ষেত্রে প্রধান হাজীর নির্দেশনার বিপরীত না করা।
১৬. প্রতিনিধি হাজীর জন্য একটি হজের ইহরাম বাধা।
১৭. যদি দুজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ পালনের ব্যাপারে প্রতিনিধি নিয়োগ হয় তাহলে এক ব্যক্তির পক্ষ থেকেই হজ পালন করা।
১৮. প্রধান হাজীর মুসলিম এবং বুদ্ধি-বিবেচনাবোধ সম্পন্ন হওয়া।
১৯. প্রতিনিধি হাজীর মুসলিম এবং বুদ্ধি-বিবেচনাবোধ সম্পন্ন হওয়া।

২০. উকুফে আরাফা ছুটে না যাওয়া।– আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৪৩৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭, ২৫৮, রদদুল মুহতার ৪/১৫, ২০, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫১৩।

প্রশ্ন ২৮৫ : হজের কার্যক্রমগুলো সংক্ষেপে জানতে চাই।

উত্তর : যখন ইহরাম বাধার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন গোসল অথবা উযূ করে নিবে। এরপর নতুন অথবা পরিষ্কার একটি লুঙ্গি এবং একটি চাদর পরিধান করবে। এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে। এরপর দু রাকাত নামায আদায় করবে। এরপর নিয়ত করবে, হে আল্লাহ আমি হজ করার ইচ্ছা পোষণ করছি। সুতরাং তুমি তা আমার জন্য সহজ করে দাও। এবং আমার পক্ষ থেকে সে হজকে কবুল করে নাও। এরপর তালবিয়া পাঠ করবে। তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে সে মুহরিম হয়ে গেলো। সুতরাং মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। এরপর মসজিদে হারাম হয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে। যখন বাইতুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হবে তখন তাকবীর, তাহলীল পাঠ করবে। এরপর হজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে দু'আ করবে। এরপর সম্ভব হলে হজরে আসওয়াদকে চুম্বন দিবে। এরপর বাইতুল্লাহকে বাম দিকে রেখে সাতবার তওয়াফ করবে। তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। হজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে যতবার অতিক্রম করবে ততবারই চুমু দিবে। এটা হলো তওয়াফে কুদুম। এরপর মাকামে ইবরাহীমে এসে দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এখানে সম্ভব না হলে মসজিদে হারামের যেখানে সম্ভব দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এরপর সাফা মারওয়ায় গিয়ে সাতটি চক্করের মাধ্যমে সায়ী সম্পন্ন করবে। সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় গিয়ে শেষ করবে। যখনই সাফা মারওয়ার উঁচুতে আরোহণ করবে কেবলামুখী হয়ে তাকবীর তাহলীল পাঠ করবে। এবং দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজ প্রয়োজনে দু'আ প্রার্থনা করবে। সাফা মারওয়ার মধ্যকার সবুজ দুটি স্তম্ভের মাঝখানের জায়গাটুকু একটু দ্রুত গতিতে অতিক্রম করবে। এরপর মুহরিম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে। এবং যখনই সুযোগ হবে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করবে। এরপর ইয়াউমে তারবিয়ার পূর্বের দিন আগত হলে ইমাম সাহেব একটি খুতবা প্রদান করবেন। তাতে ইমাম সাহেব মিনায় গমন, আরাফায় অবস্থান এবং নামায আদায় এবং ইফাজা সম্বন্ধে ধারণা দিবেন। যখন মক্কায় তারবিয়া দিনের ফজর নামায আদায় করবে তখন মিনার দিকে গমন করবে। এবং সেখানে অবস্থান করবে। এরপর আরাফার দিন ফজর নামায পড়ে আরাফার ময়দানে গমন করবে। এবং সেখানে অবস্থান করবে। আরাফার দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর ইমাম সাহেব ময়দানে সমাগত হাজ্জীদের নিয়ে জোহরের সময়ে যোহর এবং আসর এক সাথে আদায় করবে। এবং নামাযের পূর্বে দুটি খুৎবা প্রদান করবে। তাতে ইমাম সাহেব নামায আদায়, আরাফা এবং মুযদালিফায় অবস্থান, পাথর নিক্ষেপ, কুরবানী করা, মাথা মুণ্ডানো এবং তওয়াফে যিয়ারত সম্বন্ধে ধারণা দিবেন। এরপর সবাই পাহাড়ের কাছাকাছি গিয়ে অবস্থান করবে। ইমাম

সাহেবের জন্য উচিৎ হলো সে আরাফার ময়দানে তার যানবাহনের উপর অবস্থান করবে। সেখানে থেকে সে দু'আ করবে এবং হাজ্জীদেরকে হজের বিধি বিধান শিখাবে। যখন সূর্যাস্ত হবে তখন ইমাম সাহেব এবং তার সাথে হাজ্জীগণ মুযদালিফার দিকে অগ্রসর হবে। মুযদালিফায় এসে ইমাম সাহেব ইশার সময়ে হাজীদের নিয়ে ইশা এবং মাগরিবের নামায এক সাথে আাদায় করবে। নহরের দিন ফজরের সময় হলে ইমাম সাহেব হাজীদের নিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায়ই মুযদালিফায় ফজর নামায আদায় করবে। এরপর ইমাম সাহেবের সাথে হাজীরা অবস্থান করবে। এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার দিকে অগ্রসর হবে। মিনায় গিয়ে বড়ো জামারায় সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে। এবং প্রত্যেকবার নিক্ষেপের সময় তাকবীর পাঠ করবে। এবং প্রথমবার নিক্ষেপের সময়ই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে। এরপর পশু কুরবানী করবে। এরপর মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোটো করবে। এসব করার মাধ্যমেই সে হালাল হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে স্ত্রী সম্ভোগ তার জন্য হালাল হবে না। এরপর সেদিন মক্কায় এসে পড়বে। মক্কায় গিয়ে সে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করবে। এ তওয়াফকে তওয়াফে যিয়ারত বলা হয়। এখন তার জন্য স্ত্রী সম্ভোগ হালাল হবে। এরপর সে মিনায় ফিরে আসবে। এবং সেখানে অবস্থান করবে। যখন ইয়াউমে নাহরের দ্বিতীয় দিন সূর্য ঢলে পড়বে তখন তিন জামারাতের প্রতিটিতে সাতটি করে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করবে। পরের দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পূর্বের ন্যায় তিন জামারাতে সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করবে। এরপর সেদিন কিংবা তার পরের দিন মক্কায় ফিরে আসবে। এবং বাইতুল্লাহর সাতবার তওয়াফ করবে। এবং এতে কোনো রমল করবে না। এই তওয়াফকে তওয়াফে সদর বলা হয়। এটা হলো হজ্জে ইফরাদ।

যদি হজ পালনকারী ব্যক্তি হজ্জে কিরান করে তাহলে তাকে মিকাত থেকে হজ এবং উমরা উভয়টির ইহরাম বাধতে হবে। এরপর মক্কায় প্রবেশ করে উমরার তওয়াফ এবং সায়ী করবে। এরপর তওয়াফে কুদুম করবে। এরপর হজ্জে ইফরাদের ন্যায় বাকি কার্যক্রমগুলো আঞ্জাম দিবে। আর যদি হজ্জে তামাত্তু করে তবে প্রথমে উমরার ইহরাম বাধবে। এরপর তওয়াফ ও সায়ী করবে। এরপর মাথা মুণ্ডিয়ে উমরা থেকে হালাল হয়ে যাবে। এবং তওয়াফের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে। এরপর হালাল অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করতে থাকবে। এরপর যখন তারবিয়ার দিন আসবে তখন মসজিদে হারাম থেকে হজের ইহরাম বাধবে। এরপর হজ্জে ইফরাদের ন্যায় বাকী কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করবে।

প্রশ্ন ২৮৬ : জনৈক মহিলার হজ করার সামর্থ্য আছে। কিন্তু তার স্বামী তাকে অনুমতি দিচ্ছে না। এ মুহূর্তে কি সে তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত হজ আদায় করতে পারবে?

উত্তর : ফরয হজ আদায়ের জন্য স্বামীর অনুমতি নেয়া জরুরি নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মহিলা স্বামীর অনুমতি ব্যতীতই অন্য কোনো মাহরামকে সঙ্গে নিয়ে হজ আদায় করতে

পারবে।– ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৪৭৫, আলবাহরুর রায়েক ২/৫৫২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/২২০।

প্রশ্ন : ২৮৭ (ক) যে মুহরিম মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হয় নি সে অন্য মুহরিমের মাথা মুণ্ডিয়ে দিতে পারবে কি না? (খ) মাথা মুণ্ডন, তওয়াফে যিয়ারত এবং কুরবানীর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার বিধান কি? কোনো ব্যক্তি যদি কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলে তাহলে কোনো সমস্যা হবে কি না?

উত্তর : (ক) এক মুহরিম মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল না হয়ে অপর মুহরিমের মাথা মুণ্ডিয়ে দিতে পারবে। (খ) কুরবানী ও মাথা মুণ্ডনের মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী। সুতরাং কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডালে দম ওয়াজিব হবে। আর তওয়াফে যিয়ারত, কুরবানী ও মাথা মুণ্ডনের মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সুন্নত। ফলে কেউ যদি কুরবানী ও মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে তওয়াফে যিয়ারত করে ফেলে তাহলে তা সুন্নত পরিপন্থী ও মাকরুহ হবে।–আলবাহরুর রায়িক ২/৬৩৪, রদ্দুল মুহতার ৩/৫৩৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/৯৯, ১০৩, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/২৬৭

প্রশ্ন ২৮৮ : কেউ যদি এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, সে হজের রুকনসমূহ আদায় করার মতো ক্ষমতা রাখে না তাহলে সে অন্যের মাধ্যমে বদলি হজ করালে হজ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : কেউ যদি অসুস্থতার কারণে হজ পালন করতে অক্ষম হয়ে যায় এবং আর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সে অন্যের দ্বারা বদলি হজ করাতে পারবে। তবে এরপর যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে তাকে পুনরায় ফরয হজ আদায় করতে হবে।– সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৩৩৫, সুনানে নাসাঈ; হাদীস ২৬৩৪, আদদুররুল মুখতার ৪/১৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৮/১১৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/৪৫০, ইমদাদুল আহকাম ৩/১৯৮।

প্রশ্ন ২৮৯ : হজ আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভুলের কারণে যে দম দিতে হয় তার জন্য কোনো সময় বা স্থান নির্দিষ্ট আছে কি না? থাকলে তা কি?

উত্তর : হজ আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রুটি-বিচ্যুতির কারণে হাজী সাহেবদের উপর যে দম ওয়াজিব হয় তার জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই, যে কোনো সময় তা আদায় করা যাবে। তবে এই দম দেওয়ার জন্য স্থান নির্দিষ্ট। তা হলো, হারামের সীমানা। সুতরাং হারামের মধ্যেই পশু জবাই করতে হবে। হারামের বাহিরে উক্ত পশু জবাই করা জায়েয নেই।– আলহিদায়া ১/২৮০, ৩০০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬১, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/২৭৫, ২৭৬।

প্রশ্ন ২৯০ : কোনো মহিলা যদি হায়েয, নেফাস বা জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হয়। কিন্তু দমটা কী দ্বারা আদায় করবে?

উত্তর : হায়েয, নেফাস বা জুনুবী অবস্থায় যদি কেউ তাওয়াফে যিয়ারত করে তাহলে তার জন্য উট বা গরু দ্বারা দম দেওয়া ওয়াজিব।– আদদুররুল মুখতার ৩/৫৮১,

ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৪৫, ইরশাদুস সারী; পৃষ্ঠা ৩৮১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/৪১২।

প্রশ্ন ২৯১ : আমি এ বছর হজের উদ্দেশ্যে আগামী ১৪ এপ্রিল ঢাকা ত্যাগ করব। মক্কা, মীনা, আরাফা, মুযদালিফা মিলিয়ে আমাদের প্রায় এক মাস অবস্থান করতে হবে। মুকীম হওয়ার কারণে উল্লিখিত স্থানসমূহে আমাদের তো পূরা নামায পড়তে হবে। আরাফাতে অনেকে মুকীম হওয়া সত্ত্বেও কসর পড়ে থাকেন, অনেকে যোহর-আছর একসাথে পড়ে থাকেন। আমরা আছরের ওয়াক্তে আছর পড়ে থাকি। এতে অনেকে আপত্তি করেন। আমি আলেম নই। তাই আমার কথায় তারা আশ্বস্ত হতে পারেন না। যদি আমার আমল মাসআলা মোতাবেক হয় অনুগ্রহ পূর্বক অবগত করবেন। ভুল হলে সঠিক মাসআলা জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : আরাফার ময়দানসহ মীনা, মুযদালিফা কোথাও মুকীমের জন্য কসর পড়া জায়েয নেই। আর সেখানে যোহর ও আছরের নামায একসাথে পড়ার জন্য উলামায়ে আহনাফের নিকট কিছু শর্ত রয়েছে,

১. প্রথমে যোহর তারপর আছর পড়া।
২. হজের ইহরাম অবস্থায় থাকা।
৩. আরাফার দিন আরাফার ময়দানে থাকা।
৪. প্রধান ইমাম বা তার কোনো খলীফার পিছনে নামায পড়া।

উক্ত শর্তসমূহের মধ্য থেকে যদি কোনো একটি না পাওয়া যায় তাহলে যোহর নামাযের সময় যোহর এবং আছর নামাযকে একসাথে পড়া জায়েয নেই। সুতরাং যারা প্রধান ইমাম বা তার খলীফা ব্যতীত অন্য কোনো ইমামের পিছনে বা একাকী তাবুর মাঝে নামায পড়তে চায় তারা যোহরের নামায যোহরের ওয়াক্তে আর আছরের নামায আছরের ওয়াক্তে পড়বে। দুই ওয়াক্তের নামাযকে একত্রে পড়া জায়েয নেই।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৮, ইরশাদুস সারী; পৃষ্ঠা ২১৬, ২১৭, ২১৮, আলহিদায়া ১/২৪৫, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/২৩৪।

প্রশ্ন ২৯২ : কোনো ব্যক্তি যদি এ পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় যার উপর হজ ফরয অতঃপর হজের সময় আসার পূর্বেই সে সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় তবে কি তার হজ কাযা করা ওয়াজিব?

উত্তর : যদি কারো নিকট হজের সময়ের পূর্বে এ পরিমাণ সম্পদ জমা হয় যার উপর হজ ফরয এবং ঐ সম্পদ হজের সময় আসার পূর্বেই নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায় তবে তার উপর হজ ফরয নয়।– আলবাহরুর রায়েক ২/৫৫০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/৩৫৪।

প্রশ্ন ২৯৩ : স্ত্রীর উপর হজ ফরয থাকাবস্থায় তার স্বামী যদি নিজের টাকা খরচ করে স্ত্রীকে হজ করায় তবে স্ত্রীর ফরয হজ আদায় হবে কি না?

উত্তর : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের সম্পদ দ্বারা হজ করায় আর স্ত্রী নিজের ফরয হজ আদায়ের নিয়ত করে তবে তার ফরয হজ আদায় হয়ে যাবে।– সূরা আলে ইমরান; আয়াত ৯৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১৭, আলবাহরুর রায়েক ২/৫৪৮, রদ্দুল মুহতার ৪/২৬, ২৯, আদদুররুল মুখতার ৪/২৬, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৪৫৮, আলফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ ১/৪৫২, ইমদাদুল আহকাম ২/১৫৯, খাইরুল ফাতাওয়া ৪/২১১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/৩৫৮।

প্রশ্ন ২৯৪ : জনৈক ব্যক্তি এক লাখ টাকা ব্যয় করে ওমরা করে এসেছে। এখন কি তার উপর হজ ফরয? অনেকে বলেন, কা'বা শরীফ দেখলেই হজ ফরয হয়ে যায়। কথাটা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

উত্তর : যদি উক্ত ব্যক্তি শাওয়াল মাস শুরু হওয়ার আগেই ওমরা করে ফিরে আসে তাহলে তার উপর হজ ফরয হবে না। যদি মক্কা থেকে শাওয়াল মাস শুরু হওয়ার পর ফিরে আসে এবং ইতিপূর্বে সে হজ করেনি এবং তার কাছে হজের খরচ বহন করার মতো টাকা থাকে তাহলে তার উপর হজ করা ফরয। সরকারী বাধ্যবাধকতার কারণে মক্কায় থাকতে না পারলে বদলি হজ করাবে। পরবর্তীতে সময় ও সামর্থ্য হলে পুনরায় হজ করবে। উল্লেখ্য, কা'বা ঘর দেখলে হজ করা ফরয হয়ে যায় ধারণাটি সঠিক নয়। হজ প্রত্যেক বালেগ সামর্থবান মুসলমানের উপর ফরয।– সূরা আলে ইমরান; আয়াত ৯৭, রদ্দুল মুহতার ৩/৪৫৮, ৪৫৯, আলবাহরুর রায়েক ২/৫৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫১৯।

প্রশ্ন ২৯৫ : কোনো ব্যক্তি যদি কারো বদলি হজ আদায় করে। পরবর্তীতে যদি উক্ত ব্যক্তি হজ করার উপর সামর্থবান হয়ে যায়। তাহলে এখন কি তার জন্য পুনরায় হজ করতে হবে না কি পূর্বের হজই তার জন্য যথেষ্ট হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, এখন তাকে নিজের ফরয হজ আদায় করতে হবে। কারণ অন্যের বদলি হজ করার দ্বারা নিজের ফরয হজ আদায় হয় না।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭, রদ্দুল মুহতার ২/৬০২, আলহিদায়া ১/২৯৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৫/৪৫৮।

যাকাত ও সদকায়ে ফিতর

প্রশ্ন ২৯৬ : কি কি সম্পদ কি পরিমাণ থাকলে যাকাত ফরয হয় জানতে আগ্রহী।

উত্তর : যদি কারো নিকট ৭.৫ তোলা (৮৭.৪৮ গ্রাম) স্বর্ণ অথবা ৫২.৫ তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রুপা অথবা সমপরিমাণ মূল্যের ব্যবসায়িক পণ্য বা তরল (নগদ) অর্থ থাকে তাহলে তার উপর বৎসরান্তে শতকরা ২.৫ টাকা হারে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে যদি কারো নিকট কিছু পরিমাণ স্বর্ণ এবং কিছু পরিমাণ রুপা বা কিছু পরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্য ও কিছু পরিমাণ তরল অর্থ থাকে এবং এগুলো মিলে ৭.৫ তোলা (৮৭.৪৮ গ্রাম) স্বর্ণ অথবা ৫২.৫ তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রুপার সমপরিমাণ

মূল্যের হয়ে যায় তাহলেও বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।– ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৪৩।

প্রশ্ন ২৯৭ : যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে কি কি শর্ত প্রযোজ্য জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব শর্ত প্রযোজ্য তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. মুক্ত স্বাধীন হওয়া।
২. মুসলিম হওয়া।
৩. সাবালক হওয়া।
৪. বুদ্ধি এবং বিবেচনা বোধসম্পন্ন হওয়া।
৫. যাকাত উপযোগী সম্পদ হওয়া।
৬. সম্পদ যাকাত ওয়াজিব পরিমাণ হওয়া বা সমপরিমাণ মূল্য হওয়া।
৭. সম্পদ পূর্ণ মালিকানাস্বত্ব সম্পন্ন হওয়া।
৮. বৎসর পূর্ণ হওয়া।– হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ৭১৩,৭১৪।

প্রশ্ন ২৯৮ : যাকাত প্রদানের খাতগুলো কি কি জানতে চাই।

উত্তর : যাকাত প্রদানের খাতগুলো নিম্নরূপ-

১. নিম্নবিত্তের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ, যাদের নিকট যাকাত বা সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার মত অর্থ সম্পদ নেই।
২. সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত বা জীবিকা উপার্জনে অক্ষম প্রকৃতির মানুষ।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের যাকাত ফাণ্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।
৪. ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ।
৫. দীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে রত মুজাহিদ।
৬. সফরে রিক্তহস্ত হয়ে পড়া মুসাফির।
৭. যাকাত দাতার দরিদ্র ভাই বোন, ভাতিজা ভাতিজী, ভগ্নিপতি, ভাগনা ভাগনী, চাচা চাচী, খালা খালু, ফুফা ফুফু, মামা মামী, শশুর শাশুরী, জামাই, সৎ পিতা ও সৎ মাতা ইত্যাদি।
৮. যাকাত দাতার দরিদ্র চাকর নওকর বা কর্মচারী। সূরা তওবা ৬০, আদদুররুল মুখতার ৩/২৯৮।

প্রশ্ন ২৯৯ : সদকাতুল ফিতর সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর :

- ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় যদি কারো নিকট ৭.৫ তোলা (৮৭.৪৮ গ্রাম) স্বর্ণ অথবা ৫২.৫ তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রুপা অথবা সমপরিমাণ মূল্যের ব্যবসায়িক পণ্য বা তরল (নগদ) অর্থ থাকে তাহলে বৎসর অতিক্রান্ত না হলেও তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। তবে এক্ষেত্রে

গৃহের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ব্যতীত অন্যান্য আসবাব সামগ্রী, সৌখিন দ্রব্যাদি, অব্যবহৃত ঘর প্রভৃতির মূল্য ও ধর্তব্য হবে।

- রোজা রাখা ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত নয়। কেউ যদি রোজা না রাখে কিংবা না রাখতে পারে তার উপরও সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে।
- সদকাতুল ফিতর নিজের পক্ষ থেকে এবং পিতা হলে শিশু সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করা ওয়াজিব। সাবালক সন্তান, স্ত্রী, স্বামী, অধিনস্ত কর্মচারী এবং মাতা পিতা প্রমুখের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে সাবালক সন্তান উন্মাদ বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধি হলে পিতার জন্য তার পক্ষ থেকে আদায় করা ওয়াজিব।
- একান্নভুক্ত পরিবার হলে সাবালক সন্তান, মাতা-পিতা এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়।
- ওয়াজিব না হলেও সঙ্গতি থাকলে সদকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব এবং অনেক পূণ্যের কাজ।
- সদকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে ১ কেজি ৬৬২ গ্রাম গম, আটা, ময়দা, ছাতু বা কিশমিশ কিংবা সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করতে হবে। তবে ১ কেজি ৮৬৬ গ্রাম বা তার মূল্য প্রদান করা উত্তম। যব বা খেজুর দিতে চাইলে ৩ কেজি ৫২৩ গ্রাম বা সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করতে হবে। তবে ৩ কেজি ৭৩২ গ্রাম প্রদান করা উত্তম।
- ধান, চাউল, বুট, কলাই এবং মটর ইত্যাদি দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় করতে চাইলে উপরোক্ত গম বা যবের মূল্যে প্রাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রদান করতে হবে।
- সদকাতুল ফিতর সরাসরি খাদ্যশস্যের তুলনায় তার মূল্য প্রদান করা উত্তম।
- ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযের পূর্বেই সদকাতুল ফিতর আদায় করা উত্তম। তবে নামাযের পরে কিংবা রমযানের মধ্যেও প্রদান করা জায়েয আছে
- যেসব ব্যক্তিদেরকে যাকাত দেয়া যায় তাদেরকে সদকাতুল ফিতরও প্রদান করা যায়।
- একজনের সদকাতুল ফিতর একজনকে বা একাধিক ব্যক্তিকে প্রদান করা জায়েয আছে। তেমনিভাবে কয়েকজনের সদকাতুল ফিতরও একজনকে প্রদান করা জায়েয আছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে সে এর মাধ্যমে যাকাত বা সদকাতুল ফিতর প্রদানের উপযুক্ত না হয়ে যায়। অধিকতর উত্তম হলো, একজন ব্যক্তিকে এ পরিমাণ সদকাতুল ফিতর প্রদান করা যাতে সে ছোটো খাটো প্রয়োজন পূরণ করতে পারে কিংবা পরিবার পরিজন নিয়ে দু তিন বেলা আহার গ্রহণ করতে পারে।– হাশিয়াতুত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ ৭২৩,বাদাইয়ুস

সানায়ি' ২/২০৫,২০৮, আদদুররুল মুখতার ৩/৩২২, ৩২৫, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৪/৩৭৫, ৩৮৭,-৩৯০।

প্রশ্ন ৩০০ : সব শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রেই কি একই মানের সদকাতুল ফিতর প্রযোজ্য? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : সব শ্রেণীর মানুষের জন্য একই মানের ফিতরা আদায় করা উচিৎ নয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন মানুষের মাঝে বিভাজন রয়েছে তেমনিভাবে ফিতরা আদায়ের ক্ষেত্রে এই বিভাজনকে বিবেচনায় রাখা উচিৎ। যারা তুলনামূলক বেশি অর্থশালী তারা উন্নত মানের খেজুর বা কিসমিস বা তার মূল্য দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় করবে। আর যারা তুলানামূল কম অর্থের মালিক তারা আটা, ময়দা, ছাতু জাতীয় খাদ্যদ্রব্য বা তার মূল্য দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় করবে। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম রা. অধিকাংশ সময় খেজুর দ্বারাই সদকাতুল ফিতর আদায় করতেন। আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. আজীবন খেজুর দ্বারাই সদকাতুল ফিতর আদায় করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী র. এর মতে হাদীসে বর্ণিত ফিতরার খাদ্যদ্রব্য সমূহের মধ্য হতে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ মূল্যের দ্রব্য দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদায় করা উত্তম। ইমাম মালেক র. এর মতে খেজুর দ্বারা ফিতরা আদায় করা উত্তম এবং খেজুরের মধ্য হতে সবচেয়ে উন্নত খেজুর আজওয়া দ্বারাই আদায় করা উত্তম। আজওয়া খেজুরের বর্তমান বজার মূল্য অন্ততপক্ষে ৩,০০০/- টাক। প্রতি কেজি হিসেবে এক সা' খেজুরের মূল্য প্রায় ১০,০০০/- টাকা। ইমামা আহমদ রহ. মতানুসারে সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করে খেজুর দ্বারা ফিতরা আদায় করা উত্তম। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতেও অধিক মূল্যের খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায় করা উত্তম। আলমুগনী, ৪/২১৯, আওজাযুল মাসালিক, ৬/১২৮ , আল ইসতিযকার ৩/২৪২/৫৮৬।

প্রশ্ন ৩০১ : নেশাকারীকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : নেশাকারী যদি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয় তবে তাকে যাকাত প্রদান করা হলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে যেহেতু এ ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অর্থটি গুনাহের কাজে ব্যবহার করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে তাই এই অর্থটা এমন ফকীর মিসকিনকে দেওয়া ভালো যারা অর্থটাকে নিজেদের বৈধ প্রয়োজনে ব্যয় করবে। কেননা গুনাহের কাজে সহযোগিতা করতে কুরআনে কারীমে নিষেধ করা হয়েছে।– সূরা তাওবা; আয়াত ৬০, আদদুররুল মুখতার ৩/১৭০, আলবাহরুর রায়েক ২/৩৫২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৭৮।

প্রশ্ন ৩০২ : কেউ যদি তার আপন ভাইকে যাকাতের টাকা প্রদান করে তাহলে তার উক্ত যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : গরিব ভাইকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। বরং অন্যের তুলনায় নিজের ভাইকে যাকাত দেওয়া বেশি উত্তম।– রদ্দুল মুহতার ২/৩৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/২১২, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৯২।

প্রশ্ন ৩০৩ : জনৈক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট হতে নিসাব পরিমাণ টাকা ঋণ নেয়। এক বছর পর ঋণ গ্রহীতা এক-তৃতীয়াংশ টাকা পরিশোধ করে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত ব্যক্তির ঐ টাকার উপর যাকাত ফরয কি না?

উত্তর : যেহেতু ঋণ গ্রহীতা এক-তৃতীয়াংশ পরিশোধ করেছে এবং বাকীটা দিবে সেটাও নিশ্চিত। তাই উক্ত টাকার উপর বিগত বছরের যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং উসূলকৃত টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এখন আদায় করে দিবে এবং বাকীটা উসূল করার পর আদায় করবে।– রদ্দুল মুহতার ৩/২৩৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/৯৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৪৯৮।

প্রশ্ন ৩০৪ : আমি মীরাস সূত্রে ৫ কাঠা জমির মালিক হয়েছি। জমিটি আমি ৯ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি। চুক্তি হয়েছিল, পাঁচ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করবে। কিন্তু চার মাসে ৬ লক্ষ টাকা পরিশোধের পর বাকী টাকা এখনো পরিশোধ করে নি। এক বছরেরও বেশি সময় দিচ্ছি-দিব বলে পার করে দেয়। এখন জিজ্ঞাসার বিষয় হলো, আমাকে উক্ত বকেয়া ৩ লক্ষ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কি না? দিলে কখন আদায় করব? উসূল হওয়ার পর বিগত সময়ের যাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর : উক্ত জমি ক্রেতার নিকট আপনার প্রাপ্ত বকেয়া তিন লক্ষ টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে বর্তমানেই তা আদায় করতে হবে না; বরং যখন টাকা আপনার মালিকানায় আসবে তখন আদায় করতে হবে এবং উসূল হওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাতও আদায় করতে হবে।– আদদুররুল মুখতার ৩/২৩৬, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৭১৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/৯৯, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৯০।

প্রশ্ন ৩০৫ : যাকাত হিসেবে টাকা না দিয়ে যদি উক্ত টাকা দ্বারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত কোনো শিশুকে বৈধ খেলনার কোনো বস্তু কিনে দেওয়া হয় তাহলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো বুঝমান শিশুকে যাকাতের নিয়তে বৈধ কোনো খেলার বস্তু কিংবা টাকা-পয়সার মালিক বানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯০, আদদুররুল মুখতার ২/৩৫৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৮২-২৯০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৬৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৫০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/১৯৫।

প্রশ্ন ৩০৬ : যাকাত গ্রহীতাকে যাকাত দেওয়ার সময় এ কথা জানানো জরুরি কি না যে, তাকে যাকাত দেওয়া হচ্ছে?

উত্তর : যাকাত আদায়কালে গ্রহীতাকে এ কথা বলে যাকাত দেওয়া জরুরি নয় যে, এটা যাকাতের মাল। বরং যাকাতের নির্দিষ্ট খাতে যাকাতের নিয়তে দান বা হেবা করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।– ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/১৯৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৬৪।

প্রশ্ন ৩০৭ : যদি কোনো মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিন গরীব হয় এবং একারণে তাদের দুজনকে বেতন ভাতার পরিবর্তে জাকাতের টাকা প্রদান করা হয় তাহলে জাকাত দাতাদের জাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : জাকাত আদায়ের জন্য শর্ত হলো, প্রকৃত হকদারকে বিনিময়হীন ও শর্তহীনভাবে মালিক বানিয়ে দেয়া। এভাবে হকদারকে বিনিময়হীনভাবে মালিক বানানো ব্যতীত জাকাত আদায় হবে না। আর ইমাম মুয়াজ্জিনের বেতন ভাতা যেহেতু তাদের শ্রমের বিনিময় তাই এখাতে জাকাত দিলে বিনিময়হীনভাবে মালিক বানানো হয় না। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনা মতে ইমাম মুয়াজ্জিনকে জাকাত প্রদান করা হলে জাকাত আদায় হবে না। তবে যদি মসজিদ কর্তৃপক্ষ বেতন ভাতা অন্য ফাণ্ড থেকে দেয় এবং দরিদ্র হওয়ার কারণে ইমাম মুয়াজ্জিনকে জাকাতের টাকাও প্রদান করে তাহলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে।–ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭০, বাদাইউসসানায়ে ২/১৪২, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৭১৪, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৪/২২২, ইমদাদুল আহকাম ৩/৪৬।

প্রশ্ন ৩০৮ : যদি কোনো ব্যক্তি তার সৎ মাকে যাকাতের টাকা প্রদান করে তাহলে তার যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : যাকাতের উপযুক্ত হলে সৎ মাকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। সুতরাং তাকে যাকাত দিলে আদায় হয়ে যাবে।– রদ্দুল মুহতার ৩/২৯৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/২১১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/২১৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১৯৩।

প্রশ্ন ৩০৯ : যদি কোনো ব্যক্তি যাকাতের টাকা দ্বারা কোনো মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড় ক্রয় করে দেয় তাহলে এর দ্বারা উক্ত যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : যাকাতের টাকা দিয়ে কাফনের কাপড় ক্রয় করে দিলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। আর মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।– রদ্দুল মুহতার ২/৩৪৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/২২৪।

প্রশ্ন ৩১০ : ভাইকে যাকাতের টাকা দিলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : গরিব ভাইকে যাকাতের টাকা দেওয়া জায়েয আছে; বরং এক্ষেত্রে অন্য গরিবকে দেওয়ার চেয়ে নিজের ভাইকে দেওয়া অধিক উত্তম।– রদ্দুল মুহতার ২/৩৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯০, আলবাহরুর রায়েক ২/৪২৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/২১২, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৯২।

প্রশ্ন ৩১১ : স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে কি না?

উত্তর : স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না এবং স্বামীও তার স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবে না।– বাদায়িউস সানায়ে' ২/১৪৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৮৯, ইমদাদুল আহকাম ২/৪৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৫৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৬৯।

প্রশ্ন ৩১২ : মা তার সন্তানকে যাকাত দিতে পারবে কি না?

উত্তর : মা তার সন্তানদের যাকাত দিতে পারবে না। সুতরাং যদি কোনো মা তার সন্তানকে যাকাত দেয় তবে তা আদায় হবে না।– আদদুররুল মুখতার ২/২৫৮, বাদায়িউস সানায়ে' ২/১৪৩, রদ্দুল মুহতার ২/৩৪৬, ইমদাদুল আহকাম ২/৪৯।

প্রশ্ন ৩১৩ : মসজিদের ইমাম-মুয়াযযিনকে যাকাত এবং সদকাতুল ফিতর প্রদান করা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদের ইমাম ও মুয়াযযিনকে বেতন হিসেবে সদকাতুল ফিতর ও যাকাতের টাকা-পয়সা দেওয়া যাবে না। দিলে যাকাত ও ফিতরা আদায় হবে না। তবে যদি তারা যাকাতের উপযুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে দেওয়া যাবে। কিন্তু এটাকে বেতন ভাতার মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।– রদ্দুল মুহতার ৩/২৯১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯০, ইমদাদুল আহকাম ৩/৪৬, ফাতাওয়া উসমানী ২/১৪৪, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৩/৩১০।

প্রশ্ন ৩১৪ : জনৈক ব্যক্তিকে নিসাব হতে কিছু পরিমাণ কম যাকাত দেওয়া হলো। কিন্তু সে যাকাত গ্রহণ করে অন্যকে দান করে দিল কিংবা নিজের এমন কোনো প্রয়োজনে ব্যয় করল যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। এমন ব্যক্তিকে কি আবার যাকাত দেওয়া যাবে?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তির নিকট দান করার পর প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে তাকে পুনরায় যাকাত দেওয়া যাবে। আর যদি সে যাকাতের টাকা দিয়ে এমন কিছু ক্রয় করে যা তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং এগুলোর মূল্য ও তার অন্যান্য অতিরিক্ত সম্পদ মিলিয়ে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে তাকে দ্বিতীয় বার যাকাত দেওয়া যাবে না। যদিও তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। আর যদি এই পরিমাণ সম্পদ না থাকে তাহলে আবার যাকাত দেওয়া যাবে।– রদ্দুল মুহতার ৩/২৮৪, আলবাহরুর রায়েক ২/৪১৯, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/২১৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১৮১।

প্রশ্ন ৩১৫ : অনেকে গাছের বাগান করে থাকে। কখনো কখনো বাগানের গাছগুলো এত বড়ো হয় যে, বিক্রি করলে তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হবে। সুতরাং এ বাগানের কারণে মালিকের উপর যাকাত ফরয হবে কি না? উল্লেখ্য, বাগান করার ক্ষেত্রে কারো নিয়ত থাকে যে, গাছ বড়ো হলে বিক্রি করবে। আবার কারো কোনো নিয়তই থাকে না।

উত্তর : গাছের বাগান যে উদ্দেশেই করুক না কেন তার উপর যাকাত ফরয হবে না। তবে বাগানের জমি উশরী বা খারাজী হলে তার উপর উশর বা খারাজ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে গাছ বিক্রি করার পর তার মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং তার উপর এক বছর অতিক্রম করে তাহলে ঐ টাকার উপর যাকাত ফরয হবে।– সূরা বাকারা; আয়াত ২৬৭, সহীহ বুখারী; হাদীস ১৪৮৩, বাদায়িউস সানায়ে ২/১৭৮, রদ্দুল মুহতার ৩/২১৪, ২৬৮, ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৫২, আলহিদায়া ১/১৮৪, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৩/৫৮৭।

প্রশ্ন ৩১৬ : বর্তমানে বিশ্বের প্রায় দেশে দেখা যায়, অধিকাংশ বিত্তবান ব্যক্তিরা নিজেদের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের নামে ব্যাংক একাউন্ট খুলে টাকা জমা রাখে, যেন বড়ো হয়ে ঐ টাকা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, জমাকৃত টাকা যদি নিসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে তাদের উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে কি না? আর ওয়াজিব হলে কার সম্পদ থেকে আদায় করবে? পিতা নিজের সম্পদ থেকে আদায় করবে না বাচ্চার সম্পদ থেকে?

উত্তর : ছেলে-মেয়েদের নামে খোলা একাউন্টে জমাকৃত টাকার মালিক তারা নিজেরাই। অতএব ঐ টাকা নিসাব পরিমাণ হলে তাদের উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। তবে তারা নাবালেগ হলে তাদের সম্পদ থেকে পিতার উপর সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। পিতা যদি আদায় না করে তাহলে তাদেরকে বালেগ হওয়ার পরে আদায় করতে হবে।– আদদুররুল মুখতার ৩/৩১২, আলবাহরুর রায়েক ২/৪৩৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯২, ফাতাওয়া খানিয়া ১/২২৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৭৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/৪১।

দান/হেবা

প্রশ্ন ৩১৭ : প্রতিবেশীকে হেবা করা মাল হেবাকারীর জন্য পুনরায় ফেরত নেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কোনো কিছু হেবা করার পর প্রতিবেশীর কাছ থেকে হেবাকৃত মাল ফেরত নিতে পারবে। তবে যদি কোনো বিনিময় নিয়ে হেবা করা হয় কিংবা ঐ প্রতিবেশী রেহেম সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় হয় তাহলে হেবাকৃত মাল ফেরত নেয়া যাবে না। হেবাকৃত মাল প্রতিবেশীর নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার পর ফেরত নিতে চাইলে তার সন্তুষ্টিতে নিতে হবে অথবা বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে নিতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, এভাবে ফেরত নেয়া জায়েয হলেও কাজটি মাকরূহ হওয়া থেকে মুক্ত নয়।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১৬২২, রদ্দুল মুহতার ৫/৬৯৮, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৪/৪৪৮, ৪৪৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/৩৮১।

প্রশ্ন ৩১৮ : যদি কোনো ব্যক্তি তার একমাত্র কন্যা সন্তানকে তার পূর্ণ সম্পত্তি অথবা আংশিক হেবা করে দেয় তাহলে হেবা জায়েয এবং কার্যকর হবে কি না? উল্লেখ্য, উক্ত ব্যক্তির অন্যান্য ওয়ারিস যেমন, ভাই-ভাতিজা বিদ্যমান রয়েছে।

উত্তর : কোনো ব্যক্তি যদি সুস্থাবস্থায় তার পূর্ণ অথবা আংশিক সম্পত্তি কোনো সন্তানকে হেবা করে দেয় এবং নিয়ম মাফিক তার দখলেও দিয়ে দেয় তাহলে উক্ত হেবা জায়েয এবং কার্যকর হবে। তবে কোনো ওয়ারিসকে শরঈ কারণ ব্যতিরেকে বঞ্চিত করা উদ্দেশ্য হলে এরূপ হেবাকারী গোনাহগার হবে। আর যদি হেবাকৃত সম্পদের উপর উক্ত সন্তানের দখল প্রতিষ্ঠা না হয় অথবা মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর হেবা করা হয় তাহলে উক্ত হেবা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ওসিয়ত বলে বিবেচিত হবে। তখন ঐ হেবা অন্য ওয়ারিসদের অনুমতি ছাড়া কার্যকর হবে না।– আদদুররুল মুখতার ৮/৪৯৩, ৫০২, ফাতাওয়া খানিয়া (ফাতাওয়া হিন্দিয়া সংশ্লিষ্ট) ৩/২৭৯, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৪/৪৬৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৩৯১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪০০।

প্রশ্ন ৩১৯ : আমার কোনো ছেলে নেই। এখন যদি মেয়েদের উপকারার্থে কিছু সম্পত্তি মেয়েদেরকে হেবা করে দেই তাহলে সেটা জায়েজ হবে কি না?

উত্তর : সন্তানদেরকে সম্পদ হেবা করা জায়েজ আছে। তবে এক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা উচিৎ। নিয়ত থাকতে হবে মেয়েদের সহায়তা করা; অন্য কোনো ওয়ারিশকে বঞ্চিত করা নয়। তবে এক্ষেত্রে আপনার জীবদ্দশায় উক্ত সম্পদের দখল স্বত্ব মেয়েদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে।– সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৬২৩, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ২/৪৬, আদদুররুল মুখতার ৫/৫০১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৩/৩৫০।

বিবাহ

প্রশ্ন ৩২০ : কুফু সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : কুফু হলো বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রে কনে ও তার অভিভাবক পক্ষের আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদা বিবেচনা করে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সমতা রক্ষা করা। বিবাহের সময় ভারসাম্য এই নীতি অরক্ষিত হলে দাম্পত্য জীবনে সৃষ্টি হয় নানা জটিলতা। তাই ইসলাম এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

এ বৈবাহিক সমতার মূল মানদণ্ড হলো, কনে এবং তার অভিভাবক পক্ষ। তারা যদি এ অসমতাকে কোনো কারণে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করে নেয় তবে সে বিবাহ সম্পন্ন হতে কোনো বাধা নেই। পক্ষান্তরে যদি কনের অভিভাবক বরপক্ষের এ অসমতাকে মেনে না নেয় তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। তবে এক্ষেত্রে বর এবং তার অভিভাবককে কেন্দ্র করে বৈবাহিক সমতা রক্ষা করা আবশ্যক নয়।

কুফু (বিবাহ সমতা) -এর বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

এক. বংশগত ভারসাম্য। বর পক্ষ যদি বংশীয়ভাবে নিম্নশ্রেণির হয় তবে এক্ষেত্রে বৈবাহিক সমতা লঙ্ঘিত হবে। বংশগত ব্যবধান যদি সামাজিকভাবে হেয় ও অসম্মানের বিষয় না হয় তবে সে ক্ষেত্রে বংশীয় বিষয়টি বিবাহ সমতা হিসেবে বিবেচিত হবে না।

আরবে যেহেতু বংশগত ব্যপারটি খুব বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় তাই সেখানে ব্যাপারটি বিবাহ সমতা হিসেবে গণ্য করা হবে। পক্ষান্তরে অনারবদের মাঝে সাধারণত বংশগত ব্যপারটিকে তেমন গুরুত্ববহ মনে করা হয় না তাই সেখানে এ বিষয়টিতে সমতা রক্ষা করা আবশ্যক নয়। তবে যেখানে বংশগত ব্যপারটির গুরুত্ব রয়েছে সেখানে বংশগত সমতা বিধান প্রযোজ্য হবে।

দুই. পিতৃপুরুষের মুসলিম হওয়ার দিক দিয়ে সমতা বিধান।

তিন. স্বাধীনতাজনিত ভারসাম্য। স্বাধীন কনের জন্য ছেলে পক্ষকে স্বাধীন হতে হবে। বৈবাহিক ক্ষেত্রে দাস পুরুষ স্বাধীন নারীর সমকক্ষ হতে পারে না। বিষয়টি যদিও বর্তমান বিশ্বে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ এখন আর দাস প্রথা বিদ্যমান নেই, কিন্তু তার শরঈ বিধান এখনো অটুট আছে।

চার. ধার্মিকতা বিষয়ক ভারসাম্য। একজন ধার্মিক নারীর বিপরীতে একজন ধর্ম উদাসীন পুরুষ আসতে পারে না। বিবাহের ক্ষেত্রে একজন ধার্মিক পুরুষই কেবল একজন ধার্মিক নারীর সমতুল্য হতে পারে।

পাঁচ. ঐশ্বর্যগত ভারসাম্য। এক্ষেত্রে বর পক্ষকে কনের মহর আদায়সহ খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় সক্ষম হতে হবে।

ছয়. পেশাগত ভারসাম্য। পৃথিবীতে বহু রকমের পেশা রয়েছে। এ পেশার মাঝে বহু শ্রেণিভেদ রয়েছে। পেশাগত দিক দিয়ে বর পক্ষকে কনে পক্ষের সমপর্যায়ের হতে হবে। একজন সুইপার পেশায় নিয়োজিত ব্যাক্তি একজন সাধারণ কৃষকের সমকক্ষ হতে পারে না।

ফলকথা, কোনো মেয়ে যদি উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা না করে এবং তার অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে তার এ বিবাহ শুদ্ধ হবে না।– সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১৯৬৮, সুনানে দারা কুতনী; হাদীস ১৯৮, সুনানে বাইহাকী; হাদীস ১৪১৩০, হিদায়া ২/৩২০-৩২১, রদ্দুল মুহতার ৪/১৫৭, ২০৭, ২০৯, কিতাবুল ফিকহি আলা মাযাহিবিল আরবা'আ ৪/৫৮, ৬০, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৩৫৬, ইমদাদুল আহকাম ৩/২৮৮, ৩১৩।

প্রশ্ন ৩২১ : কোনো মহিলা যদি তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে এ বিবাহ বিশুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে বিবাহ সহীহ হবে না। ইদ্দত পালন শেষেই কেবল বিবাহ শুদ্ধ হতে পারে।– সূরা বাকারা; আয়াত ২৩৫, সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৩১৮, বাদায়িউস সানায়ে' ৩/৩২৩, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা

৩৯/৩৪৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৮০, রদ্দুল মুহতার ৩/৫১৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৬/৩১৮।

প্রশ্ন ৩২২ : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে হিলা বিবাহের হুকুম কি?

উত্তর : ইসলামে হিলা বিবাহ বলতে কোনো বিবাহ নেই। তিন তালাকপ্রাপ্তা কোনো নারী যদি তার পূর্বের স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তবে তার সুযোগ নেই। তবে যদি কোনো রকম শর্ত, চুক্তি, পারিশ্রমিক ও সামাজিক প্রথা ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পরবর্তীতে এ পুরুষটি মৃত্যুবরণ করে কিংবা কোনো কারণে সে তালাক দিয়ে দেয় তবে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত মহিলা তার পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্তমান সমাজে হিলা বিবাহ নামে যে বিবাহ প্রচলিত তা শরীয়তসম্মত নয়। কারণ এ বিবাহের ভিতরে ডিভোর্স দিয়ে দেওয়াটা একটা সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। সামাজিক রীতিতে ঐ লোকটির দু একদিন পর ডিভোর্স না দিয়ে কোনো উপায় নেই। আর ইসলামী আইনের স্বতঃসিদ্ধ একটি রীতি হলো, যে কাজ সামাজিক কিংবা দেশীয় রীতিতে পরিণত হয়ে যায় তা চুক্তি এবং শর্তযুক্ত কাজের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হয়। সুতরাং প্রচলিত এ হিলা বিবাহ শরঈ নীতির আওতায় পড়ে না। যদিও এ ধরনের বিবাহোত্তর তালাক হয়ে গেলে এ মহিলা তার পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।– সূরা বাকারা; আয়াত ২৩০, আদদুররুল মুখতার ৫/৪৭-৪৮, তাবয়ীনুল হাকায়েক ২/২৫৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৯/৩১৩।

প্রশ্ন ৩২৩ : জিন এবং মানুষের মাঝে বিবাহ জায়েয আছে কি না?

উত্তর : জিন ও মানুষের মাঝে বিবাহ জায়েয নেই।– সূরা নাহল; আয়াত ৭২, আদদুররুল মুখতার ৪/৬১, রদ্দুল মুহতার ৪/৬১, ফাতাওয়া সিরাজিয়্যা; পৃষ্ঠা ৩৭, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলাদ দুর ২/৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৩০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৩৪৫, ফাতাওয়া উসমানী ১/৩০৩।

প্রশ্ন ৩২৪ : দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করার হুকুম কী?

উত্তর : একত্রে দুই বোনকে বিবাহ করা কোনো ক্রমেই জায়েয নেই। কুরআন সুন্নাহর আলোকে এটা সম্পূর্ণ হারাম।– সূরা নিসা; আয়াত ২৩, সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৩৩, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১১২৯, আলহিদায়া ২/৩০৮, আলবিনায়া ৬/৩৭, ফাতহুল কাদীর ৩/২০২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৩৩৬।

প্রশ্ন ৩২৫ : বিবাহের সর্বনিম্ন দেনমহরের কোনো পরিমাণ আছে কি না? থাকলে কত?

উত্তর : বিবাহের সর্বনিম্ন মহরের পরিমাণ নির্ধারিত আছে। এর কমে মহর নির্ধারণ সহীহ হবে না। মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো, দশ দিরহাম। রৌপ্যের হিসেবে যার পরিমাণ ৩১.৫ মাশা। সুতরাং রৌপ্যের মূল্য হিসাবে ৩১.৫ মাশার যে মূল্য আসে সে পরিমাণ টাকাই মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ সাব্যস্ত হবে।– সুনানে দারা কুতনী

(মাকতাবায়ে শামেলা সংস্করণ) ২/২১১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩০৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৪/১৬২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৩৫৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৭/২৬৭, ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ২/৯৭।

প্রশ্ন ৩২৬ : নিজের দুধমাতার ননদ তথা দুধফুফুকে বিবাহ করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : দুধফুফু তথা দুধমাতার স্বামীর আপন বোনকে বিবাহ করা জায়েয নেই।– সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৪৪৫, রদ্দুল মুহতার ৪/১০০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৪৩, খাইরুল ফাতাওয়া ৪/৫০২।

প্রশ্ন ৩২৭ : জনৈক ব্যক্তির যিনার মাধ্যমে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে সে স্বীকারও করে যে, এ আমার ঔরসজাত সন্তান। জারজ সন্তানের বয়স এখন ২৫ বছর। এ সন্তান এখন ঐ যিনাকারীর পরিবারকে বলছে, আমার বিবাহ শাদীর ব্যবস্থা করে দিন। প্রশ্ন হলো,

(ক) এ জারজ সন্তানের নসব (জন্মসূত্র) ঐ যিনাকারী ব্যক্তি থেকে গণ্য হবে কি না?

(খ) এই ছেলে ঐ ব্যক্তি থেকে মীরাস পাবে কি না?

(গ) ঐ ছেলের বিবাহ শাদীর দায়-দায়িত্ব ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে কি না?

উত্তর : (ক) প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে এ জারজ সন্তানের নসব (জন্মসূত্র) ঐ যিনাকারী ব্যক্তি থেকে গণ্য হবে না।

(খ) এ সন্তান ঐ ব্যক্তি থেকে মীরাস পাবে না।

(গ) এ ছেলের বিবাহ শাদীর দায়-দায়িত্ব ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে না। উল্লেখ্য, ঐ ব্যভিচারিণী মহিলা যদি ব্যভিচার করার সময় অন্য কারো স্ত্রী থেকে থাকে তাহলে এ জারজ সন্তানের নসব মহিলার ঐ স্বামী থেকেই সাব্যস্ত হবে। আর ঐ সময় যদি ব্যভিচারিণী মহিলা অবিবাহিত হয়ে থাকে তাহলে এ সন্তানের নসব ঐ মহিলা থেকেই সাব্যস্ত হবে এবং তার থেকেই মীরাস পাবে।– সহীহ বুখারী; হাদীস ২০৫৩, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫০০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/১২৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৫২৩-৫২৪, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৫৬২।

প্রশ্ন ৩২৮ : আপন ভাগ্নির মেয়ে এবং আপন নানীর বোনকে বিবাহ করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লেখিত দু'জনের কাউকে বিবাহ করা জায়েয নেই।– সূরা নিসা; আয়াত ২৩, রদ্দুল মুহতার ৪/১০০, ১০৩, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৫৩০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৬/৪৩৬, ৪৩৭, ৪৫০, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৮/২১৮।

তালাক

প্রশ্ন ৩২৯ : যিহার কাকে বলে? এর দ্বারা তালাক পতিত হয়ে যায় কি না?

উত্তর : যিহার শব্দের আভিধানিক অর্থ, কোনো পুরুষ কর্তৃক তার স্ত্রীকে এ কথা বলা যে, তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের মতো। ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় যিহার বলা হয় দুগ্ধ ও রক্ত সম্পর্কীয় মাহরামের সাথে নিজের বিবাহিত স্ত্রীর সাদৃশ্য স্থাপন করা।

যিহারের দ্বারা তালাক পতিত হয় না। আর এই বাক্য বলার দ্বারা ইসলামী শরীয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীর সাথে পূর্ববৎ আচরণ করার অধিকারও তাকে দেওয়া হবে না। তবে সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীর সাথে থাকতে চায় তাহলে তাকে কাফ্ফারা আদায় করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কাফ্ফারা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না। কাফ্ফারা হলো, একজন দাস মুক্ত করা। যার এই সামর্থ্য নেই সে ধারাবাহিক দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে।– সূরা মুজাদালাহ; আয়াত ৩০৪, আলহিদায়া ২/৪০৯, ৪১০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৫১৮।

প্রশ্ন ৩৩০ : স্বামী স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি আমাকে তোমাদের বাড়িতে যেতে বলো তবে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে না। এরপর স্ত্রী স্বামীকে তাদের বাড়িতে যেতে বলেছে এবং স্বামীও গিয়েছে। এঘটনার পর ছয় মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন ইসলামী শরীয়া মতে এদম্পতির বিধান কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে স্বামীর বক্তব্য 'তোমার সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে না।' এর দ্বারা যদি তালাক উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী যখন স্বামীকে তাদের বাড়ি যেতে বলেছে তখন স্ত্রীর উপর একটি বায়েন তালাক পতিত হয়ে গেছে। এরপর তাদের জন্য আবশ্যক ছিল, নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর সংসার করা। কিন্তু তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে ঘর সংসার করা তাদের জন্য হারাম হয়েছে। এর জন্য তাদেরকে কায়মনো বাক্যে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে। এখন তাদের জন্য করণীয় হলো, নতুন করে বিবহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর সংসার করা।–আলহিদায়া ২/৩৬৪, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা২৯/৩৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৪১৭, ইমদাদুল আহকাম ৪/১৮, ফাতাওয়া দারুল উলুম ১০/৯১

প্রশ্ন ৩৩১ : স্ত্রীর বোনের সাথে যেনা করলে স্ত্রী কি হারাম হয়ে যাবে?

উত্তর : স্ত্রীর বোনের সাথে যেনা করলে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয় না এবং উক্ত স্ত্রী স্বামীর জন্য হারামও হয় না। তবে যেনার পর স্ত্রীর বোনের এক হায়েয অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস জায়েয নেই। এ সময় স্ত্রী থেকে পৃথক থাকা ওয়াজিব।

যদি স্ত্রীর বোন যিনার দ্বারা গর্ভবতী হয়ে যায় তাহলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস থেকে বিরত থাকবে।– রদ্দুল মুহতার ৪/১০৯, ফাতাওয়া উসমানী ২/২৫২-২৫৩, আযীযুল ফাতাওয়া; পৃষ্ঠা ৪৬২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৪২২।

প্রশ্ন ৩৩২ : কেউ যদি কারো থেকে জোরপূর্বক এই মর্মে তালাক নিয়ে নেয় যে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম তাহলে কি তালাক পতিত হবে?

উত্তর : কারো থেকে জোরপূর্বক তালাকনামা লিখিয়ে নিলে তালাক পতিত হবে না। তবে যদি মুখেও তালাক দেয় তাহলে পতিত হবে।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৭৯, ফাতাওয়া খানিয়া ১/৪৭২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৮/১৯৪, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৯/১৪৮।

প্রশ্ন ৩৩৩ : জনৈক ব্যক্তি গত ২৩/০৬/২০১১ইং তারিখ রাতে প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতা (জ্বর, ঠাণ্ডা ও মাথাব্যাথা) নিয়ে কনের বাসায় ২ লক্ষ টাকা মহর ধার্য করে বিবাহ করে। তন্মধ্যে ৪০ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর তার শারীরিক অসুস্থতা আরো বেড়ে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে তার অভিভাবক তাকে নিজ বাসায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে কনের অভিভাবক তার অসুস্থতা আরো বেড়ে যেতে পারে বলে রেখে দেয়। এক পর্যায়ে অসুস্থতা আরো বেড়ে যাওয়ায় সে আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। যার ফলে মেয়ের সাথে তার কোনো ধরনের শারীরিক সম্পর্ক বা খালাওয়াতে সহীহা হয় নি। পরদিন ছুটি শেষ হওয়ায় এবং ফ্লাইট থাকায় সে বিদেশ চলে যায়। অদ্যাবধি সে বিদেশে আছে। অতঃপর প্রায় এক বছর পর কনে এবং কনের অভিভাবকদের সমস্যা থাকায় তালাকে তাফবীযের মাধ্যমে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এখন প্রশ্ন হলো, কনে বাকী মহর পাবে কি না? যদি পায় তাহলে কতটুকু পাবে?

উত্তর : ইসলামী শরী'আ মতে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর কোনো ধরনের শারিরীক সম্পর্ক কিংবা একান্তে নির্জনবাস হওয়ার পূর্বে যদি তালাক সংঘটিত হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী নির্ধারিত মহরের অর্ধেকের হকদার হবে।

প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোনো ধরনের শারীরিক সম্পর্ক বা নির্জনবাস হয়নি তাই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার স্বামী থেকে অর্ধেক মহরের দাবি করতে পারবে। আর বিবাহের সময় মহর ধার্য করা হয়েছিল দুই লক্ষ টাকা। পরিশোধ করা হয়েছে চল্লিশ হাজার টাকা। সুতরাং এখন মহিলা অবশিষ্ট ষাট হাজার টাকা মহর দাবি করতে পারবে এবং এটা তার প্রাপ্য। ইসলামী আইন অনুযায়ী এর থেকে বেশি সে দাবি করতে পারবে না।– সূরা বাকারা; আয়াত ২৩৭, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ৩৯/১৭৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৮/২৪৮, ২৪৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৭/৩১৪।

প্রশ্ন ৩৩৪ : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে চিঠিতে লিখল, যদি তুমি তোমার মামা বাড়ি যাও তবে তুমি তালাক। চিঠি লেখার পর এবং স্ত্রীর কাছে পৌঁছার আগে স্ত্রী তার মামা বাড়ি যায়। এখন তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৭৮, রদ্দুল মুহতার ৪/৪৫৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৪/৫২৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৯/১৬৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৮/৩১০, খাইরুল ফাতাওয়া ৫/১১৩।

প্রশ্ন ৩৩৫ : স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে তুমি আমার বাবার মতো তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে তুমি আমার বাবার মতো তবে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের মাঝে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না। তবে এ ধরনের তুলনামূলক বাক্য ব্যবহার করা মাকরূহ হবে। তাই এ ধরনের বাক্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিত।– ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৫/১৬৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৯/৩৬৪, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৫২০।

প্রশ্ন ৩৩৬ : আমার এক বন্ধু তার স্ত্রীকে বলেছে যে, আমার বাড়ির সীমানার বাহিরে গেলে তালাক। কিন্তু তার নিয়ত ছিল, স্ত্রীর বাবার বাড়ি আর স্কুলে যেতে পারবে না। এরপর তার স্ত্রী স্বামীর বাড়ির পাশের বাড়িতে গিয়েছিল। তখন স্ত্রীর বাবা তালাক হয়ে গেছে ভেবে তার মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। উল্লেখ্য, স্বামী বলেছেন, আমার বাড়ির সীমানার বাহিরে গেলে তালাক। কিন্তু বাড়ি ছেলের নয়, ছেলের বাবার। আর উক্ত স্বামীর তালাক শব্দ দ্বারা তিন তালাক উদ্দেশ্য ছিল। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত তালাক পতিত হয়েছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা মতে তার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়ে গেছে। কেননা সে স্পষ্টভাবে বাড়ির সীমানা উল্লেখ করে বলেছে, 'যদি সীমানার বাহিরে যাও তবে তালাক'। এখানে সীমানা বলে বাবার বাড়ি বা স্কুল উদ্দেশ্য নেয়া গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং তার স্ত্রী বাড়ির সীমানা থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তালাক হয়ে গেছে। আর যেহেতু তার উদ্দেশ্যই ছিল তিন তালাক তাই তিন তালাক পতিত হয়েছে। বর্তমান সমাজে পিতার বাড়িকে সন্তানেরা নিজের বাড়ি বলেই মনে করে থাকে। তাই যখন সে পিতার বাড়িকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছে তখন তার সম্পৃক্ত করাটা ওরফ বা প্রচলনের কারণে সঠিক বলেই বিবেচিত হবে।– আলহিদায়া ২/৩৫৯, ৩৬০, ৩৮৫, বাদায়িউস সানায়ে' ৩/৬৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪৪১, ফাতহুল কাদীর ৪/১০৪, রদ্দুল মুহতার ৫/৫২৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৪৩১, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১০/৬২।

প্রশ্ন ৩৩৭ : যদি কেউ তার স্ত্রীকে বোন বলে অথবা কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে ভাই বলে তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বোন বললে অথবা কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে ভাই বললে এর দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ জাতীয় কোনো কিছুই সংঘটিত হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন সম্বোধন করা মাকরূহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এ ধরনের সম্বোধনকে অপছন্দ করেছেন।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস

২২১০, রদ্দুল মুহতার ৫/১৩১, ফাতাওয়া উসমানী ২/৩৬৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৫১৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১০/২০৫, ২১১।

প্রশ্ন ৩৩৮ : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় সে তার স্ত্রীকে দেখতে পারবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাকে বায়েন প্রদান করে থাকে তাহলে সে ইদ্দত চলাকালীন তার সাবেক স্ত্রীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবে না। পুনরায় বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ জায়েয নেই। আর যদি তালাকে রজঈ প্রদান করে থাকে তাহলে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবে। তবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা না থাকলে তার ঘরে প্রবেশের আগে তাকে সতর্ক করে প্রবেশ করা উচিত।– রদ্দুল মুহতার ৫/২২৬, বাদায়িউস সানায়ে' ৩/২৮৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৩৫, আলহিদায়া ২/৪২৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৮/৪১৭।

প্রশ্ন ৩৩৯ : জনৈক ব্যক্তি তিন তালাক দিয়েছে এবং ইদ্দত পালন এবং নতুন বিবাহ না করে তার সাথে সহবাস শুরু করে দিয়েছে। এখন যদি সে মহিলা অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তবে কি তার জন্য নতুন করে ইদ্দত পালন করতে হবে?

উত্তর : তিন তালাক প্রদানের পর স্বামীর জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করা ব্যভিচার এবং হারাম হয়েছে। এ মুহূর্তে সে মহিলা যদি অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলে তালাক দেওয়ার পর থেকে ইদ্দতকাল গণনা করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। ইদ্দতের মধ্যকার যিনা-ব্যভিচার দ্বারা ইদ্দতের মাঝে কোনো রকম প্রভাব পড়ে না।– রদ্দুল মুহতার ৫/২০০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৩২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/৫৩২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৮/৪১৭।

প্রশ্ন ৩৪০ : যদি কোনো ব্যক্তি তার সৎ মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তার সৎ মা কি তার পিতার জন্য হালাল থাকবে না কি হারাম হয়ে যাবে?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি তার সৎ মায়ের সাথে যেনা করে তাহলে তার সৎ মা তার পিতার জন্য চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু যেনা করার দ্বারাই বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না। বরং তার পিতার জন্য আবশ্যক হলো, অতি দ্রুত উক্ত মহিলাকে তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া।– সূরা নিসা; আয়াত ২২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৪, রদ্দুল মুহতার ৩/৩২, আলবাহরুর রায়েক ৩/১৭৯, আদদুররুল মুখতার ৩/৩৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৬/৫০৯।

পর্দা

প্রশ্ন ৩৪১ : কোনো মহিলা তার সৎ মেয়ের জামাইয়ের সাথে দেখা দিতে পারবে কি না?

উত্তর : কোনো মহিলার জন্য তার সৎ মেয়ের জামাইয়ের সাথে দেখা দেওয়া বৈধ নয়।– সূরা নূর; আয়াত ৩১, সূরা নিসা; আয়াত ২৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/৬৬, ফাতওয়া মাহমূদিয়া ১৬/৩৯১, কিফায়াতুল মুফতী ৫/৩৬।

প্রশ্ন ৩৪২ : যেসব নারীরা বেগানা পুরুষদের সাথে উঠা-বসা করে তাদের সাথে কি পর্দাকারিনী নারীর পর্দা করতে হবে?

উত্তর : যেসব বেপর্দা নারী পরপুরুষের সাথে উঠা-বসা করে তাদের সাথে পর্দাকারিনী নারীদের পর্দা করা উচিত।– সূরা নূর; আয়াত ৩১, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৭১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৯৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪৬৮।

প্রশ্ন ৩৪৩ : চাচি ও মামির সাথে পর্দা করা জরুরি কি না?

উত্তর : চাচি ও মামির সাথে পর্দা করা জরুরি, তাদের সাথে দেখা দেওয়া জায়েয নেই।– সূরা আহযাব; আয়াত ৫৩, মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ ৬/২৫৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/১০৩।

প্রশ্ন ৩৪৪ : যদি মাহরামের থেকে ফেতনার আশঙ্কা হয় তাহলে তার সাথেও কি পর্দা করতে হবে?

উত্তর : ফেতনার আশঙ্কা হলে মাহরাম থেকেও পর্দা করতে হবে এবং তার সাথে নির্জনতা থেকে দূরে থাকতে হবে।– ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/৯৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৮, আলবাহরুর রায়েক ৯/৩৫৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/৯৯।

প্রশ্ন ৩৪৫ : মহিলাদের জন্য মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা জরুরি কি না এবং মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত কি না?

উত্তর : মহিলাদের মুখমণ্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত। তাই তা ঢেকে রাখা জরুরি। নামাযে মুখমণ্ডল খোলা রাখার অনুমতি থাকলেও পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল খোলা রাখা জায়েয নেই।– সূরা আহযাব; আয়াত ৫৯১, তাফসীরে ইবনে কাসীর (মাকতাবাতুশ শামেলা সংস্করণ) ৩/৮২৪, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৩৫৭৯, আদদুররুল মুখতার ১/৭৯, রদ্দুল মুহতার ১/৭৯, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলাদ দুর ১/১৯১, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৫১০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/৭৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৯/২২৯।

প্রশ্ন ৩৪৬ : যদি কোথাও সম্পূর্ণ শরঈ পর্দার সাথে শুধু মহিলাদেরকে একত্রিত করে পর্দার আড়াল থেকে কুরআন হাদীসের কথা শুনানো হয় এবং ওয়াজ নসীহত করা হয় তাহলে তা জায়েজ হবে কি না?

উত্তর : মহিলাদেরকে কোনো স্থানে শরঈ পর্দার সাথে একত্রিত করে পর্দার আড়াল থেকে তালিম তরবিয়ত ও ওয়াজ নসীহত করা জায়েজ আছে। শুধু জায়েজই নয়; বর্তমান সময়ে এরূপ করা জরুরী ও বটে। তবে শর্ত হলো, সেখানে কোনো ধরনের ফেতনার আশঙ্কা না থাকতে হবে। উল্লেখ্য, কোথাও এধরনের মজলিসের আয়োজন

করতে হলে সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞ হক্কানী আলেমকে অবগত করিয়ে মাসয়ালা জেনে নিবে।– সহীহ বুখারী হাদীস নং ১০১, ফাতহুল বারী, ১/২৪৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩/১৬২।

কুরবানী আকিকা

প্রশ্ন ৩৪৭ : কুরবানীর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং এর বিধান কি দলীলসহ জানতে আগ্রহী।

উত্তর : কুরবানীর আভিধানিক অর্থ: কুরবান এটি আরবী ভাষার মূলক্রিয়া। অর্থ সান্নিধ্য হওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া। শব্দটি আরবী ভাষায় বিশেষ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। তখন এর অর্থ হয়, এমন বিষয় যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়, রাষ্ট্র প্রধানের সহচর, বিশেষ লোক। আরবী কুরবান শব্দের অন্তে ফারসী 'ইয়া' বর্ণ যুক্ত হয়ে সম্বন্ধ বিশেষণ হয়েছে। অর্থ জবাই, ঈদুল আজহার পশু, আল্লাহর রাস্তায় জবাই করা হালাল পশু। আরবী ভাষায় এর প্রতিশব্দ হলো আলউযহিয়্যা। অর্থ কুরবানীর দিনে জবাইকৃত প্রাণী।

কুরবানীর পারিভাষিক অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে বিশেষ দিনে বিশেষ প্রাণী জবাই করা।

বিধান : সামর্থবান ব্যক্তির উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির সাধ্য রয়েছে; এতদসত্ত্বেও সে কুরবানী পালন করল না সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে কাছেও না আসে।– মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮২৫৬, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৪/২৪৪, আলমুহীত ফিললুগাহ ১/২৩৮, আলমু'জামুল ওয়াসিত ২/৭২৩, আলমুখাসসিস ফিললুগাহ ৮/৯৩।

প্রশ্ন ৩৪৮ : কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : জিলহজ মাসের **১০** তারিখ ফজর থেকে নিয়ে **১২** তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত কুরবানীর দিনগুলোতে যেসব মুসলিম, স্বাধীন, বুদ্ধিমান, সাবালক এবং মুকীম তথা স্থানীয় ব্যক্তির নিকট ৭.৫ তোলা (৮৭.৪৮ গ্রাম) স্বর্ণ অথবা ৫২.৫ তোলা (৬১২.৩৬ গ্রাম) রুপা অথবা সমপরিমাণ মূল্যের ব্যবসায়িক পণ্য বা তরল (নগদ) অর্থ থাকবে তাদের উপর কুরবানী করা আবশ্যক হবে। উল্লেখ্য, ব্যবসায়িক পণ্য এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমির মূল্য ও কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে।–আদদুররুল মুখতার ৯/৫৫২, ৫৫৮।

প্রশ্ন ৩৪৯ : কোন প্রজাতির পশু দ্বারা কুরবানী করা যায় এবং সেসব পশুর ক্ষেত্রে কি কি গুণাগুণ থাকা আবশ্যক।

উত্তর :

- বকরী, পাঠা, খাসী, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা, গাভী, ষাড়, বলদ, মহিষ, উট- এই শ্রেণীর গৃহপালিত জন্তু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয আছে।
- বকরী, খাসী, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা কুরবানীর ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে পূর্ণ এক বৎসর বয়সের হতে হবে। তবে ভেড়া, ভেড়ী ও দুম্বার বয়স যদি পূর্ণ এক বৎসর না হয়; কিন্তু মোটা তাজা ও স্বাস্থ্যবান হওয়ার কারণে এক বৎসর বয়সী ভেড়া, দুম্বার মত দেখা যায় তাহলে সে ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয আছে। তবে অন্তত ছয় মাস বয়সের অবশ্যই হতে হবে।
- কুরবানীর পশু ভাল ও হৃষ্ট পুষ্ট হওয়া উত্তম।
- কুরবানীর উদ্দেশে ক্রয়কৃত প্রাণীর মাঝে কুরবানী প্রতিবন্ধক দোষ ত্রুটি দেখা দিলে তদস্থলে আরেকটি ক্রয় করে কুরবানী করতে হবে। তবে কুরবানী দাতা দরিদ্র হলে তদ্দারাই কুরবানী করতে পারবে।
- বন্ধ্যা বা গর্ভবতী পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয আছে। তবে যদি জবাইর পর গর্ভে বাচ্চা পরিলক্ষিত হয় তাহলে তাও জবাই করে দিতে হবে। তবে বাচ্চা প্রসবের নিকটবর্তী হলে এরূপ পশু দ্বারা কুরবানী করা মাকরূহ।–আদদুররুল মুখতার মা'আ রদ্দিল মুহতার ৯/৪৬৫-৪৬৯, ৪৬৭, ৪৭১।

প্রশ্ন ৩৫০ : কোন ধরনের পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েজ নেই?

উত্তর : যেসব পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নেই-

১. যে প্রাণী চার পায়ে চলতে পারে না।
২. যে প্রাণীর দাঁত নেই এবং ঘাস খেতেও সক্ষম নয়।
৩. জন্মগতভাবে কর্ণহীন প্রাণী।
৪. মূল থেকে শিং উপড়ে যাওয়া প্রাণী।
৫. চোখের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি পরিমাণ দৃষ্টি শক্তিহীন প্রাণী।
৬. কান বা লেজের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি পরিমাণ কর্তিত প্রাণী।
৭. জবাইর স্থানে হেঁটে যেতে অক্ষম দুর্বল প্রাণী। –আদদুররুল মুখতার মা'আ রদ্দিল মুহতার ৯/৪৬৫-৪৬৯, ৪৬৭, ৪৭১।

প্রশ্ন ৩৫১ : কুরবানীর পশু জবাই সংক্রান্ত শরঈ বিধি বিধান জানতে চাই।

উত্তর :

১. নিজের কুরবানীর পশু নিজেই জবাই করা উত্তম। নিজে জবাই করতে না পারলে জবাইর সময় সামনে থাকা ভাল। মেয়ে মানুষ পর্দার অন্তরাল থেকে কুরবানীর দৃশ্য দেখবে। পর্দা বিধানের ব্যাঘাত ঘটাবে না।

২. কুরবানীর পশুকে মাটিতে শুইয়ে কেবলামুখী করে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা উত্তম-

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ বলে জবাই করবে। কেউ দু'আ পড়তে সক্ষম না হলে শুধু 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করলেও যথেষ্ট হবে। অতঃপর এই দু'আটি পাঠ করা উত্তম : اللهم تقبله منى كما تقبلت من حبيبك مُحَمَّد وخليلك ابراهيم عليهما الصلاة والسلام

জবাইকারী যদি সংশ্লিষ্ট পশুর কুরবানী দাতা না হয় তাহলে منى এর স্থলে منه পড়বে। আর কুরবানী দাতা একাধিক হলে منى এর স্থলে منا বা منه এর স্থলে منهم পড়বে।

৩. কুরবানী দাতাদের নাম মুখে উচ্চারণ করা বা কাগজে লিখে পাঠ করা জরুরী নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা জানেন এটা কার কুরবানী। সে অনুযায়ী সে কুরবানী গৃহীত হবে।

৪. কুরবানীর পশু রাতের বেলাও জবাই করা জায়েয আছে। তবে উত্তম নয়।

৫. ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয নয়। তবে যেখানে জুমু'আ ও ঈদের নামায জায়েয নেই সেখানে সুবহে সাদিকের পর থেকেই কুরবানী করা জায়েয আছে।– সুনানে আবু দাউদ হাদীস, নং ২৭৯৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৫, মাজমাউল আনহুর ৪/১৬৯, ফাতাওয়া রহিমিয়া ১০/২৮, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৬/৩৪১,৩৪৪।

প্রশ্ন ৩৫২ : অংশিদারীর ভিত্তিতে কুরবানী করার ক্ষেত্রে শরয়ী নীতিমালা কি বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর :

১. বকরী, খাসী, পাঠা, ভেড়া, ভেড়ী, ও দুম্বার ক্ষেত্রে একজনের বেশি শরীক হয়ে কুরবানী করা জায়েয নেই। এসব প্রাণী শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির নামেই কুরবানী হতে পারে।

২. গরু, মহিষ ও উটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হতে পারে। সাতজন হওয়া আবশ্যক কিছু নয়। বরং এক থেকে সাতজন পর্যন্ত এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে কারো অংশ এক সপ্তমাংশ থেকে কম হতে পারবে না।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা, তাবিয়ী এবং বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গসহ অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের নামে কুরবানী করা করা জায়েয আছে।

৪. যদি কোনো ব্যক্তি ন্যায় নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে কুরবানী না করে; বরং গোস্তাহার বা লোক দেখানোর উদ্দেশে কুরবানী পালন

করে বা তার যাবতীয় উপার্জন কিংবা অধিকাংশ উপার্জন যদি অবৈধ হয় এবং তাকে অংশীদার বানিয়ে পশু কুরবানী করা হয় তাহলে সকল অংশীদারদের কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে।–ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০৪, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৬/৩০৮, ফাতাওয়া হক্কানিয়া ৬/৪৮১।

প্রশ্ন ৩৫৩ : কুরবানীর গোস্ত সম্বন্ধে শরয়ী বিধান কি? জানতে চাই।

উত্তর :

- অংশীদারগণ একান্নভুক্ত পরিবার হলে গোস্ত বণ্টনের প্রয়োজন নেই। অন্যথায় গোস্ত বণ্টন করতে হবে।
- অংশীদারদের মাঝে গোস্ত বণ্টনের ক্ষেত্রে অনুমান করে বণ্টন করবে না; বরং দাড়িপাল্লা, বাটখারা জাতীয় পরিমাপক দিয়ে মেপে বণ্টন করতে হবে। নতুবা অংশের ভিতরে কমবেশ হয়ে গেলে গুনাহগার হতে হবে। অবশ্য কোনো অংশীদার সখ বশত মাথা, পায়া বা বিশেষ কোনো অংশ গ্রহণ করলে এর পরিবর্তে তার ভাগে গোস্তের পরিমাণ কিছু কম হলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।
- অংশীদারগণ যদি সম্পূর্ণ গোস্ত দান করে দিতে চায় বা সম্পূর্ণটা রান্না করে দান করতে চায় বা খাওয়াতে চায় তাহলে আলাদা করে বণ্টনের প্রয়োজন নেই।
- কুরবানীর গোস্ত নিজে খাওয়া, পরিবারবর্গকে খাওয়ানো, আত্মীয় স্বজনকে দেয়া এবং গরীব-মিসকীনকে দান করা সবই জায়েয আছে। তবে উত্তম পদ্ধতি হলো গোস্ত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজেদের জন্য রাখা, এক ভাগ আত্মীয় স্বজনকে দেয়া এবং এক ভাগ গরীব মিসকীনকে দান করা।
- মান্নতকৃত কুরবানীর গোস্ত নিজেরা এবং বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ খেতে পারবে না। পুরোটাই গরীব-মিসকীনদেরকে দান করে দিতে হবে।
- মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে কুরবানীর জন্য ওয়াসিয়ত করে গিয়ে থাকে তবে সেই কুরবানীর গোস্তও মান্নতের গোস্তের ন্যায় পুরোটা সদকা করে দিতে হবে।
- কুরবানীর গোস্ত বা পশুর বিশেষ কোনো অংশ পারিশ্রমিকরূপে প্রদান করা জায়েয নেই।
- কুরবানীর গোস্ত শুকিয়ে কিংবা ফ্রিজে রেখে দীর্ঘ দিন আহার করাতে কোনো অসুবিধা নেই।–রদদুল মুহতার ৯/৩৮৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৫/৫৭২, ফাতাওয়া হক্কানিয়া ৬/৪৭৪, ৪৭৭, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৬/৩৫৬, ৩৯০, ৩৯১, ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/৪০, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৪/১৩৩,১৩৪।

প্রশ্ন ৩৫৪ : কুরবানীর পশুর চামড়া সম্বন্ধে শরয়ী বিধিমালা কি জানতে চাই।

উত্তর :

১. কুরবানীর পশুর চামড়া শুকিয়ে বা প্রক্রিয়াজাত করে নিজেও ব্যবহার করা যায় এবং অন্যদেরকে হাদিয়া হিসেবে ও দেয়া যায়।

২. কুরবানীর চামড়া সদকা করা যায়। তবে চামড়া বিক্রি করে দিলে তার মূল্য নিজের জন্য ব্যবহারের অবকাশ নেই; দান করে দেয়া আবশ্যক। এবং প্রদত্ত ঐ মূল্যটাই দান করতে হবে। চামড়া বিক্রিত নির্দিষ্ট টাকা নিজে ব্যয় করে অন্য টাকা দান করলে সদকা আদায় হবে বটে, তবে অন্যায় হবে।

৩. কুরবানীর চামড়ার মূল্য মসজিদ মাদরাসার নির্মাণ কাজে বা পারিশ্রমিক বাবদ ব্যয় করা জায়েয নেই। গরীব মিসকীনকে দান করে দিতে হবে।

৪. তবে কোনো মাদরাসায় যদি লিল্লাহ বোর্ডিং এর ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেখানেও দান করা যেতে পারে। আর যেহেতু মাদরাসার লিল্লাহ খাতে দানকৃত অর্থ কুরআন হাদীস অধ্যয়নরত দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পেছনে ব্যয় হবে তাই এক্ষেত্রে দানের সওয়াব তুলনামূলক বেশি লাভ হবে।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৬/৩৬০,৩৬২,৩৭৪,৩৯০, কিফায়াতুল মুফতী ৮/২১৯, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৪/১৩৬।

প্রশ্ন ৩৫৫ : কোনো কারণে কিংবা কোনো কারণ ছাড়া যদি কুরবানীর পশুর লোম কাটা হয় তবে সে লোম কি নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবে?

উত্তর : জবাই করার পূর্বে কুরবানীর পশুর শরীর থেকে পশম কাটা মাকরূহ। কেউ যদি জবাই করার পূর্বে পশম কাটে তাহলে উক্ত পশম সদকা করে দিবে। নিজে ব্যবহার করবে না। তবে জবাই করার পর পশম কাটা জায়েয আছে এবং তা সে নিজেও ব্যবহার করতে পারবে।– আদদুররুল মুখতার ৬/৩২৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪৩৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/২৯৫।

প্রশ্ন ৩৫৬ : কুরবানীর গরুর সাত ভাগের এক ভাগে যদি তিন/চারজন এমন ব্যক্তি মিলে অংশগ্রহণ করে যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় তাহলে কুরবানী সহীহ হবে কি না?

উত্তর : কুরবানীর গরুতে কোনো শরীকের অংশ যদি এক-সপ্তমাংশের চেয়ে কম হয় তাহলে সহীহ হয় না। সুতরাং কুরবানীর গরুতে সাত ভাগের এক ভাগে তিন/চার জন শরীক হলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না।– সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৩১৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০৪, রদ্দুল মুহতার ৪/৪৫৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/৪৬৯, ইমদাদুল আহকাম ৪/২৫৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫০৭, কিফায়াতুল মুফতী ৮/১৮৭।

প্রশ্ন ৩৫৭ : যিলহজ মাসের ১২ তারিখ দিবাগত রাত্রে কুরবানী করা যাবে কি না?

উত্তর : যিলহজ মাসের ১২ তারিখ দিবাগত রাত্রে কুরবানী করা যাবে না। – সহীহ বুখারী; হাদীস ৯৫৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৯৬১, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ২৮০০, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১৫০৯, সুনানে নাসাঈ; হাদীস ১৫৬৩, ই'লাউস সুনান ১৭/২৩০, ২৩৫, কিতাবুল আসার ২/৭৫৯, কিতাবুল মাবসূত ৬/২০০৫, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ৫/৯৩, বাদায়িউস সানায়ে' ৪/১৯৮।

প্রশ্ন ৩৫৮ : কুরবানীর শেষ সময় কোন পর্যন্ত?

উত্তর : কুরবানীর শেষ সময় হলো, যিলহজ মাসের ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত।– সহীহ বুখারী; হাদীস ৯৫৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৯৬১, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ২৮০০, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১৫০৯, সুনানে নাসাঈ; হাদীস ১৫৬৩, ই'লাউস সুনান ১৭/২৩০, ২৩৫, কিতাবুল আসার ২/৭৫৯, কিতাবুল মাবসূত ৬/২০০৫, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ৫/৯৩, বাদায়িউস সানায়ে' ৪/১৯৮।

প্রশ্ন ৩৫৯ : এক ব্যক্তি একটি গাভী কুরবানীর জন্য মানত করে। কিন্তু ঈদের কিছুদিন আগে গাভীটি বাচ্চা প্রসব করার ফলে সে তখন আর কুরবানী করে নি। এখন সে বাছুরটি রেখে গাভীটিকে আগামী বছর কুরবানী দিলে মানত আদায় হবে কি না?

উত্তর : মানতকারী ব্যক্তি বাছুরটিকে নিজের জন্য রেখে দিতে পারবে না; বরং তার উপর জরুরি ছিল বাছুরসহ গাভীটিকে ঐ বছরই কুরবানী করে দেওয়া। এখন তার করণীয় হলো, বাছুরসহ গাভীটি জীবিত সদকা করে দেওয়া। যদি জবাই বা কুরবানী করে গোস্ত সদকা করে দেয় তা-ও জায়েয আছে। তবে জবাইকৃত গাভী ও বাছুরের মূল্য জীবিত অবস্থার চেয়ে কম হলে ঘাটতি যাওয়া মূল্য সমপরিমাণ টাকা সদকা করে দিতে হবে।– আদদুররুল মুখতার ৯/৪৬৪, রদ্দুল মুহতার ৪৬৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/৪৪।

প্রশ্ন ৩৬০ : আমরা দুই ভাই মিলে এবার একটি গরু কুরবানী করব। এর মধ্য থেকে একটি অংশ আমাদের মরহুম পিতার নামে করব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে অংশটি পিতার নামে করা হবে সে অংশটুকুর গোস্ত আমরা খেতে পারব কি না?

উত্তর : যদি আপনার মরহুম পিতা আপনাদেরকে কুরবানী করার অসিয়ত না করে থাকে তাহলে আপনারা তার অংশের গোস্ত খেতে পারবেন। আর যদি তিনি তার পক্ষ থেকে কুরবানী করার অসিয়ত করে গিয়ে থাকেন তাহলে তার কুরবানীর অংশটুকু গরিব-মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে।– রদ্দুল মুহতার ৯/৪৮৪, ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ৬/২৯৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪৪৪-৪৪৫, ইমদাদুল আহকাম ৪/২৩৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/২৪৮।

প্রশ্ন ৩৬১ : আমার একটি বকরী মরণাপন্ন হলে আমি বলি, যদি আল্লাহ তা'আলা এই বকরীকে সুস্থ করে দেন তাহলে এটাকে কুরবানী দেব। এরপর বকরীটি সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু ঈদুল আযহায় তাকে কুরবানী দেওয়া সম্ভব হয় নি। কুরবানীর দিন চলে যাওয়ার পর আবার মারা যাওয়ার উপক্রম হলে জবাই করে দেই। এখন এই বকরীর গোস্ত আমার জন্য খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : আপনার উল্লিখিত বক্তব্য ‘আল্লাহ তা‘আলা এই বকরীকে সুস্থ করে দেন তাহলে এটাকে কুরবানী দেব’ এ দ্বারা মানত সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর পরবর্তীতে শর্ত পাওয়া যাওয়ায় বকরীটি কুরবানী করা আপনার উপর ওয়াজিব ছিল। শরীয়তের বিধান হলো, মানতকৃত পশুর গোস্ত গরিব-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। নিজে, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে এবং ধনীদেরকে খাওয়াতে পারবে না। কুরবানীর উদ্দেশ্যে মানতকৃত পশুর ক্ষেত্রে কোনো কারণে ঈদের দিনগুলো পার হয়ে গেলে জীবিত সদকা করে দিতে হবে। জবাই করে গোস্ত সদকা করলে জীবিত বকরীর মূল্য গোসতের মূল্যের চেয়ে বেশি হলে অতিরিক্ত মূল্য সদকা করে দিতে হবে।– আদদুররুল মুখতার ৯/৪৬৩, বাদায়িউস সানায়ে ৪/২৪৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪১৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৫৬।

প্রশ্ন ৩৬২ : যদি কোনো ব্যক্তি তার গাড়ি, বাড়ি অথবা অন্য কোনো সম্পদ ভাড়া দেয় কিংবা কারো কাছে বন্ধক রাখে তাহলে সেগুলোর মূল্য হিসাব করে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : কোনো ব্যক্তির ভাড়া দেওয়া অথবা বন্ধক রাখা সম্পদের মূল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং তা মৌলিক প্রয়োজন তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং ঋণ ইত্যাদির অতিরিক্ত হয় তাহলে তার উপর কুরবানী ও সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। সুতরাং নিসাব হিসাব করার ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্পদের সাথে ভাড়া অথবা বন্ধক রাখা সম্পদের মূল্যকেও হিসাব করতে হবে।– আদদুররুল মুখতার ৩/৩১৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪৫৪, ফাতাওয়া খানিয়া ১/২২৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯২, ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/৩১।

প্রশ্ন ৩৬৩ : জনৈক ব্যক্তি হজ করতে যাচ্ছেন। দেশে তার যে পরিমাণ সম্পদ আছে তাতে কুরবানী ওয়াজিব হয়। সুতরাং তাকে হজের কুরবানী ছাড়া আলাদা কোনো কুরবানী করতে হবে কি না?

উত্তর : ঐ ব্যক্তি যদি হজে গিয়ে কুরবানীর দিনগুলোতে কোথাও মুকীম না হয় তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে না। অতএব তার জন্য দেশে আলাদাভাবে কুরবানী করতে হবে না।– সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩১২৩, ই'লাউস সুনান ১৭/২১২, আদদুররুল মুখতার ৯/৪৫৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/৮১।

প্রশ্ন ৩৬৪ : আকীকা সপ্তম দিনে করা জরুরি কি না? যদি কোনো ব্যক্তি সপ্তম দিনে আকীকা করতে না পারে তাহলে পরবর্তীতে করতে চাইলে ১৪ বা ২১তম দিন অথবা জোড় বা বেজোড় দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি কি না? এ ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর : সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করা মুস্তাহাব। এ দিনে সম্ভব না হলে ১৪ বা ২১তম দিনে করা উত্তম। এ দিনগুলোতেও সম্ভব না হলে যে কোনো দিন আকীকা

করলে আদায় হয়ে যাবে। জোড় বা বেজোড় দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি নয়। তবে পরবর্তীতে আকীকা করলে উল্লিখিত তারিখগুলোতে আকীকা করার মুস্তাহাব আদায় হবে না।– মু'জামুত ত্ববারানী সগীর (মাকতাবায়ে শামেলা সংস্করণ) ১/২৫৪, সুনানে নাসাঈ; হাদীস ৪২৩১, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১৫২২, রদ্দুল মুহতার ৯/৪৮৫, আযীযুল ফাতাওয়া; পৃষ্ঠা ৬৮১, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৫/৬০৭।

জবাই

প্রশ্ন ৩৬৫ : যদি কোনো ব্যক্তি বন্দুক দ্বারা পাখি শিকার করার পূর্বে জবাই করার নিয়ত করে গুলি করে এবং গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে পাখিটি মারা যায় তাহলে এই পাখিটি খাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : না, প্রশ্নে পদ্ধতিতে শিকার করা পাখিটি খাওয়া বৈধ হবে না। তবে যদি শিকারটি হালাল প্রাণী হয় আর মারা যাওয়ার পূর্বেই তাকে সঠিক পদ্ধতিতে জবাই করা হয় তাহলে তা খাওয়া বৈধ হবে।– সূরা মায়েদা; আয়াত ৩, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৫৬৭, ১৯২৯, ১৯৫৪, সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৮৪০, আদদুররুল মুখতার ৬/৪৭১, আলবাহরুর রায়েক ৯/৪২২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৬১৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/১১৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/৪৫৮।

প্রশ্ন ৩৬৬ : মুরগি জবাই করার সময় ‘আল্লাহু আকবর’ বলা এবং দক্ষিণ দিকে মুরগীর মাথা রাখা জরুরি কি না? এবং এই শর্ত না মানলে মুরগীর গোস্ত হালাল হবে কি না?

উত্তর : জবাইকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য আল্লাহ তা‘আলার নাম উচ্চারণ করা শর্ত। তাই ইচ্ছাকৃত আল্লাহর নাম পরিত্যাগ করে জবাই করলে প্রাণী হালাল হবে না। তবে ভুল করে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে জবাই করলে প্রাণী হালালই থাকবে, হারাম হবে না। আর আল্লাহর নাম উচ্চারণের ক্ষেত্রে بسم الله বা بسم الله اكبر বলা মুস্তাহাব। প্রাণীর মুখ কিবলার দিকে করে জবাই করা সুন্নাত। মাথা দক্ষিণ দিকে রাখা জরুরি নয়। তবে দক্ষিণ দিকে মাথা রাখলে জবাই করা সহজ হয়।– বযলুল মাজহুদ ৪/৭০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৮৭, ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ৬/৩০৫, রদ্দুল মুহতার ৯/৪২৭, ৪৩৭, আলমাউসূ‘আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ২১/১৮৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/১৩৭, ১৩৮, ১৪৩।

লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রশ্ন ৩৬৭ : এক লোকের ইসলামী ব্যাংকে কিছু টাকা ছিল এবং সেটার উপর ব্যাংক তাকে লাভ দিয়েছে। কিন্তু সে ব্যক্তি লাভের টাকাটা সুদ মনে করে নিতে চাচ্ছে না এবং ব্যবহার করতে চাচ্ছে না। (উল্লেখ্য, ব্যাংক তাকে বলেছে এটা সুদ না।) যদি

সুদ হয় তাহলে লাভের সেই টাকাটা তোলা যাবে কি না? বা সেই টাকা তুলে সওয়াবের আশা না করে অন্য কাউকে দেওয়া যাবে কি না? যদি দেওয়া যায় তবে কাকে কাকে দেওয়া জায়েয হবে?

উত্তর : ব্যাংক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, তাদের ব্যাংক শরীয়তসম্মত পন্থায় পরিচালিত এ জন্য বিনিয়োগকারীদেরকে যে সুদ দেওয়া হয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাকে মুনাফা বা লাভ বলে থাকে, সুদ বলে না। কিন্তু আমাদের জানা মতে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে শরঈ নীতিমালাগুলো পরিপূর্ণ বাস্তবায়িত করা হয় না। তাই মুনাফা নাম দিলেও ঐ লভ্যাংশগুলো সুদ বলেই গণ্য করা হবে। এ জন্য করণীয় হলো, লভ্যাংশের টাকা উঠিয়ে সওয়াবের নিয়ত ছাড়াই গরিব-মিসকীনকে দিয়ে দেওয়া অথবা জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী টয়লেট ইত্যাদি নির্মাণ করে দেওয়া।– বযলুল মাজহুদ (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া সংশ্লিষ্ট) ১/৩৭, রদ্দুল মুহতার ৭/৩০১, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া (ফাতাওয়া হিন্দিয়া) ৪/৮৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/১৯৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৪/৩৪৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/২৩৯, ফাতাওয়া উসমানী ৩/২৬৯।

প্রশ্ন ৩৬৮ : জনৈক ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা জমা রেখেছে। ব্যাংক উক্ত টাকা কোনো কাজে লাগিয়ে যে লাভ পায় তা থেকে ৯০% ঐ মালিককে দেয় আর বাকী ১০% ব্যাংক রেখে দেয়। তাহলে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির জন্য ৯০% লাভের এই টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : এক্ষেত্রে ব্যাংক যদি উক্ত টাকা শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে কোনো ব্যবসার কাজে বিনিয়োগ করে এবং এর মাধ্যমে লাভ অর্জন হয় আর সেখান থেকে উক্ত মালিককে লাভের অংশ দেয় তাহলে বাইয়ে মুযারাবার চুক্তি হিসেবে তার জন্য উক্ত ৯০% লাভের টাকা গ্রহণ করা জায়েয আছে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, মুযারাবার চুক্তির সময়ই লাভের অংশ নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং লোকসানের দায়ভার টাকার মালিককেই বহন করতে হবে। সাথে মুযারাবা চুক্তির যাবতীয় শর্ত পাওয়া যেতে হবে।

উল্লেখ্য, আমাদের জানামতে বাংলাদেশে কোনো ব্যাংকই পরিপূর্ণ ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত নয়। সুতরাং ব্যাংক কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য হতে বেঁচে থাকার মধ্যেই সতর্কতা এবং তাকওয়া নিহিত।– আলহিদায়া ৩/২৫৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/২৮৫, আলবাহরুর রায়েক ৭/৪৪৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/৩৮৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/৩৪৭।

প্রশ্ন ৩৬৯ : ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে কম-বেশি করে বিক্রি করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে কম-বেশি করে বিক্রি করা জায়েয আছে। তবে ক্রয়-বিক্রয় স্থল থেকেই উভয় পক্ষের মুদ্রা হস্তান্তর সম্পন্ন করা আবশ্যক। – সূরা বাকারা; আয়াত ১৯৫, মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ৩৪২, আল্লামা যফর আহমদ উসমানীকৃত আহকামুল কুরআন ২/২৯১, তাফসীরুল মাযহারী ৩/১৫২,

আলজামে' লিআহকামিল কুরআন ৫/২৫৯, হাশিয়া ফাতাওয়া উসমানী ৩/৯০, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৩৭২, ফাতাওয়া উসমানী ৩/১৪৭, মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কৃত কারেন্সি নোট কী শরঈ হাইছিয়াত; পৃষ্ঠা ১৫০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৪/২৬৭, ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত ওয়া তিজারাত; পৃষ্ঠা ১৩০।

প্রশ্ন ৩৭০ : ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে যদি মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া থাকে তাহলে এর থেকে কম-বেশি করে বিক্রি করা যাবে কি না?

উত্তর : কোনো দেশের সরকারের পক্ষ থেকে যদি বিদেশি মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করা থাকে এবং সে দেশীয় আইনে উক্ত নির্ধারণ নীতি অমান্য করা অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে দেশীয় আইন ভঙ্গ করে মুদ্রা বিনিময় করে নিজেকে বিপদে ফেলা জায়েয হবে না।– সূরা বাকারা; আয়াত ১৯৫, মুসতাদরাকে হাকেম; হাদীস ৩৪২, আল্লামা যফর আহমদ উসমানীকৃত আহকামুল কুরআন ২/২৯১, তাফসীরুল মাযহারী ৩/১৫২, আলজামে' লিআহকামিল কুরআন ৫/২৫৯, হাশিয়া ফাতাওয়া উসমানী ৩/৯০, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৩৭২, ফাতাওয়া উসমানী ৩/১৪৭, মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কৃত কারেন্সি নোট কী শরঈ হাইছিয়াত; পৃষ্ঠা ১৫০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৪/২৬৭, ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত ওয়া তিজারাত; পৃষ্ঠা ১৩০।

প্রশ্ন ৩৭১ : জনৈক ব্যক্তি তার বোনকে ষাট হাজার টাকা দিল এবং তার বোন তাকে প্রতি বছর ধানের দুই মৌসুমে পাঁচ হাজার টাকা করে মোট দশ হাজার টাকা দেয়। এবং ষাট হাজার টাকা চাওয়া মাত্রই বোন তাকে দিয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। তাহলে বছরে অতিরিক্ত দশ হাজার টাকা নেয়া সুদ হবে কি না?

উত্তর : প্রতি বছর দুই মৌসুমে অতিরিক্ত দশ হাজার টাকা দেওয়ার শর্তে করয গ্রহণ করা জায়েয হবে না এবং ভাই কর্তৃক অতিরিক্ত দশ হাজার টাকা গ্রহণ করা অবশ্যই সুদ হিসেবে গণ্য হবে।– সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৩০, সূরা বাকারা; আয়াত ২৭৬, আলহিদায়া ৩/৭৭ (২নং হাশিয়ায়), আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা কুওয়াইতিয়্যা ২২/৫০, সহীহ বুখারী; হাদীস ২১৭৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩/২১৮, রদ্দুল মুহতার ৫/১৬৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/১৪৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/২৬৩।

প্রশ্ন ৩৭২ : কারো হাতে যদি সুদের টাকা এসে যায় তবে সে টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরিব মিসকীনদের দেওয়া যাবে কি না? মূলত এ সুদের টাকার মাসরাফ কারা?

উত্তর : হ্যাঁ, সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সুদের টাকা গরিব মিসকীনদের দেওয়া যাবে। মূলত এ সুদের টাকার প্রথম প্রাপক হলো, উক্ত টাকার আসল মালিক। যদি সে না থাকে তাহলে তার উত্তরাধিকারীগণ। যদি উত্তরাধিকারীগণও না থাকে বা তাদের না পাওয়া যায় তাহলে আসল মালিকের পক্ষ থেকে উক্ত টাকা গরিবদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে।– রদ্দুল মুহতার ৭/৩০১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/৩৭৯, ফাতাওয়া উসমানী ৩/১৩০।

প্রশ্ন ৩৭৩ : বর্তমানে প্রচলিত বীমা পদ্ধতি জায়েয আছে কি না? এ সকল বীমা পলিসি গ্রহণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ আছে কি না?

উত্তর : আমাদের জানা মতে বর্তমানে প্রচলিত বীমাসমূহের মাঝে সুদ ও জুয়ার উপস্থিতি রয়েছে। অতএব প্রচলিত কোনো বীমা পলিসি গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হবে না। যদি কেউ বলে যে, আমাদের বীমা পলিসি শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত তাহলে তাদের কাগজপত্র আমাদের কাছে পেশ করলে আমরা সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারব।– সূরা মায়েদা; আয়াত ৯০, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৯৮, রদ্দুল মুহতার ৬/২৮১, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৩৩১।

প্রশ্ন ৩৭৪ : ঢাকা শহরে যেসব বাসা ভাড়া দেওয়া হয় তাতে যদি পানির ট্যাপ কিংবা ব্যাসিন ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায় তবে এগুলো মেরামত করার দায়িত্ব কার? বাড়িওয়ালার না ভাড়াটিয়ার?

উত্তর : বাসা-বাড়ির নষ্ট হয়ে যাওয়া পানির ট্যাপ, ব্যাসিন ইত্যাদি মেরামত করা বাড়ির মালিকের দায়িত্ব। তবে ভাড়াটিয়ার অস্বাভাবিক ব্যবহারের ফলে নষ্ট হলে মালিক তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে।– আদদুররুল মুখতার ৯/৫৫, ১০৯, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৫/১৫১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৪৫৫, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৩৭৫।

প্রশ্ন ৩৭৫ : রক্ত বিক্রি করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : রক্ত যেহেতু পণ্য হিসেবে পরিগণিত নয় এ জন্য এর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই। তবে কেউ যদি গুরুতর অসুস্থতার কারণে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং বিনামূল্যে রক্ত সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে উক্ত ব্যক্তির জন্য রক্ত ক্রয় করা জায়েয আছে। কিন্তু রক্ত বিক্রি করা কোনো অবস্থায়ই জায়েয নেই।– রদ্দুল মুহতার ৭/২৩৫, আলবাহরুর রায়েক ৬/১১৫, আলবিনায়াহ ১০/২১২।

প্রশ্ন ৩৭৬ : অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ক্রেতা মাল নিয়ে বিক্রেতাকে টাকা দিয়ে দেয়। মাঝে কোনো ঈজাব-কবুল কিছুই হয় না। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে সন্তুষ্টচিত্তে যদি প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে লেনদেন করে তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে।– ই'লাউস সুনান ১৪/১৩৩, আদদুররুল মুখতার ৭/২৮, বাদায়িউস সানায়ে' ৪/৩১৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩/২০, আলহিদায়া ৩/১৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/১৩৮।

প্রশ্ন ৩৭৭ : গোবর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে কি না?

উত্তর : গোবর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে।– খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৫৩, আলহিদায়া ৪/৪৬৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩/১১৬, ফাতাওয়া কাযীখান ২/১৩৩, আলবাহরুর রায়েক ৬/১১৬, আদদুররুল মুখতার ৬/৩৮৫, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলাদ দুর ৪/১৯৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৪/২৯৫।

প্রশ্ন ৩৭৮ : চুরিকৃত অথবা চোরাই মার্কেট থেকে জেনেশুনে কোনো জিনিস ক্রয় করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : নিশ্চিতভাবে জেনেশুনে চুরিকৃত বা চোরাই মার্কেট থেকে কোনো জিনিস ক্রয় করা জায়েয নেই। এর দ্বারা চুরি তথা হারাম কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হয় যা সম্পূর্ণভাবে হারাম। তাছাড়া চুরিকৃত জিনিসগুলো বিক্রেতার নিজের নয়; বরং তা মূল মালিকের যা বিক্রির অধিকার তার নেই। সুতরাং চুরিকৃত বা চোরাই মার্কেট থেকে কোনো জিনিস ক্রয় করা কোনো ক্রমেই জায়েয হবে না এবং ক্রয় করলে ক্রেতা সে জিনিসের মালিক হবে না।– সূরা মায়েদা; আয়াত ২, রদ্দুল মুহতার ৫/৫৮, ৫৯, বাদায়িউস সানায়ে' ৬/৪৫, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৬৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/৪০২, ফাতাওয়া রশীদিয়া ২/১৮৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/২৮, কিফায়াতুল মুফতী ৮/৩৩।

প্রশ্ন ৩৭৯ : বাইয়ে মুরাবাহার ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি অন্যকে এই মর্মে উকিল বানায় যে, সে ক্রয় করে ক্রেতার নিকট পণ্য হস্তান্তর করবে এবং এ কথাও বলে যে, তোমার নাম ঠিকানায় পণ্য ক্রয় করে তাকে অর্পণ করে দিবে তবে শরীয়তে দৃষ্টিতে এতে কোনো সমস্যা আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে উকিল যদি মুয়াক্কিলের কথামতো তার নিজের নাম ব্যবহার করে ঐ পণ্যটাই মুয়াক্কিলের পক্ষ হতে ধার্যকৃত মূল্য দিয়ে ক্রয় করে এবং ক্রেতা পক্ষের নিকট হস্তান্তর করে তবে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে। এক্ষেত্রে ক্রয়কৃত পণ্য ও বিক্রয়ের পর পণ্যের মূল্য মুয়াক্কিলের বলেই গণ্য হবে।– আদদুররুল মুখতার ৮/২৫২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩/৫৮০।

প্রশ্ন ৩৮০ : জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালী করে টাকা গ্রহণ করা হালাল হবে কি না?

উত্তর : দালালীর টাকা গ্রহণ করা জায়েয আছে। তবে দালালের পারিশ্রমিক কত হবে তা কাজের পূর্বেই উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করতে হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি কাউকে বললো, তুমি যদি আমার জমিটা বিক্রি করে দিতে পারো তাহলে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব। অথবা বললো, যতো দামে তুমি বিক্রি করে দিবে শতকরা পাঁচ টাকা তোমার হবে। এভাবে জমি বিক্রি করে দালালীর টাকা গ্রহণ করা দালালের জন্য হালাল হবে। তবে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া কোনো ক্রমেই জায়েয নেই।– মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ২২৪৯৮, ২২৫০০, সহীহ বুখারী; হাদীস ২৬৭, রদ্দুল মুহতার ৬/৬৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৪৫০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/২৮৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২৭৩।

প্রশ্ন ৩৮১ : কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানীর নামে যে সকল লাইসেন্স থাকে। সে সকল লাইসেন্স ক্রয়-বিক্রয় করে বিনিময় গ্রহণ করার হুকুম কি?

উত্তর : যেমনিভাবে ব্যবসায়িক নাম এবং ট্রেডমার্ক ক্রয়-বিক্রয় এর মাধ্যমে বিনিময়

গ্রহণ করা জায়েয আছে তেমনিভাবে ব্যবসায়িক লাইসেন্স ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করাও জায়েয আছে। তবে লাইসেন্স বিক্রয় ঐ সময় জায়েয হবে যখন রাষ্ট্র এই লাইসেন্স অন্য কারো কাছে হস্তান্তর বা বিক্রয়ের অনুমোদন দেবে। যদি লাইসেন্স নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট কোম্পানি বরাবর ইস্যু হয়ে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় বিধান অনুযায়ী তার হস্তান্তর নিষিদ্ধ হয় তাহলে এ জাতীয় লাইসেন্স ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না।– বুহূস ফী ক্বাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসারা ১/১২০, ফিকহী মাকালাত ১/২২২, ইসলাম আওর জাদীদ মা'আশী মাসাইল ৩/৮৪।

প্রশ্ন ৩৮২ : কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার হুকুম কি?

উত্তর : কুরআন শরীফ শিক্ষাদানের পার্থিব কোনো বিনিময় হয় না। তবে যিনি কুরআন শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকেন তিনি যেহেতু তার সময়-শ্রম এতে ব্যয় করেন, তাই তাকে যদি কিছু বিনিময় দেওয়া হয় তাহলে তা নাজায়েয হবে না। কিন্তু কুরআন শিক্ষা দেওয়ার দ্বারা শিক্ষকের অবশ্যই নিয়ত থাকবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। পার্থিব বিনিময় যেন মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়।– মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ২১২২৮, ২১২৩৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৫/১২৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৪৪৮, রদ্দুল মুহতার ৯/৭৬-৭৮, শরহু উকূদি রসমিল মুফতী; পৃষ্ঠা ৬৪, ফাতাওয়া রশীদিয়া ২/২০৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/২০৬।

প্রশ্ন ৩৮৩ : আমি একজন এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। একদিন এক রোগী এসে আমাকে একটি হোমিও ওষুধ এনে দেওয়ার অর্ডার দেয়, যার মূল্য ২৫০/- টাকা এবং ঐ ব্যক্তি এর মূল্য সম্পর্কে জানে না। আমি তাকে বললাম, আমাকে ৩০০/- টাকা দিলে আপনার অর্ডারি ওষুধ এনে দেব। এভাবে আমার জন্য পঞ্চাশ টাকা উপার্জন করা কি বৈধ হবে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি কারো পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয় করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে তার জন্য উক্ত কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয আছে। তবে এর পরিমাণ পারস্পরিক সমঝোতা ও নির্ধারণের মাধ্যমে হতে হবে। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে এ বিষয়টি থাকায় আপনার জন্য ওষুধ বাবদ খরচের অতিরিক্ত টাকা নেয়া বৈধ। তবে এত বেশি লাভ নেয়া উচিত নয়।– ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৫/১৩৭, রদ্দুল মুহতার ৮/২৫১, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ৩৫/৯১, ৯২, ইমদাদুল আহকাম ৪/১৪৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/৭৫।

প্রশ্ন ৩৮৪ : কোনো ব্যক্তি যদি কারো কাছে টাকা আমানত রাখে এবং তাকে সে টাকা ব্যবসায় খাটানোর অনুমতি দেয় এবং তার থেকে কিছু লাভও সে গ্রহণ করে তবে কি এ পদ্ধতি বৈধ হবে?

উত্তর : মালিক যদি আমানতের টাকা ব্যবসায় খাটানোর অনুমতি দেয় এবং সেখান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ গ্রহণ করে তাহলে সেটা জায়েয হবে। তবে মনে রাখতে হবে, ঐ টাকা দিয়ে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়ার পর তা আর আমানত থাকবে না;

বরং মুযারাবার মূলধন হিসেবে গণ্য হবে এবং তার উপর মুযারাবার সমস্ত শর্ত ও হুকুম প্রয়োগ হবে।– বাদায়িউস সানায়ে' ৫/১১৪, আদদুররুল মুখতার ৮/৪৩৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/২৮৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৩/৯৭।

প্রশ্ন ৩৮৫ : আমাদের এলাকায় একটি বিশেষ পদ্ধতিতে জমি বর্গা দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। যাকে স্থানীয় ভাষায় কন্ট্রাক্ট বলা হয়। পদ্ধতিটি হচ্ছে, জমিওয়ালা বর্গা চাষিকে এই শর্তে জমি আবাদ করতে দেয় যে, আমাকে ইরি ধানের মৌসুমে পাঁচ মন এবং আমন ধানের মৌসুমে চার মন ধান দিতে হবে। এই পদ্ধতিটি জায়েয আছে কি না?

উত্তর : নির্দিষ্ট কোনো জমির উৎপাদিত ধানকে বিনিময় হিসেবে দেওয়ার শর্ত না করা হলে উল্লিখিত বর্গা পদ্ধতিটি জায়েয আছে। তবে ধানের গুণগত মান ও প্রকার বর্ণনা করে দিতে হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।– আদদুররুল মুখতার ৯/৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৫/৯, ১১, ইমদাদুল আহকাম ৩/৫৯৩।

মানত, কসম ও কাফ্ফারা

প্রশ্ন ৩৮৬ : কোনো ব্যক্তি বললো যে, আমার এই গরুটি যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে এটাকে কুরবানী করব। শুধুমাত্র এতটুকু বলার দ্বারাই কি মানত ওয়াজিব হয়ে যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, এতটুকু বলার দ্বারাই তার উপর মানত ওয়াজিব হয়ে যাবে।– রদ্দুল মুহতার ৫/৫২৩, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৪/২৭২, আলবাহরুর রায়েক ৩/৫৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৪৮৭, ইমদাদুল আহকাম ৩/৪১, বেহেশতী যেওর ৩/২৪৩।

প্রশ্ন ৩৮৭ : কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে মানত করলে তা অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে মানত করার পর তা অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে। কেননা মান্নতের ক্ষেত্রে স্থান, কাল, পাত্র নির্দিষ্ট করার দ্বারা সেগুলো নির্দিষ্ট হয় না।– বাদায়িউস সানায়ে' ৪/২৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৪৮০।

প্রশ্ন ৩৮৮ : জনৈক ব্যক্তি একটি ছাগল মানত করেছে। এখন সে তার মূল্য দ্বারা মানত আদায় করতে চায়। প্রশ্ন হলো, ছাগলের পরিবর্তে মূল্য দ্বারা মানত আদায় করা যাবে কি না?

উত্তর : মানতকারীর জন্য এই সুযোগ আছে যে, সে চাইলে মানতকৃত নির্দিষ্ট বস্তুটি দিতে পারে আবার তার মূল্যও দিতে পারে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে তার জন্য ছাগলের পরিবর্তে মূল্য আদায় করা বৈধ হবে।– রদ্দুল মুহতার ৩/৭৪১, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৮১, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/৪২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২০/২১৬।

প্রশ্ন ৩৮৯ : কোনো ব্যক্তি যদি শপথ করে যে, 'তার ভাইয়ের সাথে আর কথা বলবে না' তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো, ঐ কসম ভেঙ্গে দেওয়া এবং কাফ্‌ফারা আদায় করা।– সহীহ বুখারী; হাদীস ৭৩৫, ৬০৭৭, আদদুররুল মুখতার ৩/৭২৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/৩৭।

প্রশ্ন ৩৯০ : মসজিদের নামে মানত মানা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মসজিদের নামে মানত করা জায়েয নেই। তবে মসজিদের গরিব মুসল্লীদের জন্য মানত করা জায়েয আছে। সুতরাং কেউ মসজিদের নামে মানত করলে তা পূর্ণ করা জরুরি নয়।– রদ্দুল মুহতার ৩/৭৩৫, বাদায়িউস সানায়ে' ৪/২২৬, ২২৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৪৭৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২০/২১৭।

প্রশ্ন ৩৯১ : আমার একটি ছেলে সন্তান জন্মের কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই আমি মানত করেছিলাম, ছেলে সুস্থ হলে একটি খাসি আকীকা করব। আল্লাহ তা'আলার দয়ায় ছেলে সুস্থ হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো, ছেলের আকীকা কি করতেই হবে? না করার কি কোনো সুযোগ আছে? আকীকা করতে হলে কি খাসিই করতে হবে? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে মানত ওয়াজিব হয়েছে। তাই ঐ ছেলের জন্য আকীকা করা ওয়াজিব। তবে খাসি আকীকা করা জরুরি নয়। গরুর সাত ভাগের এক ভাগ বা মাদি ছাগল দিলেও আকীকা হয়ে যাবে।– সূরা হজ; আয়াত ৩৯, সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৬৯৬, বাদায়িউস সানায়ে' ৪/২২৭, ২২৮, আদদুররুল মুখতার ৫/৫১৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩/৩৫০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৪৩১, ৪৩৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/২৫।

প্রশ্ন ৩৯২ : কুরআনের নামে অথবা কুরআন স্পর্শ করে কসম করলে কি কসম সংঘটিত হবে?

উত্তর : কুরআনের নামে অথবা কুরআন স্পর্শ করে কসম করলে কসম হয়ে যাবে। সুতরাং এ কসম ভঙ্গ করলে তার কাফ্‌ফারা দিতে হবে।– ফাতহুল কাদীর ৫/৬৪, আলবাহরুর রায়েক ৪/৪৮২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৫৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১২/৪৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/৩৪, আযীযুল ফাতাওয়া; পৃষ্ঠা ৫৫৩।

প্রশ্ন ৩৯৩ : আমাদের গ্রামে একটি ছেলে অন্য একজন পুরুষের সাথে কসম করে বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনার কন্যা ব্যতীত অন্য কোনো মেয়েকে বিবাহ করব না। অতঃপর ঐ ছেলেটি অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করল। এখন তার করণীয় কি?

উত্তর : কসম করার পরও যেহেতু কসম রক্ষা করেনি; বরং অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে। তাই তার কসম ভঙ্গ হয়ে গেছে। এখন ঐ ব্যক্তির উপর কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা আদায় করা ওয়াজিব। আর কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা হলো, দশ জন দরিদ্রকে দু'বেলা মধ্যম ধরনের খাবার খাওয়াতে হবে কিংবা তাদেরকে সতর ঢাকা পরিমাণ পোশাক পরিচ্ছদ দিতে হবে কিংবা কোনো গোলাম মুক্ত করতে হবে। আর যদি উল্লিখিত তিনটির কোনোটি আদায়ে সক্ষম না হয় তবে তিনটি রোযা রাখবে।–

সূরা মায়েদা; আয়াত ৮৯, রদ্দুল মুহতার ৫/৬২৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/১১১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৬/৫৩।

প্রশ্ন ৩৯৪ : যদি কোনো ব্যক্তি এই মর্মে মানত করে যে, যদি আমার অমুক কাজটি সমাধান হয়ে যায় তাহলে আমি তিনদিন রোযা রাখব, তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য তিন দিনের রোযা কি ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে নাকি পৃথক পৃথক ভাবে রাখতে পারবে?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি যদি মানত করার সময়ই ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখার নিয়ত করে তাহলে তাকে ধারাবাহিকভাবেই রোযা রাখতে হবে। আর যদি মানত করার সময় ধারাবাহিকতার নিয়ত না করে তাহলে তার ইচ্ছানুযায়ী রাখতে পারবে। চাইলে ধারাবাহিকভাবে রাখতে পারে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও রাখতে পারবে।– আলবাহরুর রায়েক ২/৫৩৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৯, রদ্দুল মুহতার ৩/৭৪১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া (হাশিয়া) ২০/২৪৬।

মাতা-পিতার হক

প্রশ্ন ৩৯৫ : কেউ যদি না বুঝে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়ার পর পিতা-মাতা মারা যায় এরপর সে অনুতপ্ত হয় তাহলে সে কীভাবে উক্ত গোনাহ থেকে ক্ষমা পেতে পারে?

উত্তর : সুস্থ, বোধসম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো ব্যক্তির জন্য পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া কবীরা গোনাহ এবং জঘন্যতম অপরাধ। এক্ষেত্রে না বুঝা বা না জানা দায় মুক্তির গৃহীত কোনো কারণ নয়। তবে কেউ যদি অন্যায়ভাবে পিতা-মাতাকে কষ্ট দিয়ে থাকে এবং পিতা-মাতা মারা যাওয়ার পর উক্ত অপরাধ থেকে ক্ষমা পেতে চায় তবে তার জন্য করণীয় হলো, কায়মনোবাক্যে তওবা করার পর পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায, দান-সদকা ও নফল রোযা রেখে সওয়াব রেসানী করা। আল্লাহ চাহে তো এর মাধ্যমে উক্ত গোনাহ থেকে ক্ষমা পাবে।– সূরা ইসরা; আয়াত ২৩, সহীহ বুখারী; হাদীস ৬৬৭৫, রদ্দুল মুহতার ৩/১৫১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭, আলহিদায়া ১/২৯৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৯/৯৯, ১০৯।

প্রশ্ন ৩৯৬ : মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে সন্তান জিহাদে যেতে পারবে কি না?

উত্তর : জিহাদ ফরযে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত হলে মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে জিহাদে যাওয়া যাবে না। কারণ মাতা-পিতার আনুগত্য করা ফরযে আইন। আর ফরযে আইন ফরযে কিফায়ার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে জিহাদ ফরযে আইন হলে মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে।– বাদায়িউস সানায়ে' ৬/৫৮, আদদুররুল মুখতার ৬/২০১, ফাতাওয়া আলমগীরী ২/১৮৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/২৯৫।

সালাম

প্রশ্ন ৩৯৭ : যে ব্যক্তি কোনো ফাসেকী কাজে লিপ্ত তাকে সালাম দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : যে ব্যক্তি কোনো ফাসেকী কাজে লিপ্ত তাকে সালাম করার দ্বারা যদি তাকে সংশোধনের আশা থাকে তবে তাকে সালাম দেওয়া যাবে। আর যদি তাকে সালাম না দেওয়ার ভিতর সংশোধনের আশা থাকে তবে তাকে সালাম দেবে না। আর ফাসেককে সালাম দেওয়া দ্বারা যদি তাকে সম্মান করা উদ্দেশ্য হয় তবে সালাম দেবে না। কিন্তু যেহেতু তার মধ্যে ঈমান আছে এজন্য তার ইজ্জত সম্মান অন্তরে রাখা বাঞ্ছনীয়।– রদ্দুল মুহতার ৬/৪১২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/১০৯।

প্রশ্ন ৩৯৮ : অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি কারো মাধ্যমে সালাম পৌছায় তাহলে সালাম প্রাপ্ত ব্যক্তি কীভাবে সালামের জবাব দেবে?

উত্তর : কেউ যদি অন্যের কাছে সালাম পৌছায় তাহলে তাকে উক্ত সালামের জবাব দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সালাম জানালো এবং যার মাধ্যমে জানালো উভয়কে উদ্দেশ্য করেই সালামের জবাব দিতে হবে। জবাবটা এভাবে দিবে, وعليك وعليه السلام।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫২৩১, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/৮৭, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৯৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/১৯৮।

প্রশ্ন ৩৯৯ : সালামের জবাব দেওয়ার বিধান কি এবং শুনিয়ে জবাব না দিলে কোনো গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। যদি সালাম দাতা নিকটে থাকে তাহলে তাকে শুনিয়ে وعليكم السلام বলা অপরিহার্য। আর যদি দূরে হয় কিংবা বধির হয় তাহলে মুখে উচ্চারণের সাথে সাথে হাতের ইশারায়ও তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সালামের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।– সূরা নিসা; আয়াত ৮৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৪১৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/৭৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২৭৬।

প্রশ্ন ৪০০ : কোনো ব্যক্তিকে উযূ করা অবস্থায় সালাম দেওয়া যাবে কি না এবং কেউ দিয়ে ফেললে তার হুকুম কি?

উত্তর : যে ব্যক্তি উযূ করছে সে যদি উযূ করা অবস্থায় দু'আ পড়তে থাকে তবে ঐ অবস্থায় তাকে সালাম দেওয়া মাকরূহ। আর যদি দু'আ না পড়ে তবে জায়েয হবে।– রদ্দুল মুহতার ১/৬১৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/১৯০।

প্রশ্ন ৪০১ : কোনো হিন্দু ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া এবং তার দেওয়া সালামের উত্তর দেওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : কোনো হিন্দু ব্যক্তিকে السلام عليكم বলে সালাম দেওয়া জায়েয নেই। তবে বিশেষ প্রয়োজনে السلام على من اتبع الهدى বলে সালাম দেওয়া যেতে পারে। আর যদি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হয় তবে তা জায়েয নেই। পক্ষান্তরে যদি কোনো হিন্দু সালাম

করে অর্থাৎ السلام عليكم বলে তবে জবাবে শুধু وعليكم বলে ক্ষান্ত হবে।– সহীহ বুখারী; হাদীস ৭, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১৬০২, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/৮১, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/৩২৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/২২৭।

প্রশ্ন ৪০২ : গায়রে মাহরাম মহিলাকে সালাম দেওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : যদি কোনো ফিতনার আশংকা না থাকে তাহলে গায়রে মাহরাম মহিলাকে সালাম দেওয়া যাবে।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫২০৪, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৬৯৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৭০১, আলবাহরুর রায়েক ৯/৩৮০, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৩০, ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৪২৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/৭৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/২০০।

প্রশ্ন ৪০৩ : মুসল্লীরা নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসে রয়েছেন। কেউ হয়তো নামায পড়ছেন। আবার কেউ যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল পড়ছেন। এমতাবস্থায় নতুন কোনো মুসল্লী মসজিদে প্রবেশকালে যদি উচ্চস্বরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : যদি মসজিদে মুসল্লীরা ইবাদতরত অবস্থায় থাকে তাহলে প্রবেশকারী ব্যক্তির জন্য সালাম দেওয়া মাকরূহ। তবে মসজিদে কেউ না থাকলে সালাম দিয়ে প্রবেশ করা জায়েয আছে। বরং এক্ষেত্রে সালাম দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম।– আদদুররুল মুখতার ৯/৫৯৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২১, ৩২৬, রদ্দুল মুহতার ২/৩৭৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/১৯৬।

প্রশ্ন ৪০৪ : যদি কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলক সালাম দেয় যেমন দোকানদারেরা ক্রেতাদেরকে সালাম দিয়ে থাকে তাহলে তার জবাব দেওয়া জরুরি কি না?

উত্তর : যদি কোনো দোকানদার ক্রেতাদেরকে এই উদ্দেশে সালাম দেয় যে, সে আমার দোকানে আসুক এবং আমার দোকন হতে ক্রয় করুক তাহলে তার সালামের জবাব দেওয়া জরুরি নয়। তবে সালামের জবাব দেওয়া উত্তম।– রদ্দুল মুহতার ৬/৪১৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/২৩৩।

প্রশ্ন ৪০৫ : অনেক ক্ষেত্রে কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে কিংবা মোবাইলে কথা হলে আমি তাকে সালাম দেই। একই সময়ে সেও আমাকে সালাম দেয়। এক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কে সালামের জবাব দেবে?

উত্তর : যদি দুই ব্যক্তি একসাথে একে অপরকে সালাম দেয় তাহলে উভয়ের উপরই সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব।– রদ্দুল মুহতার ৯/৫৯৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/৭৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/১৮৬।

প্রশ্ন ৪০৬ : আমরা শুনে থাকি মুয়ানাকা একবার করতে হয়; তিনবার নয়। মাসআলাটি মূলত কতটুকু দলীলসমৃদ্ধ?

উত্তর : মুয়ানাকা একটি সুন্নত আমল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে মুয়ানাকা করেছেন। তবে বর্তমানে তিনবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুয়ানাকা করার যে প্রচলন লক্ষ্য করা যায় তা শরঈ দলীলের আলোকে প্রমাণিত নয়। সুতরাং মুয়ানাকার সুন্নাহ পদ্ধতি হলো একবার কাঁধে কাঁধ মিলানো; তিনবার নয়। আর ডান কাঁধে মিলানো সুন্নত; বাম কাঁধে নয়।–শরহু মায়ানিল আসার হাদীস নং ৬৪০০,৬৪০৩, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৪৬, আলবাহরুর রায়িক ৯/৩৬৪, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৮/২১১।

মসজিদ, ওয়াকফ

প্রশ্ন ৪০৭ : মসজিদের নামে জোরপূর্বক দখলকৃত জমিতে নির্মিত মসজিদে নামায আদায় করা এবং ইমামতি করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : অন্যের জমিতে জোরপূর্বক দখল করে যে মসজিদ তৈরি করা হয় সেখানে নামায পড়া এবং পড়ানো মাকরূহ।– রদ্দুল মুহতার ২/৭৫, আদদুররুল মুখতার ১/৩৮০, ফাতহুল কাদীর ১/৪২৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২১/৩৩০।

প্রশ্ন ৪০৮ : মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত অতিরিক্ত জমিতে মাদরাসা করা যাবে কি না?

উত্তর : এলাকায় দীনি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হলে স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। এ জন্য যৌথ উদ্যোগে পৃথক জমি ক্রয় করে তাতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হ্যাঁ, মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত অতিরিক্ত জমি যদি মসজিদের কাজে না লাগে তাহলে সেখানে মসজিদের অধীনে কুরআনী তা'লীমের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা জায়েয হবে। উল্লেখ্য, কুরআন-হাদীসের শিক্ষার এবং দীনি শিক্ষার প্রচার প্রসার মসজিদের উদ্দেশ্যাবলীর আওতাভুক্ত। দীনি শিক্ষার এ ধারা মসজিদে নববী থেকেই চলে আসছে। তাই মসজিদের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জায়গায় মসজিদের ব্যবস্থাপনায় কুরআন-হাদীস দীনি মৌলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া জায়েয হবে।– সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৮৫, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ২২৭, আলবাহরুর রায়েক ২/৩৪, ৩৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/৩৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/১১৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১০।

প্রশ্ন ৪০৯ : মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত অর্থ দ্বারা জানাযার খাটিয়া ক্রয় করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত টাকা দ্বারা জানাযার খাটিয়া ক্রয় করা জায়েয নেই।– ফাতাওয়া আলমগীরী ২/৪৬২, ফাতাওয়া খানিয়া ৩/১৯৭ (ফাতাওয়া হিন্দিয়া সংশ্লিষ্ট), ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/১৫৮।

প্রশ্ন ৪১০ : ওয়াকফ জমি এবং সরকারি খাস জমির সম্মিলিত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা কি জায়েয আছে? আর মসজিদ নির্মাণ হয়ে গেলে সেটা শরঈ মসজিদ বলে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : ওয়াকফ জমি এবং অননুমোদিত সরকারি খাস জমির সম্মিলিত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নেই। তবে যদি কেউ মসজিদ নির্মাণ করে ফেলে এবং পরবর্তীতে সরকারিভাবে সে জায়গা মসজিদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তবে তখন তা শরঈ মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে।– আদদুররুল মুখতার ৯/২৯১, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৪২৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২১/২৪৩, ৩৩৫।

প্রশ্ন ৪১১ : কোনো এক মসজিদের সভাপতি সাহেব মসজিদের সাধারণ ফান্ডের টাকা দ্বারা মসজিদ মেরামতের উদ্দেশ্যে কিছু ইট ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু কোনো কারণবশত এখন মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব মসজিদ কমিটি চাচ্ছে ইটগুলো বিক্রি করে দিতে। প্রশ্ন হলো, মসজিদের জন্য ক্রয়কৃত উক্ত ইট বিক্রি করা যাবে কি না?

উত্তর : যেহেতু উক্ত ইটগুলো মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত নয়; বরং মসজিদের জন্য ক্রয় করা হয়েছে। তাই এখন ইটগুলো মসজিদের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব না হওয়ায় মসজিদের প্রয়োজনে সেগুলো বিক্রি করা জায়েয হবে।– আলবাহরুর রায়েক ৫/২০৭, রদ্দুল মুহতার ৬/৫৭৪, ফাতহুল কাদীর ৬/২২৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২১/৪৭৮।

প্রশ্ন ৪১২ : মসজিদে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করার হুকুম কি?

উত্তর : মসজিদে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপচয় এবং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।– সূরা আ'রাফ; আয়াত ৩১, সূরা বনী ইসরাঈল; আয়াত ২৭, গময়ু উয়ূনিল বাসায়ের শরহু আশবাহ ওয়ান নাযায়ের; পৃষ্ঠা ৫৬১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/৪৮৩, তানকীহুল ফাতাওয়া আলহামিদিয়্যা ২/৩২৬ (ফাতাওয়া মাহমূদিয়ার হাওয়ালায়), ফাতাওয়া উসমানী ১/১১৪, ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/৭৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৮২, ফাতাওয়া রশীদিয়া ১/২৪৪।

প্রশ্ন ৪১৩ : যদি কোনো মসজিদের একপার্শ্ব বৃদ্ধি করা হয় তাহলে মিহরাব স্থানান্তর করা যাবে কি না?

উত্তর : মিহরাব মসজিদের একদম মাঝে এমনভাবে হতে হবে, যাতে ইমামের উভয় দিকে সমপরিমাণ জায়গা থাকে। সুতরাং যখন মসজিদ একপার্শ্বে বৃদ্ধি করা হবে তখন মিহরাবও মাঝে আনতে হবে।– রদ্দুল মুহতার ২/৪১৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২১/৩৮২।

প্রশ্ন ৪১৪ : মসজিদের মাইক দ্বারা হারানো বিজ্ঞপ্তি বা কোনো শোক সংবাদ অথবা অন্য কোনো ই'লান দেওয়া ঠিক হবে কি না?

উত্তর : মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত মাইক দ্বারা দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে তথা হারানো বিজ্ঞপ্তি, শোক সংবাদ বা অন্য কোনো ধরনের ই'লান করা জায়েয নেই। তবে যদি দাতা ওয়াকফ করার সময় মসজিদের কাজের সাথে সাথে অন্যান্য বৈধ কাজেরও অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে এ সকল ক্ষেত্রেও উক্ত মাইক ব্যবহার করা জায়েয হবে।– আদদুররুল মুখতার ৬/৬৪৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪৬৩, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ২/১১৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/৩৯৯।

প্রশ্ন ৪১৫ : মসজিদে অনেক সময় এমন কিছু কিতাব রাখা থাকে যা কেউ ব্যবহার করে না। ঐ সকল কিতাব কেউ নিয়ে আসতে পারবে কি না?

উত্তর : মসজিদে ওয়াকফকৃত কিতাব দ্বারা মসজিদে থাকাবস্থায় উপকৃত হওয়া জায়েয আছে। তবে ঐ কিতাব নিজের মালিকানায় নিয়ে যাওয়া, পরিবর্তন করা কিংবা মসজিদ থেকে স্থানান্তর করা জায়েয নেই।– রদ্দুল মুহতার ৪/৩৬৫, আলহিদায়া ২/৬৪০, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৪০৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/১১৩, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/৮১।

প্রশ্ন ৪১৬ : মসজিদের আসবাবপত্র ধার নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : সাধারণত মসজিদের আসবাবপত্র মসজিদের জন্য ওয়াকফ হয়ে থাকে। তাই সেগুলো ধার নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তবে যদি ওয়াকফকারী এরূপ নিয়ত করে থাকে তাহলে জায়েয হবে।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১১০, আদদুররুল মুখতার ৬/৫৩৯, রদ্দুল মুহতার ৬/৫৩৯, আলবাহরুর রায়েক ৫/৪২০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/১৪২, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৩/৪৮৬।

প্রশ্ন ৪১৭ : আমাদের কবরস্থানে বড়ো বড়ো গাছ রয়েছে। সেগুলো বিক্রি করে এর মূল্য কবরস্থানের উন্নয়নের জন্য যদি ব্যয় করা হয় তাহলে শরঈ বিধান মতে এটা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কবরস্থানটি যদি ওয়াকফকৃত হয় তাহলে গাছ বিক্রি করে এর মূল্য কবরস্থানের উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করতে পারবে। আর যদি ওয়াকফকৃত না হয় তাহলে করবস্থানটির মালিক যারা তারাই গাছগুলোর মালিক হবে। সুতরাং তারা যদি কবরস্থানের উন্নয়নে ব্যবহার করতে চান তাহলে ব্যবহার করতে পারবেন।– ফাতাওয়া আলমগীরী ২/৪৭৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪১৯, আলবাহরুর রায়েক ৫/৩৪১, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/৬৩।

প্রশ্ন ৪১৮ : কবরস্থানের গাছের ফল খাওয়া যাবে কি না? যদি খাওয়া না যায় তবে তা কি করতে হবে?

উত্তর : কবরস্থানের জায়গা যদি ওয়াকফকৃত হয় তবে সে ফল বিক্রি করে কবরস্থানের প্রয়োজনে তার মূল্য ব্যয় করবে, নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করবে না এবং নিজেও তা

খাবে না। আর যদি জমি ওয়াকফকৃত না হয় তাহলে জমির মালিক সে ফল দ্বারা নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারবে।– রদ্দুল মুহতার ৪/৪৩৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩/৩১০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৩/৩৩৩, ৩৩৪।

প্রশ্ন ৪১৯ : মসজিদে রাত্রি যাপন করা এবং আহার করার শরঈ বিধান কি? এবং মসজিদ কি শুধু নামাযের জন্যই নির্ধারিত?

উত্তর : মসজিদ আল্লাহর ঘর। এখানে খাওয়া ও ঘুমানো মাকরূহ। তবে যদি এমন মুসাফির হয় যার থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই অথবা কেউ ই'তিকাফ করে তবে এদের জন্য মসজিদে খাওয়া ও ঘুমানোর অনুমতি রয়েছে। তেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি নফল ই'তিকাফের নিয়ত করে এবং মসজিদে ইবাদাত-বন্দেগী করার ইচ্ছা করে তাহলে তার জন্যেও মসজিদে খাওয়া ও ঘুমানো জায়েয আছে।

উল্লেখ্য, মসজিদ শুধু নামাযের জন্য নির্ধারিত নয়। বরং মসজিদ মুসলমানদের মূল কেন্দ্র হওয়ায় এখানে নামায ছাড়াও ওয়াজ-নসিহত, ঈমান-আমল বিষয়ক আলোচনা পর্যালোচনা ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা সবই করা যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে বয়ান-আলোচনা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, বিচার-আচার, বিবাহ-শাদীসহ রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রম মসজিদ থেকেই আঞ্জাম দেওয়া হত।– সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৩৫, ১৩৩, ৪২৩, ৪২১, ৪৪১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২১, রদ্দুল মুহতার ২/৪৩৫, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫/১৭৩, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪৫৬।

প্রশ্ন ৪২০ : এক মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত জায়গা অন্য মসজিদের জন্য ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না? উল্লেখ্য, ওয়াকফকৃত জমি উক্ত মসজিদের জন্য প্রয়োজন নেই।

উত্তর : মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত জমি যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত হয় তাহলে তা অন্য মসজিদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা জায়েয আছে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, উক্ত জমি বর্তমান বা ভবিষ্যতে কখনো প্রয়োজন হয় কি না। যদি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় তাহলে অন্য মসজিদের জন্য ব্যবহার করা জায়েয হবে না।– রদ্দুল মুহতার ৪/৩৫৯, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলাদ দুর ২/৫৩৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/৮৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২১/১৪৮।

প্রশ্ন ৪২১ : অতি পুরাতন কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করার বিধান কি?

উত্তর : অনেক দিনের পুরাতন কবর যদি এমন হয় যে, তার মধ্যে মৃত ব্যক্তির লাশ একদম মাটি হয়ে গেছে তবে এমন কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয আছে।– রদ্দুল মুহতার ৩/১৩৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/৮৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৩/৩৩১।

প্রশ্ন ৪২২ : আমাদের দক্ষিণ পাইকপাড়া মুফতী মসজিদে প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক গাশ্‌ত (ঈমান ও আমলের মেহনত হয়, মাগরিব বাদ বয়ান হয়) এবং দৈনিক বাদ ঈশা ইজতিমাঈ তা'লীম দীর্ঘদিন যাবত চলে আসছে। গত শুক্রবার (২৬/০৪/২০১৩ইং তারিখে) মসজিদের দক্ষিণ পশ্চিম কর্নারে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত আদায়েরও কিছুক্ষণ পর ঈমান আমলের মেহনত সম্পর্কে বয়ান শুরু হয়। যেখানে ৪০/৫০ জন মুসল্লী বয়ান শুনছিলেন। এ সময় মসজিদের অন্য পার্শ্বে ২/১ জন মুসল্লী ভাই উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে এক মুসল্লী ভাই নফল নামায আদায় করার জন্য বয়ান বন্ধ করতে বললে বয়ানকারী নীচু আওয়াজে বয়ান করতে থাকেন। এরপরও উক্ত মুসল্লী ভাই বয়ান বন্ধ রাখতে বললে পরস্পরে বাদানুবাদ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন বর্ণিত মাসআলাসমূহের সমাধান জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

১. দা'ওয়াত ও তাবলীগের মেহনত কুরআন-হাদীসের আলোকে হক্ব কি না?

২. মসজিদ কি শুধু নামাযের জন্য না কি সেখানে ঈমানী মুযাকারা, দা'ওয়াত, তা'লীম, বয়ান ও মসজিদ আবাদের মেহনত করতে পারবে? কেউ কেউ বলেন, মসজিদে শুধু নামাযই হবে। অন্য আমল মূল মসজিদের বাহিরে করবে। এ সম্পর্কে শরীয়তের মাসআলা কি ও যারা বলে তাদের জন্য উত্তর কি?

৩. যদি মসজিদে কোনো ইজতিমাঈ আমল চলে তখন ইনফিরাদী আমলের গুরুত্ব বেশি, না ইজতিমাঈ আমলের গুরুত্ব বেশি। এ অবস্থায় করণীয় কি? দু'টোই চলতে পারে কি না?

৪. মসজিদের এক পার্শ্বে দা'ওয়াত ও তাবলীগের (তা'লীম, বয়ান) ইজতিমাঈ আমল চলে। সে সময় অন্য পার্শ্বে ২/১ জন ইনফিরাদী আমল করে এবং তাদেরকে কোনো নিষেধ না করা সত্ত্বেও তারা যদি ইজতিমাঈ আমল বন্ধ করতে বলে কিংবা মূল মসজিদের বাইরে গিয়ে আমল করতে বলে। এদিকে দীর্ঘদিন যাবত চালু থাকা আমল মূল মসজিদের ভিতরে করার জন্য আমলে অংশগ্রহণকারী মুসল্লী ভাইয়েরা ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে ক্ষেত্রে শরীয়তের আলোকে কার অধিকার কতটুকু এবং তাদের করণীয় কি?

উত্তর :

১. নিজে দীনের উপর আমল করা এবং নিজ পরিবারসহ অন্যকেও দীনের প্রতি দা'ওয়াত দেওয়া ও তাদের নিকট দীনের তাবলীগ ও প্রচার-প্রসার করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আর এর জন্য প্রচলিত দা'ওয়াত ও তাবীলগ একটি সহজ ও কার্যকরী মাধ্যম। এটা নিঃসন্দেহে হক ও সঠিক পন্থা।– সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১১০, সূরা ইউসুফ; আয়াত ১০৮, সূরা হা-মীম সিজদাহ; আয়াত ২৩, সূরা তাহরীম; আয়াত ৬, সহীহ বুখারী; হাদীস ৭০৭৮, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২১৬৯, ইমাম জাস্‌সাস কৃত আহকামুল কুরআন (মাকতাবায়ে শামেলা সংস্করণ) ২/৩১৫, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪৪১।

২. মসজিদ শুধু নামাযের জন্য নির্ধারিত নয়; বরং মসজিদ যেহেতু মুসলমানদের মূল মারকায সেহেতু সেখানে নামায ছাড়াও তা'লীম, ওয়াজ-নসীহত, ঈমানী ও ইলমী মুযাকারা সবই করা যাবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে তা'লীম, তাদরীস, বয়ান, ওয়াজ-নসীহত, বিচার-আচার, বিবাহ-শাদীসহ সকল রাষ্ট্রীয় কাজ মসজিদ থেকেই আঞ্জাম দেওয়া হতো। অতএব যারা মসজিদকে শুধু নামাযের সাথে নির্দিষ্ট করে এবং বাকী কাজগুলোকে মসজিদের বাইরে করতে বলে তাদের কর্মপদ্ধতি সুন্নাহ সম্মত নয়। তাদেরকে এ ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি ভালভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা উচিত। সাথে সাথে এ বিষয়টির প্রতিও খেয়াল রাখা উচিত যে, কেউ যদি কোনো ইবাদাতে মগ্ন হয়ে যায় তাহলে সেখানে এমন কিছু করা উচিত হবে না যা তার ইবাদাতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। এ বিষয়গুলোর প্রতি সকলের যত্নবান হওয়া জরুরি।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১৩৩, ৪২১, ৪২৩, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৯৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/৪৭।

৩. ও ৪. নফল নামাযের জন্য সর্বোত্তম স্থান হলো নিজ নিজ ঘর। একাধিক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায ঘরে পড়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এ জন্য নফল আদায়কারী উক্ত মুসল্লীর জন্য নিজ নামাযের স্বার্থে বয়ান বন্ধ রাখতে বলাটা উচিত হয় নি। কেননা ইনফিরাদী নামাযের চেয়ে ইজতিমাঈ নামায উত্তম। তদ্রূপ ইনফিরাদী নফল ইবাদাতের চেয়ে ইজতিমাঈ নফল ইবাদাত উত্তম। তবে উভয়টি একসাথেও চলতে পারে এভাবে যে, বয়ান নীচু স্বরে করবে আর নামাযী ব্যক্তি একটু দূরে নামায আদায় করবে। এটা নিয়ে পারস্পারিক ঝগড়া ও বাদানুবাদ কাম্য নয়।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১১৮৭, ৭২৯০, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৭৭৭, ৭৭৮, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ২২৯, আলমাতালিবুল আলিয়াহ (মাকতাবায়ে শামেলা সংস্করণ); হাদীস ৩০৯০, রদ্দুল মুহতার ২/৪১৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪৮৭।

মীরাস

প্রশ্ন ৪২৩ : বাবা যদি ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেয় তবে এ ছেলে বাবার মৃত্যুর পর কি তার থেকে মিরাস পাবে? অনুরূপ যাকে ত্যাজ্য করা হলো সে কি তার অন্যান্য ভাইদের থেকে মিরাস পাবে?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে পুত্রকে ত্যাজ্য করার কোনো বিধান নেই। সুতরাং বাবা ছেলেকে ত্যাজ্য করার দ্বারা ছেলে ত্যাজ্য হবে না; বরং সে বাবার মৃত্যুর পর তার

থেকে মিরাস পাবে। অনুরূপ সে অন্যান্য ভাইদের থেকেও মিরাস পাবে।– সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ২৭০৩, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৬/৪৫৪, সিরাজী; পৃষ্ঠা ৭, ১৪, রদ্দুল মুহতার ১০/৪৯২, ১১/৬৭৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/৫২৬, ৫৩১, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৩/৩০৪।

প্রশ্ন ৪২৪ : জনাব সমিরুদ্দীন সাহেবের একটি ব্যাংক একাউন্ট ছিল। তিনি জীবদ্দশায় তার স্ত্রীকে ব্যাংক একাউন্টের নমিনী বানিয়ে যান। প্রশ্ন হলো এই একাউন্টের টাকা কি মিরাস হিসেবে বন্টন হবে? নাকি এ টাকা স্ত্রী একাই পাবে?

উত্তর : মরহুম সমীরুদ্দীন সাহেবের ব্যাংক একাউন্টের জমাকৃত যাবতীয় অর্থ মরহুমের অন্যান্য ধন সম্পদের মতো ত্যাজ্য সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে এবং তার ওয়ারিসদের মাঝে ইসলামি আইন অনুযায়ী বন্টন হবে। নমিনী হওয়ার দ্বারা স্ত্রী ঐ টাকার একা মালিক হবে না।– সূরা নিসা; আয়াত ১১, আদদুররুল মুখতার ১০/৪৯৩, আল বাহরুর রায়েক ৮/৩৬৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৩/১৩০, ৩০/১৯৩।

প্রশ্ন ৪২৫ : যদি কোনো ব্যক্তির কয়েকজন সন্তান থাকে এবং তন্মধ্যে এক জন দরিদ্র হয় তাহলে কি তার জন্য তার সম্পদের কিছু অংশ উক্ত ছেলের নামে লিখে দেওয়া বৈধ হবে?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি জীবদ্দশায় সুস্থ অবস্থায় তার পূর্ণ বা আংশিক সম্পদ কোনো এক সন্তানের নামে লিখে দেয় এবং এর দ্বারা কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা উদ্দেশ্য না হয় তাহলে জায়েয আছে। আর যদি কোনো ওয়ারিসকে ক্ষতিগ্রস্ত করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে গোনাহগার হবে। তবে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তার এই হেবা বাস্তবায়িত হবে।– আদদুররুল মুখতার ৮/৫০১, ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ৬/২৩৭, আলবাহরুর রায়েক ৭/৪৯০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/৩৮৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/৪৪০।

বিবিধ

প্রশ্ন ৪২৬ : মক্কা বিজয়ের সময় যে সকল কাফেরের ব্যাপারে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়েছিল তাদের সবাইকে কি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল? না কি কাউকে হত্যা করা হয়েছিল? যদি কাউকে হত্যা করা হয়ে থাকে তবে তাদের নাম কি দলীলসহ জানতে আগ্রহী।

উত্তর : মক্কা বিজয়ের সময় যে সকল কাফেরকে ক্ষমার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল তারা সংখ্যায় ছিল ১৪ জন মতান্তরে ১৫ জন। তারা হলো, (১) আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল, (২) ফারতানা, (৩) কারীনা (এরা দু'জন ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে খাতালের বাঁদী), (৪) সারাহ, (৫) হুওয়াইরিস ইবনে নুকাইদ, (৬) মিকয়াস ইবনে ছুবাবা, (৭) আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবী সারাহ, (৮) ইকরামা ইবনে আবী জাহল, (৯) হাব্বার ইবনে আসওয়াদ, (১০) কা'ব ইবনে যুহাইর, (১১) ওয়াহশী ইবনে হারব,

(১২) হারিস ইবনে তুলাতিল, (১৩) আব্দুল্লাহ ইবনে যিবা'রা, (১৪) হুবাইরা ইবনে আবী ওয়াহাব, (১৫) হিন্দ বিনতে উতবা।

এদের মধ্য থেকে শুধু ছয় জনকে হত্যা করা হয়। তারা হলো, (১) আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল, (২) আব্দুল্লাহর দুই বাঁদী থেকে এক জন, (৩) সারাহ (এর সম্পর্কে ভিন্নমতও রয়েছে), (৪) হুয়াইরিস ইবনে নুকাইদ, (৫) মিকয়াস ইবনে ছুবাবা, (৬) হারিস ইবনে তুলাতিল।– ফাতহুল বারী ৭/৬৪৮, সীরাতে ইবনে কাসীর (মাকতাবাতুশ শামেলা সংস্করণ) ৩/৪৬৩, আল্লামা ইদরীস কান্দলবী কৃত সীরাতুল মুসতফা ৩/১০০৫।

প্রশ্ন ৪২৭ : কবর বা সমাধিতে ফুল দেয়ার বিধান কি?

উত্তর : কবর বা সমাধিতে ফুল দেয়া ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয নেই।– সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৯৯১, সুনানে নাসাঈ; হাদীস ১৯০৫, সারাখসী কৃত আলমাবসূত ১/২৮৭, ২/৫৫, রদ্দুল মুহতার ৩/৮৯, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৫৭০, আলবাহরুর রায়েক ২/১৭৭, ফয়যুল বারী ১/৪৫৮, ইমদাদুল আহকাম ২/৪৩০, ফাতাওয়া রশীদিয়া ১/৩৯৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১২৩।

প্রশ্ন ৪২৮ : গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় অনেকে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর লোটায় করে কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয় এবং ধারণা করে, হয়তো এতে মৃত ব্যক্তি ঠাণ্ডা অনুভব করবে। এরূপ ধারণা করে কবরে পানি ছিটানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কবরে পানি ছিটিয়ে দিলে মৃত ব্যক্তি শীতলতা লাভ করবে এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। এরূপ ধারণা লালন করে কবরে পানি ছিটানো জায়েয নেই। তবে কবরে ঝুরা মাটিকে জমাটবদ্ধ করার উদ্দেশে যদি পানি ছিটানো হয় তাহলে জায়েয হবে।– সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ১৫৫১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৬, আলবাহরুর রায়েক ২/৩৪০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/২৮৮।

প্রশ্ন ৪২৯ : ইসলামে দাঁড়িয়ে পেশাব করার হুকুম কি?

উত্তর : ইসলাম নাপাক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছে এবং পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচার জোর তাগিদ দিয়েছে। কেননা অধিকাংশ কবরের আযাব পেশাবের ছিটা থেকে না বাঁচার কারণে হয়ে থাকে। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে পেশাব করাকে মাকরূহ বলেছেন। তবে যদি কোনো ওযরের কারণে বসে পেশাব করা সম্ভব না হয় তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয আছে।– সহীহ বুখারী; হাদীস ২১৮, রদ্দুল মুহতার ১/৫৫৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৯৩।

প্রশ্ন ৪৩০ : গ্রামাঞ্চলে গোবর দ্বারা ঘর, উঠান লেপা হয়। এতে কি ঘর, উঠান নাপাক হয়ে যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, গোবর দিয়ে লেপা ঘর বা উঠান নাপাক হয়ে যাবে। তবে যখন উক্ত ঘর বা উঠান শুকিয়ে যাবে এবং নাপাকির চিহ্ন দূর হয়ে যাবে তখন তা পাক হয়ে যাবে।–

ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৪৭, ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৬, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১৬৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৪/৫১, ৮/৩৩১, ২৭/২৫৪।

প্রশ্ন ৪৩১ : খতনা করানোর হুকুম কি? যদি কোনো ব্যক্তি খতনা না করেই বালেগ হয়ে যায় তাহলে এখন তার করণীয় কি?

উত্তর : খতনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এবং ইসলামের একটি অন্যতম নিদর্শন। প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেলেও খতনা করতে হবে।– আদদুররুল মুখতার ৬/৭৫১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৭, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/২০৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪৬৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/১৭৩।

প্রশ্ন ৪৩২ : গায়রুল্লাহর নামে যিকির করা জায়েয আছে কি না? যদি কেউ করে তবে তার হুকুম কি?

উত্তর : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যিকির করা জায়েয নেই। আর যিকিরকারী যিকির করার সময় যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ ছাড়া যার নামে যিকির করছি সে হাযির নাযির বা সে সমস্ত বিষয়ের পরিচালক তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। আর যদি তার এমন বিশ্বাস না-ও থাকে তথাপি এটা বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিরক। তাই এমন কাজ থেকে বিরত হয়ে তওবা করা জরুরি।– ফাতাওয়া বায্যাযিয়া আলাল হিন্দিয়া ৬/৩২৬, আলবাহরুর রায়েক ২/৫২০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৩/১১৪, ফাতাওয়া রশীদিয়া ১/৫১।

প্রশ্ন ৪৩৩ : বর্তমানে দেখা যায়, অনেকেই হিন্দুদেরকেও শহীদ বলে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে হিন্দুরাও কি শহীদ হতে পারে?

উত্তর : শরীয়ত গৃহীত শহীদ হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। সুতরাং হিন্দু কখনো শহীদ হতে পারে না।– রদ্দুল মুহতার ৩/১৫৮, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলাদ দুর ১/৩৮৪, আলবাহরুর রায়েক ২/৩৪৪, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৬৮, আলফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবা'আ ১/৪৯৯, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ২৬/২৭২।

প্রশ্ন ৪৩৪ : আমরা জানি যে, হাদীসে দাড়ি রাখার নির্দেশ এসেছে। তাই দাড়ি রাখা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু দাড়ি কমপক্ষে এক মুষ্টি রাখতে হবে, এর ভিতরে হলে কাটা যাবে না, এক মুষ্টির বেশি হলে কাটা যাবে। এটা কোনো শরঈ দলীল দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : একাধিক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি লম্বা করার এবং গোঁফ খাটো করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সকল হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দাড়ি ছাঁটা অথবা মুণ্ডানো যাবে না। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. (যিনি দাড়ি লম্বা করা সংক্রান্ত হাদীসের অন্যতম রাবী) এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলতেন যা সহীহ সনদে প্রমাণিত এবং কোনো সাহাবী রাযি. তার এ কাজকে অপছন্দ করেছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এটা এ কথা প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কেরাম

রাযি. সকলে এ ব্যাপারে একমত যে, দাড়ির সর্বনিম্ন পরিমাণ এক মুষ্টি। ফলে পূর্ববর্তী সকল আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও ফুকাহায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন যে, দাড়ির সর্বনিম্ন পরিমাণ এক মুষ্টি, এর চেয়ে কম রাখা জায়েয নেই। যারা জায়েয বলেন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে নিজেদের মতের পক্ষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কেরামের কথা বা আমলের দ্বারা দলীল পেশ করা।– সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৮৯২, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৫৯, ২৬০, কিতাবুল আসার ২/৮৫৭, আদদুররুল মুখতার ৩/৩৯৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২২০, ২২৩, ইমদাদুল আহকাম ৪/৩৪৬।

প্রশ্ন ৪৩৫ : যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো সম্পদ তার অগোচরে আত্মসাত করে এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে সেই মাল ঐ ব্যক্তির মালের সাথে মিশিয়ে চলে আসে তাহলে সে কি দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে? উল্লেখ্য, সে লজ্জায় মালিককে তা জানায় নি।

উত্তর : অন্যায়ভাবে যে কোনো পন্থায় কারো মাল-সম্পদ দখল করা হারাম। উক্ত মাল বা তার মূল্য মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া জরুরি। তবে মালিককে জানিয়ে ফেরত দেওয়া জরুরি নয়, যে কোনো ভাবে মালিকের মালিকানায় পৌঁছে দিলেই সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। যদিও মালিক এ ব্যাপারে কিছুই না জানে।– সূরা নিসা; আয়াত ৪৯, আদদুররুল মুখতার ৯/২৬৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৬/৪৮১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৪৪৪, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/৩৯৪।

প্রশ্ন ৪৩৬ : পুরুষের জন্য লাল কাপড় পরিধানের হুকুম কি?

উত্তর : পুরুষের জন্য লাল এবং জাফরান রংয়ের কাপড় পরিধান করা মাকরূহ। তবে লাল ডোরা কাটা কাপড় পরিধানের অনুমতি আছে।– সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৬০১, আদদুররুল মুখতার ৬/৩৫৮, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/১১২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/৪২৩।

প্রশ্ন ৪৩৭ : কোনো ভণ্ড পীরের বিরিয়ানী খাওয়া জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে কেন?

উত্তর : যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, খাবারের ভিতর কোনো ধরনের নাপাক বা হারাম বস্তু মিলানো হয়নি তবে তা খাওয়া জায়েয। কিন্তু বর্তমান ভণ্ড পীরদের আস্তানায় যে খাবার পরিবেশন করা হয় তা সন্দেহমুক্ত নয়। কারণ বিশ্বস্ত সূত্র মতে অনেক পীরের আস্তানার পরিবেশিত খাবারে পীর সাহেবের মলমূত্রসহ পঞ্চরস প্রদান করা হয়। অনুরূপ বাবার নামে জবাই করা জন্তুর গোস্ত পরিবেশন করা হয়। তাই এসব আস্তানার খাবার হতে বেঁচে থাকা আবশ্যক।– সূরা আন'আম; আয়াত ১২১, সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৮২৬, রদ্দুল মুহতার ৯/৪৩০, ফাতাওয়া রশীদিয়া ১/২০২।

প্রশ্ন ৪৩৮ : কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীকে ঋণ দিয়ে তার থেকে সুদ নেয় এভাবে যে, স্ত্রী বলে অমুক থেকে টাকা এনেছি তাকে সুদ দিতে হবে। অথচ স্ত্রী নিজেই সুদ নিয়ে

থাকে। কিন্তু স্ত্রী পরবর্তীতে ঐ সুদের টাকা স্বামীকে দিয়ে দেয়। এভাবে সুদ গ্রহণের হুকুম কি?

উত্তর : সুদ গ্রহণ করা সকলের জন্য হারাম। এটা কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদী কারবারে জড়িত সকলের উপর লা'নত করেছেন। সুতরাং যে স্ত্রী নিজ স্বামীর প্রতি এতই দয়ালু যে, নিজের সম্পদ স্বামীকে দিয়ে সহযোগিতা করে, তার জন্য এমনটি জায়েয নয় যে, সে স্বামীর প্রতি নিজের অধিক দয়া প্রদর্শনের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সুদী কারবারে লিপ্ত হয়ে দু'টি হারাম কাজে লিপ্ত হবে। বরং সে যদি নিজ স্বামীকে অর্থের দ্বারা সহায়তা করতেই চায় তাহলে নিজের হালাল অর্থের দ্বারাই স্বামীকে সহায়তা করবে।– সূরা বাকারা; আয়াত ২৭৫, ২৭৮, সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১২৯, সহীহ বুখারী; হাদীস ২০৮৬, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৫৯৮।

প্রশ্ন ৪৩৯ : মহিলাদের জন্য মুরিদ হওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হক্কানী পীরের নিকট বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে সংশোধন করা। তাই ইসলাহের জন্য কোনো হক্কানী পীরের নিকট মুরিদ হওয়া পুরুষের মতো মহিলাদের জন্যও জায়েয আছে। তবে এক্ষেত্রে শরঈ পর্দার বিধানকে পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। পীরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা যাবে না। এমনকি পীরের সাথে কথাও বলবে না; বরং মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে নিজের অবস্থা পীরকে জানাবে।– সূরা মুমতাহিনা; আয়াত ১২, সূরা ফাতহ; আয়াত ১০, সহীহ বুখারী; হাদীস ২৭১৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬/২৮২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/২৪৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/২২৫।

প্রশ্ন ৪৪০ : ফুটবল খেলা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : যদি কেউ ব্যায়াম, জিহাদের প্রস্তুতি বা সুস্থতাকে অটুট রাখার জন্য ফুটবল খেলে তবে তা জায়েয আছে। তবে এক্ষেত্রে সতর ঢেকে রাখা এবং শরীয়তের অন্যান্য বিধিবিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আর যদি একে পেশা বানিয়ে নেয় কিংবা শিরোপা জয়ের উদ্দেশে খেলে তাহলে এ খেলার অনুমতি নেই।– আদদুররুল মুখতার ৬/৪০৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৯/২৭০।

প্রশ্ন ৪৪১ : বালেগা মেয়ের মাথার চুল কাটার হুকুম কি?

উত্তর : বালেগা মেয়ের মাথার চুল কাটা জায়েয নেই। ফিকহের কিতাবে এ ধরনের মহিলাদেরকে পাপী ও অভিশপ্ত বলা হয়েছে। কাজেই কোনো মুসলিম নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চুল ছোটো করা জায়েয নেই। তবে মহিলাদের চুল যদি এতো বড়ো হয় যে, কোমরের নীচে চলে যায় বা বড়ো হওয়ার দরুন দৃষ্টিকটু মনে হয় তাহলে কোমরের নীচের বড়ো চুল কাটা যাবে।– সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৮৮৫, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪০৩১, আদদুররুল মুখতার ৬/৪০৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/১৬০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/৪৬৪।

প্রশ্ন ৪৪২ : বাজি ধরা ব্যতীত কেরামবোর্ড খেলা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : যদি হার-জিত থাকে অথবা শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘনের আশংকা থাকে কিংবা বাজি ধরা হয় তাহলে কেরামবোর্ড খেলা সম্পূর্ণ নাজায়েয। কেননা এতে দুনিয়া ও আখিরাতের কোনো উপকারিতা নেই। তবে হার-জিত ইত্যাদি ছাড়া হঠাৎ দু' এক বার যদি অল্প সময় মনকে প্রফুল্ল করার জন্য খেলা হয় তাহলে এতে গোনাহ হবে না।– সূরা লুকমান; আয়াত , সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ২৫১৩, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬০, আলবাহরুর রায়েক ৯/৩৮০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪৩৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৯/২৭৫, কিফায়াতুল মুফতী ৯/২০৪।

প্রশ্ন ৪৪৩ : কাঁচা পিঁয়াজ খাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মূলতঃ কাঁচা পিঁয়াজ খাওয়া হারাম নয়। কেউ যদি কাঁচা পিঁয়াজ খেতে চায় তাহলে তা খেতে পারবে। তবে খাওয়ার পর ভাল করে মুখ ধৌত করবে, যাতে করে মুখ থেকে পিঁয়াজের গন্ধ না আসে। কেননা এতে ফেরেশতা ও অন্যান্য মানুষের কষ্ট হয়। আর এ জন্যই পিঁয়াজ খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।– সহীহ বুখারী; হাদীস ৮৫৫, রদ্দুল মুহতার ১/৬৬১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/৪৫।

প্রশ্ন ৪৪৪ : কাঁচা ডিম খাওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি না?

উত্তর : হালাল বস্তু যেভাবেই খাওয়া হোক সেটা যদি তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয় তাহলে তা খাওয়া হালাল। তাই কেউ যদি কাঁচা ডিম খেতে পারে এবং সেটা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।– ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৪০, খানে পীনে কী হালাল আওর হারাম চীযেঁ; পৃষ্ঠা ৩৬, ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ২/৪২৪।

প্রশ্ন ৪৪৫ : হিন্দু শিক্ষককে রক্ত দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : যদি রক্তের অভাবে কারো জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয় তাহলে তাকে রক্ত দেওয়া জায়েয। চাই সে হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক। এক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দুর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।– ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৩৭, ৩৫৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/৩২০, জাওয়াহিরুল ফিকহ ২/৪০, আপকে মাসাইল আওর উনকা হক ৯/১৭৬।

প্রশ্ন ৪৪৬ : পুরুষ, মহিলার জন্য লোহার আংটি ব্যবহারের বিধান কি?

উত্তর : পুরুষ, মহিলা সবার জন্য লোহার আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ।– রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬০, ফাতাওয়া হিন্দিয় ৫/৩৩৫, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪১০।

প্রশ্ন ৪৪৭ : বিড়ি, সিগারেট, পান, সুপারি, জর্দা ইত্যাদি খাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : পানের সঙ্গে জর্দা খাওয়া জায়েয আছে। তবে এর অভ্যাস না করা ভাল। কারণ অভ্যাস করার পর সময় মতো না পাওয়ার ক্ষেত্রে পেরেশানীর কারণ হয়। আর বিড়ি সিগারেটে যদি নাপাকি বা নেশা জাতীয় দ্রব্য থাকে তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর যদি তা না থাকে তাহলেও তা বর্জনীয়। কারণ বিড়ি সিগারেট পান করার দ্বারা শরীরে বিভিন্ন ধরনের ব্যাধি সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে কতক এমন যা মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। যেমন, ক্যান্সার, যক্ষা ইত্যাদি। আর মুখে, শরীরে এমন কি তার কাপড়ে পর্যন্ত এমন দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় যা অন্যের জন্য সীমাহীন কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর অন্যকে কষ্ট দেওয়া হারাম। তাছাড়া এর দ্বারা অনেক অর্থেরও অপচয় হয় যা শরীয়তে নিষেধ। সুতরাং এসব অসুবিধার কারণে ধূমপান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত। – সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৫৮৫, রদ্দুল মুহতার ১/৬৬১, ৬/৪৫৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/১৫০, ২২০, ২৩৪, ২৪৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১১৬।

প্রশ্ন ৪৪৮ : আমরা শুনে থাকি পান জর্দা খাওয়া জায়েয আছে। কিন্তু বিড়ি সিগারেট খাওয়া জায়েয নেই কেন?

উত্তর : বিড়ি সিগারেট খাওয়া জায়েজ নেই। তার কারণ হলো, পান, জর্দা এবং বিড়ি, সিগারেটের মধ্যে পার্থক্য আছে, আর তা হলো, জর্দা এবং সিগারেটের উপকরণ এক হলেও পানসহ অন্যান্য জিনিসের সংশ্লিষ্টতার কারণে জর্দার প্রতিক্রিয়া ক্ষীণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সিগারেটের ক্ষেত্রে অন্য জিনিসের সংমিশ্রণ না থাকার ফলে তার প্রতিক্রিয়াটা তুলনামূলক বেশি হয়ে থাকে। পান জর্দা পরিপাকতন্ত্র এবং মুখের দুর্গন্ধ লাঘবের জন্য উপকারী। পক্ষান্তরে বিড়ি সিগারেটে কোনো উপকারিতা নেই। উপরন্তু তাতে রয়েছে ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধির সমূহ উপকরণ। এসব পার্থক্যের কারণে পান জর্দা এবং বিড়ি সিগারেটের ক্ষেত্রে জায়েয নাজায়েয ব্যবধান হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও জর্দা পরিহার করা উত্তম।– সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৫৮৫, রদ্দুল মুহতার ১/৬৬১, ৬/৪৫৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/১৫০, ২২০, ২৩৪, ২৪৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১১৬।

প্রশ্ন ৪৪৯ : হিন্দু বন্ধু বান্ধবদের সাথে একত্রে বসে খানা খাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : কোনো কাফের মুশরিক কোনো মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। বন্ধু-শত্রুতার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। কাউকে বন্ধু বানাতে হলে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তাকে বন্ধু বানাতে হবে। কারো সাথে শত্রুতা করতে হলেও একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির স্বার্থেই তার সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। কাফের মুশরিকরা হলো খোদাদ্রোহী সম্প্রদায়। এদের সাথে বন্ধুত্ব করা কখনো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হতে পারে না। তবে খোদার সৃষ্টি কিংবা প্রতিবেশি হিসেবে শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে যতোটুকু সদাচার তাদের প্রাপ্য ততটুকু সদাচরণ তাদের সাথে করতে হবে। এটাকে বন্ধুত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা কখনো জায়েয হবে না। সুতরাং শরঈ কোনো ওযর ছাড়া কোনো বিধর্মীর সাথে

একত্রে আহার করা মাকরূহ। তবে কোনো ওযর থাকলে এক দু'বার এরূপ হয়ে গেলে তাতে কোনো গোনাহ হবে না। পক্ষান্তরে তাদের সাথে আহার করাকে সার্বক্ষণিক স্বভাবে পরিণত করা মাকরূহে তাহরীমী। উল্লেখ্য, কাফেরকে মুসলমান বানানোর সদিচ্ছায় তার সাথে উঠা-বসা করা অনুরূপ তার সাথে বসে হালাল খাবার খাওয়া জায়েয আছে।– সূরা মায়েদা; আয়াত ৫১, সূরা মুমতাহিনা; আয়াত ১, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩০৯৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৪৬, ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ৬/৩৫৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/৬০।

প্রশ্ন ৪৫০ : পুরাতন কুরআন শরীফ যা পড়ার অযোগ্য হয়ে গেছে সেগুলো হিফাযত করার পদ্ধতি কি হতে পারে?

উত্তর : পুরাতন কুরআন শরীফ যেগুলো পড়ার অযোগ্য হয়ে গেছে সেগুলো হিফাযত করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো কোনো পবিত্র কাপড়ে পেঁচিয়ে কবর খনন করে তাতে দাফন করে দেওয়া। তবে কেউ যদি কোনো বড়ো পুকুর বা সমুদ্রে কাপড়ের মধ্যে পেঁচিয়ে এভাবে ডুবিয়ে দেয় যে সেটা পানির তলদেশে চলে যায় তহলে তা জায়েয আছে।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৩, রদ্দুল মুহতার ১/১৭৭, ৬/৪২২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৭/১৩৭, খাইরুল ফাতাওয়া ১/২১২।

প্রশ্ন ৪৫১ : পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করার হুকুম কি?

উত্তর : কোনো পোশাক যদি খাঁটি রেশমী কাপড়ের হয় কিংবা কাপড়ের প্রস্থ সুতা রেশমের হয় তাহলে তা পুরুষের জন্য পরিধান করা জায়েয নেই। পক্ষান্তরে যদি কাপড়ের দৈর্ঘ্য সুতা রেশমের হয় এবং প্রস্থ সুতা অন্য সুতার হয় তাহলে তা পুরুষের জন্য পরিধান করা জায়েয আছে। তবে যুদ্ধের ময়দানে এবং চিকিৎসার জন্য কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াই রেশমী কাপড়ের পোশাক পরিধান করা জায়েয আছে।– আদদুররুল মুখতার ৬/৩৫১, আলবাহরুর রায়েক ৯/৩৪৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/৪২১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১২৭।

প্রশ্ন ৪৫২ : 'যে ব্যক্তি তোমার সামনে তোমার প্রশংসা করবে তুমি তার মুখে থুথু মেরে দিবে' -এ কথাটি কতটুকু সত্য?

উত্তর : 'যে ব্যক্তি তোমার সামনে তোমার প্রশংসা করবে তুমি তার মুখে থুথু মেরে দিবে' -এ কথাটির প্রমাণ কুরআন হাদীসের কোথাও পাওয়া যায় নি। তবে যেটুকু পাওয়া যায় তাহলো, যখন তোমরা কোনো প্রশংসাকারীদের দেখবে তখন তোমরা তাদের মুখের উপর মাটি ছিটিয়ে দেবে বা নিক্ষেপ করবে।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, একে অপরের সামনে প্রশংসা করা মাকরূহ। কেননা প্রশংসাকারী প্রশংসা করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং প্রশংসিত ব্যক্তির মাঝে অধিকাংশ সময় অহংকার সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রশংসাকারী এবং প্রশংসিত ব্যক্তি উভয়ে যদি এ ধরনের ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে মাকরূহ নয়। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সম্মুখে তাদের প্রশংসা করেছেন।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১৮৯৭, ৩২৯৪, ৫৭৮৪, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৩০০২, ফাতহুল বারী ১০/৫৫৬, মিরকাতুল মাফাতীহ ৯/৬২, রিয়াযুস সালিহীন; পৃষ্ঠা ৪৪৮।

প্রশ্ন ৪৫৩ :

উত্তর : কুরআন শরীফ মুখস্থ করার পর ভুলে যাওয়া বা দেখে পড়তে সক্ষম হওয়ার পর অবহেলা বশত ভুলে যাওয়া উভয়টিই জঘন্যতম অপরাধ। এর শাস্তি সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, এমন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন কুষ্ঠরোগী হিসেবে উঠানো হবে। সুতরাং তওবা করে পুনরায় আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে।– সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৪৭৪, মুসনাদে বায্যার (মাকতাবায়ে শামেয়া সংস্করণ) ২/৫৬, মিরকাতুল মাফাতীহ ৫/৮১, ফাতাওয়া উসমানী ১/২২৫।

প্রশ্ন ৪৫৪ : গান গাওয়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার হুকুম কি?

উত্তর : গান বাজনা করা এবং এটাকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উভয়টিই নাজায়েয। সুতরাং এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থও হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে।– সূরা লুকমান; আয়াত ৬, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪৯২৭, রদ্দুল মুহতার ৫/৩৪৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪৫৯।

প্রশ্ন ৪৫৫ : 'কেউ যদি গিরগিটি এক আঘাতে হত্যা করে তাহলে তার একশত সওয়াব হবে আর দুই আঘাতে হত্যা করলে এর চেয়ে কম আর তিন আঘাতে হত্যা করলে এর চেয়ে কম সওয়াব হবে।' উল্লিখিত হাদীসটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর : আপনার শ্রুত হাদীসটি সহীহ। এটি মুসলিম শরীফে রয়েছে।– সহীহ মুসলিম; হাদীস ২২৪০, আলমু'জামুল ওয়াসীত; পৃষ্ঠা ১০২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/২০৫।

প্রশ্ন ৪৫৬ : কত বৎসর বয়সে খতনা করানো উচিত এবং খতনা করানোর উত্তম সময় কোনটি?

উত্তর : বালেগ হওয়ার পূর্বে সুবিধামতো সময়ে খতনা করিয়ে নেয়া উচিত। তবে ফুকাহায়ে কেরাম সাত থেকে নয় বৎসরের মধ্যে খতনা করানোকে উত্তম বলেছেন।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৭, আলবাহরুর রায়েক ৮/৩৫৯, রদ্দুল মুহতার ১০/৪৮১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/১৭২।

প্রশ্ন ৪৫৭ : কোনো সুদখোরের বাড়িতে দা'ওয়াত গ্রহণ করা এবং খাওয়া বৈধ আছে কি না?

উত্তর : দা'ওয়াত দাতার সব সম্পদ যদি নিশ্চিত হারাম হয় তবে তার দা'ওয়াত গ্রহণ করা হারাম। আর যদি অধিকাংশ সম্পদ হালাল হয় তবে দা'ওয়াত গ্রহণ করা বৈধ আছে। তবে যদি এ ক্ষেত্রেও দা'ওয়াত গ্রহণ না করলে তার ভিতরে সংশোধনী আসেবে বলে ধারণা হয় তাহলে দা'ওয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকাই উত্তম।–

ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪২, ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৪০০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৩৯২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/১২০।

প্রশ্ন ৪৫৮ : কেউ যদি কাকড়া আগুনে জ্বালিয়ে তা দিয়ে ঔষধ তৈরি করে তাহলে তা ব্যবহার করা ও খাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : কাকড়া যদি আগুনে জ্বালিয়ে কোনো ঔষধ তৈরি করা হয় তাহলে তা ব্যবহার করা বৈধ এবং সে ঔষধ খাওয়াও হালাল।– রদ্দুল মুহতার ১/৫১৯, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১৫৯, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী; পৃষ্ঠা ১৬৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/৩০০।

প্রশ্ন ৪৫৯ : পুরুষের জন্য রৌপ্য ব্যবহার জায়েয আছে কি না? জায়েয থাকলে তার পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর : পুরুষের জন্য আংটি হিসেবে ব্যবহারের জন্য সাড়ে চার মাশা (৪.৩৭৪ গ্রাম) পরিমাণ রৌপ্য ব্যবহার করার অনুমতি আছে। এর অধিক জায়েয নেই।– সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৪২২৩, সুনানে নাসাঈ; হাদীস ৫২১০, আদদুররুল মুখতার ৯/৫২০, রদ্দুল মুহতার ৯/৫২০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/৩৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৬৯।

প্রশ্ন ৪৬০ : আমি শুনেছি যে, যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন সূরা মুলক পাঠ করে তাহলে তার কবরের আযাব মাফ মরে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হয় তবুও কি তার কবরের আযাব মাফ হবে?

উত্তর : হাদীসের ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত, যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে সূরা মুলক পাঠ করবে তার জন্য এ সূরা সুপারিশ করবে। ফলে তাকে মাফ করে দেওয়া হবে। অন্য বর্ণনা মতে সূরা মুলক তার তিলাওয়াতকারীকে কবরের আযাব হতে মুক্তি দান করবে। এ সকল হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, সূরা মুলক পড়ার দ্বারা গোনাহগারের কবরের আযাবও আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন। তবে সূরা মুলক সুপারিশ করবে এই আশায় কারো গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। বরং গোনাহ করতে থাকলে ঈমান হারা হওয়ার আশংকা রয়েছে। আর আযাব বা শাস্তির বিষয়টি তো গোনাহের সাথে সম্পৃক্ত। কারো গোনাহ না হলে তো সে আযাব বা শাস্তিই পাবে না। আর ঈমান চলে গেলে কোনো আমলই তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না।– সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৮৯০, ২৮৯১, ২৮৯২, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৪০০।

প্রশ্ন ৪৬১ : শহর-বন্দরের মসজিদগুলোতে বাদ ফজর সম্মিলিতভাবে যে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করা হয় তার বিধান কি?

উত্তর : শহর, বন্দর, গ্রাম ও পল্লী এলাকার মসজিদগুলোতে বাদ ফজর সম্মিলিতভাবে যে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করা হয় তা যদি মুসল্লিদের শেখানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে এবং তা অন্যান্য ইবাদাতে তথা নামাযে লিপ্ত ব্যক্তিদের সমস্যা না

হয় তবে ইসলামী বিধান মতে তার অবকাশ রয়েছে। তবে নিয়মতান্ত্রিক প্রথা বানিয়ে নেয়া উচিত হবে না। কারণ এসব আমল একাকী এবং নিম্নস্বরে করাই বাঞ্ছনীয়।– সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৯২২, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/১২২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/৩০।

প্রশ্ন ৪৬২ : জনৈক ব্যক্তি একটি জাল শুকাতে দিয়েছে। হঠাৎ সে জালে পাখি আটকে গেল। এখন এ পাখির মালিক কে হবে? জালের মালিক না কি যে কেউ এটাকে ধরে নিয়ে এর মালিক হতে পারবে?

উত্তর : নিছক শুকানোর উদ্দেশে ছড়িয়ে দেওয়া জালে কোনো পাখি আটকে গেলে জালের মালিকই সে পাখির একচ্ছত্র মালিক হবে না; বরং যে কেউ এটাকে ধরে নিয়ে মালিক হতে পারবে।– আদদুররুল মুখতার ১০/৫৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪১৭।

প্রশ্ন ৪৬৩ : দাইয়ূস কাকে বলে এবং তার হুকুম কি?

উত্তর : ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন বাক্যে দাইয়ূসের সংজ্ঞা করেছেন, সব সংজ্ঞার মর্মার্থ একই। যেমন, ক. যে ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে মানুষের অবাধ যাতায়াত হলে কিংবা তার স্ত্রী বাহিরে যাতায়াত করলে তার আত্মসম্মানে বাধে না এবং এ ব্যাপারে তাকে নিষেধও করে না। খ. যে ব্যক্তি স্ত্রীর মাঝে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ দেখেও কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না এবং এ ব্যাপারে তাকে বাধা প্রদানও করে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিন ধরনের লোকের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, ১. মদ্যপ, ২. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান ও ৩. দাইয়ূস। উল্লেখ্য, 'জান্নাতে প্রবেশ করবে না' এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো, প্রথম বারে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, সাজা ভোগ করার পর প্রবেশ করতে পারবে।– মুসনাদে আহমদ; হাদীস ৬১১৩, মিরকাতুল মাফাতীহ ৫/২১৯, ৭/২২০, কাওয়াঈদুল ফিকহ; পৃষ্ঠা ২৯৭।

প্রশ্ন ৪৬৪ : জান্নাতে পুরুষরা হুর পাবে কিন্তু মেয়েরা কি পাবে?

উত্তর : জান্নাতবাসী মহিলার জন্য তার দীনদার স্বামীকেই দেওয়া হবে এবং তাকে জান্নাতের হুরদের সরদার বানিয়ে দেওয়া হবে এবং দুনিয়ার কারো সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পূর্বে যে মহিলার ইন্তেকাল হয় তাকে দুনিয়ার পুরুষদের মধ্য থেকে যেকোন একজনকে বেছে নেয়ার অধিকার দেওয়া হবে, যাকে সে পছন্দ করবে, তার সঙ্গেই সেখানে তার বিবাহ হবে। যদি সে কাউকে পছন্দ না করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা একজন পুরুষ সৃষ্টি করে উক্ত মহিলাকে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিবেন। উল্লেখ্য, জান্নাতের মধ্যে সকলের সব ধরনের মনোবাসনা পূর্ণ করা হবে সত্য, কিন্তু স্বভাবগতভাবে যেহেতু মহিলাদের একাধিক স্বামী গ্রহণের কোনো বাসনা থাকে না; বরং এটাকে তারা দোষণীয় মনে করে এবং এটাকে নষ্ট চরিত্র বলে বিশ্বাস করে। সুতরাং

তাদেরকে একাধিক স্বামী দিয়ে জান্নাতের মধ্যে আযাব দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না।– মাজমূ'আতুল ফাতাওয়া ৩/১৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৩/৪৩১, নিজামুল ফাতাওয়া ১/৭৯, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ১/২৭৬, ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ১/১১০।

প্রশ্ন ৪৬৫ : রূহের জগতে যে সকল রূহকে আল্লাহ তা'আলা একত্রিত করেছিলেন সেখানে কি অন্যান্য প্রাণীদের রূহ ছিল না কি শুধু মানুষের রূহ ছিল?

উত্তর : কুরআন, হাদীস ও তাফসীরের কিতাবসমূহের ভাষ্যমতে রূহের জগতে শুধু আদম সন্তানের রূহ একত্রিত করা হয়েছিল।– সূরা আ'রাফ; আয়াত ১৭২, মুসতাদরাকে হাকেম ২/৫৯৩, মুসনাদে আহমাদ ৪/২৬৭, জামিউ লাতাইফিত তাফসীর ১/২৪৩।

প্রশ্ন ৪৬৬ : তওবার জন্য শর্ত কি কি?

উত্তর : প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কৃত গোনাহ হতে তওবা করা ওয়াজিব। তবে তওবা কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো নিম্নরূপ,

(১) অতীতে কৃত গোনাহসমূহের ব্যাপারে লজ্জিত হতে হবে। (২) এই মুহূর্তেই গোনাহ ছেড়ে দিতে হবে, অতীতের ছুটে যাওয়া ফরয নামায, রোযা, যাকাত, ইত্যাদির কাযা আরম্ভ করতে হবে। (৩) অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাত করে থাকলে তা পরিশোধ করে দিতে হবে এবং হকদার ব্যক্তি থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। (৪) ভবিষ্যতে গোনাহ না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। (৫) নিজের নফসকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের প্রতি ধাবিত করতে হবে। – সূরা মুমিনূন; আয়াত ৫১, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১০১৫, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৯৮৯, মিরকাতুল মাফাতীহ ৫/২৩১, রিয়াযুস সালিহীন; পৃষ্ঠা ৯, তাফসীরুল বাইযাবী ৪/৪২, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ১৪/১২৫।

প্রশ্ন ৪৬৭ : হারাম সম্পদ ভক্ষণ করা তওবা কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক কি না?

উত্তর : হ্যা হারাম সম্পদ ভক্ষণ করা তওবা কবুলের পথে প্রতিবন্ধক। সুতরাং কেউ যদি হারাম আহার থেকে বিরত না থেকে অন্যান্য গোনাহ থেকে তওবা করে তবে তার তওবা কবুল হবে না। তাছাড়া তওবা হলো এক প্রকারের দু'আ। আর দু'আ কবুল হওয়ার জন্য হালাল আহার শর্ত।– সূরা মুমিনূন; আয়াত ৫১, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১০১৫, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৯৮৯, মিরকাতুল মাফাতীহ ৫/২৩১, রিয়াযুস সালিহীন; পৃষ্ঠা ৯, তাফসীরুল বাইযাবী ৪/৪২, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ১৪/১২৫।

প্রশ্ন ৪৬৮ : যদি কোনো কাগজে আল্লাহ তা'আলার নাম বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম লেখা থাকে এবং তা মাটিতে পড়ে থাকে তাহলে তা কি করতে হবে?

উত্তর : যদি কোনো কাগজে আল্লাহ তা'আলার নাম বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম লেখা থাকে এবং মাটিতে পড়ে থাকে তাহলে তা হিফাযত করবে।

হিফাযতের বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে। যেমন, পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া, মাটিতে পুঁতে রাখা এবং কাগজ হতে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মিটিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া।− রদ্দুল মুহতার ৬/৪২২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৭/১৩৩।

প্রশ্ন ৪৬৯ : বর্তমানে দেখা যায়, ছেলে-মেয়েরা হাতের নখ লম্বা রাখে। এরূপ নখ লম্বা রাখার হুকুম কি?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে হাত-পায়ের নখ কাটাকে স্বভাবজাত বলে গণ্য করা হয়েছে। আর এর জন্য সময়ও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহে এক বার নখ কাটা মুস্তাহাব। তবে চল্লিশ দিনের মধ্যেই কাটা জরুরি। চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও না কেটে রেখে দেওয়া মানবীয় স্বভাবের পরিপন্থী এবং মাকরূহ।− সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৫৮, ২৬১, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৮৫৩, ৪২০০, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৭৫৭, ২৭৫৮, সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৮৯০, সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ২৯৫, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৮০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৭, ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৪১১, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/২১০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪২০।

প্রশ্ন ৪৭০ : কোনো জীব-জন্তুর ছবি ফ্রেমে বাঁধাই করে তার পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কোনো জীব-জন্তুর ছবি আঁকা ও তৈরি করা তো হারাম এবং কবীরা গোনাহ। কিন্তু কোনো জীব-জন্তুর ছবিকে ফ্রেমে বাঁধাই করে মূল্য গ্রহণ করা উক্ত অবৈধ কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর হুকুমের মাঝে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একটা হারাম বস্তুকে সংরক্ষণ ও মজবুত করা হয়। তাই এ ধরনের পেশা গ্রহণ করা মাকরূহ। আর এর দ্বারা উপার্জিত আয়ও ঝুঁকিমুক্ত নয়।− আদদুররুল মুখতার ৯/৫৬১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/২৬৪।

প্রশ্ন ৪৭১ : যদি কোনো অমুসলিম মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে এবং পথিমধ্যে মারা যায় তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তিকে মুসলমান বলে গণ্য করা হবে না। তবে যদি সে গোপনে একাকী কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় অতঃপর ইসলাম প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোনো আলেম বা বিচারকের নিকট যাওয়ার জন্য রওয়ানা করে আর পথিমধ্যে মারা যায় তাহলে আল্লাহ নিকট তো সে মুসলমান বলে গণ্য হবে; কিন্তু তার আসল অবস্থা কারো জানা না থাকার কারণে দুনিয়াতে মুসলমানের হুকুম আহকাম তার উপর প্রয়োগ হবে না।− সূরা নাহল; আয়াত ১০৬, ফাতহুল বারী ১/৫৭, ৬০, রদ্দুল মুহতার ৪/২২১, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৬০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২/৪৯, আযীযুল ফাতাওয়া; পৃষ্ঠা ৭৫৩।

প্রশ্ন ৪৭২ : যদি কেউ উলামায়ে কেরামকে গালি দেয় যেমন কেউ কোনো আলেমকে কাঠমোল্লা বলে গালি দিল তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : কোনো আলেমকে গালি দেওয়ার দু'টি দিক হতে পারে, ১. হয়তো ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে আলেমকে গালি দিয়েছে। ২. নয়তো ইলমে দীন শিক্ষার কারণে গালি দিয়েছে। প্রথম কারণে গালি দেওয়া ফাসেকী কাজ বলে গণ্য হবে এবং গালিদাতা ফাসেক সাব্যস্ত হবে। আর দ্বিতীয় কারণে গালি দেওয়া কুফরী কাজ বলে বিবেচিত হবে।− সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৮, সহীহ মুসলিম; হাদীস ৬৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৭০, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৭/৩৩৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২/২৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৮।

প্রশ্ন ৪৭৩ : যদি কোনো মুসলমান হিন্দুদের মেলায় যায় এবং সেখানে যে সকল অনুষ্ঠানাদি হয় সেগুলো দেখে তাহলে তার হুকুম কি? এবং সেখানে যাওয়া ও অনুষ্ঠানাদি দেখাতে ঈমানের মধ্যে কোনো ত্রুটি আসবে কি না?

উত্তর : কোনো মুসলমানের জন্য বিধর্মীদের ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ও তাদের অনুষ্ঠানাদি উপভোগ করা কবীরা গোনাহ। আর তাদের মেলা ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে সানন্দে চাঁদা প্রদান করা এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা হলো কুফরী কাজ। এ ধরনের ভয়াবহ পাপাচারের ফলে যদিও সে কাফের হয়ে যায় না কিন্তু এর দ্বারা তার ঈমান দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই এসব গর্হিত কাজ থেকে প্রতিটি মুসলমানের জন্য বেঁচে থাকা আবশ্যক।

তবে যদি কেউ বিধর্মীদের ধর্ম বিশ্বাসকে সত্য মনে করে কিংবা মনেপ্রাণে ভালবেসে তাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করে তবে সে আর মুসলমান থাকবে না। সে কাফের হয়ে যাবে। তাকে তওবা করে নতুন করে কালিমা পড়ে মুসলমান হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে এহেন গর্হিত কাজ থেকে হিফাযত করুন। আমীন।− সূরা মায়েদা; আয়াত ২, ফাতহুল বারী ১৩/৪৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৭/৩৪৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৭৬, আলবাহরুর রায়েক ১/৬১২, ৫/২০৮, ২২/৩৮২, ফাতাওয়া আব্দুল হাই লাক্ষ্ণবী; পৃষ্ঠা ৩৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৯/৩৫৩, ফাতাওয়া রশীদিয়া ২/২৭৬, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ১/৪৬৪, ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া ১/৬৯।

প্রশ্ন ৪৭৪ : আমি একজন কাপড় ব্যবসয়ী। আমাদের এলাকা হিন্দু মুসলিম অধ্যুসিত। অনেক সময় হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে তারা চাঁদা নেয়ার জন্য আসে। এমতাবস্থায় সামাজিকতার দায়ে এবং ব্যবসার খাতিরে চাঁদা দিতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এভাবে পূজা উপলক্ষে চাঁদা দেওয়ার কারণে আমার কোনো গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : আপনি যদি হিন্দুদের পূজাকে একটা ভালো কাজ মনে করে চাঁদা দিয়ে থাকেন তাহলে কঠিন গোনাহগার হবেন এবং আপনার জন্য তওবা করা জরুরি। আর যদি দিতে অপারগ হয়ে যান তাহলে এক্ষেত্রে আপনার জন্য করণীয় হলো, যে ব্যক্তি আপনার নিকট পূজার চাঁদা নেয়ার জন্য আসবে উক্ত টাকা আপনি হাদিয়া দেওয়ার নিয়তে তাকে মালিক বানিয়ে দিবেন। পূজার চাঁদার নিয়তে দিবেন না। এতে আপনি পূজার সহযোগিতা করার গোনাহ থেকে বেঁচে যাবেন।− আদদুররুল মুখতার ৬/৭৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৬/৪৪৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৯/৩৬৫।

প্রশ্ন ৪৭৫ : একজন মাদরাসার ছাত্রের সমস্ত খরচ তার ভাইয়েরা বহন করে। কিছুদিন পর সে জানতে পারলো যে, তারা যে ব্যবসা থেকে তাকে টাকা দেয় তার মধ্যে কিছু টাকা হারামও রয়েছে। এখন তার জন্য এ টাকা খরচ করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : যদি উক্ত ব্যবসার অধিকাংশ টাকা হালাল হয়ে থাকে তাহলে উক্ত টাকা তার জন্য গ্রহণ করা ও খরচ করা জায়েয হবে। আর যদি অধিকাংশ টাকা হারাম হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য উক্ত টাকা গ্রহণ করা ও খরচ করা জায়েয নেই। তবে যদি তাকে এ কথা বলে দেওয়া হয় যে, তাকে হালাল টাকা থেকে দেওয়া হয়েছে তাহলে উক্ত টাকা তার জন্য গ্রহণ করা ও খরচ করাতে কোনো অসুবিধা নেই।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪২, ৩৪৩, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/৩৭৮।

প্রশ্ন ৪৭৬ : আমার এক বন্ধু মেঘমালা, গাছপালা, নদী-নালা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দৃশ্য আর্ট করে। এমনিভাবে বিভিন্ন আল্পনা ও নকশা তৈরি করে। তবে সে প্রাণীর ছবি আঁকে না। জানার বিষয় হলো, প্রাণীর ছবিমুক্ত এ ধরনের চিত্রাংকন করা বা ঘরে সাজিয়ে রাখার শরঈ বিধান কি?

উত্তর : প্রাণীর ছবিমুক্ত চিত্রাংকন করা জায়েয; চাই তা মেঘমালা, গাছপালা, নদী-নালা ও প্রাকৃতিক দৃশ্য যাই হোক না কেন। আর তা সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশে ঘরে টানিয়ে রাখাও জায়েয। তবে কোনো ধরনের প্রাণির ছবি অংকন করা এবং ঘরে টানিয়ে রাখা জায়েয নেই।– সহীহ বুখারী; হাদীস ২২২৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২১০৯, ২১১০, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/১০৫, রদ্দুল মুহতার ২/৪১৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৯, ইমদাদুল আহকাম ৪/৩৬৫।

প্রশ্ন ৪৭৭ : পুরুষ লোক কি মেহেদী ব্যবহার করতে পারবে?

উত্তর : পুরুষেরা দাড়ি ও চুলে মেহেদী ব্যবহার করতে পারবে। তাদের জন্য হাত ও পায়ে মেহেদী লাগানো মাকরূহ। তবে যদি কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তার রোগের চিকিৎসার জন্য মেহেদী লাগাতে বলে তাহলে ঔষধরূপে ব্যবহার করতে পারবে।– রদ্দুল মুহতার ৬/৪২২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৭/৫১২, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২১৩।

প্রশ্ন ৪৭৮ : আবাসিক হোটেল নির্মাণ করে ভাড়া দিয়ে অর্থোপার্জন জায়েয আছে কি না?

উত্তর : আবাসিক হোটেল নির্মাণ করে ভাড়া দিয়ে অর্থোপার্জন করা জায়েয আছে। তবে হোটেল মালিক যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, যাতে সেখানে কোনো ধরনের অনৈকিত কাজ না হয়। এরপরও যদি হোটেলে অবস্থানকারীরা কোনো ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে তাহলে হোটেল মালিকের কোনো গোনাহ হবে না এবং তার উপার্জনও অবৈধ হবে না।– আদদুররুল মুখতার ৯/২৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৪৫০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/১৫২।

প্রশ্ন ৪৭৯ : কুরআন তিলাওয়াতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম এলে তৎক্ষণাত তিলাওয়াত বন্ধ করে দুরূদ পড়া উচিত নাকি তিলাওয়াত চালিয়ে যাওয়া উচিত?

উত্তর : প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করা মাত্রই উচ্চারণকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের দায়িত্বে তৎক্ষণাত দুরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত এবং শ্রবণ করা অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম এসে গেলে তৎক্ষণাত দুরূদ পড়া ওয়াজিব নয়। বরং জায়েয। আর উত্তম হলো, অবশিষ্ট তিলাওয়াত শেষ করে দুরূদ শরীফ পড়া।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩১৫-৩১৬, রদ্দুল মুহতার ১/৫১৯, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/১৬২।

প্রশ্ন ৪৮০ : দাড়িতে খুর চালানো নবীজির কলিজায় খুর চালানোর শামিল। এ কথাটি কি হাদীস?

উত্তর : কারো কলিজায় খুর চালানো অর্থ তাকে ভীষণ কষ্ট দেওয়া। এটা একটি উপমেয় বাক্য। যদি কোনো গুরুজন তার স্নেহভাজন শিষ্যকে কোনো কাজের নির্দেশ করে আর শিষ্যটি তা পালন না করে অবাধ্যতা দেখায় তবে ব্যাপারটি গুরুর জন্য ভীষণ মনোব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বিষয়টি এতটাই স্পষ্ট যে, একে আর খুলে বলার প্রয়োজন নেই। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আদরের উম্মতকে দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন উম্মত যদি তাঁর নির্দেশ পালন করে তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হবেন। আর যদি উম্মত তাঁর নির্দেশ অমান্য করে দাড়ি না রাখে তবে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন এটাই স্বাভাবিক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মনোব্যাথাটিকেই 'দাড়িতে খুর চালানো নবীজীর কলিজায় খুর চালানোর শামিল' উপমেয় বাক্যটিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। আমাদের জানামতে হুবহু এ বাক্যে কোনো হাদীস নেই। – সহীহুল বুখারী; হাদীস ৫৮৮৫, কিতাবুল আছার ২/৮৫৭, আদদুররুল মুখতার ৩/৩৯৮, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩৫৮, আল মাউসু'আতুল ফিকহিয়্যা ৩৫/২২৫, আলমু'জামুল ওয়াসিত; পৃষ্ঠা ৮৩০, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ২৭/৪৮৮-৪৮৯।

প্রশ্ন ৪৮১ : কারো বাড়িতে যদি কেউ মেহমান হয়ে আসে আর মেজবান তাকে যথাযথ সমাদও করার পর সে এলাকায় গিয়ে মেজবানের দুর্নাম করে এবং কিছুদিন পর ঐব্যক্তি পুনরায় মেজবানের বাড়িতে মেহমান হয়ে আসে এবং মেজবান তাকে যথাযথ মেহমানদারী না করে তাহলে এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কি হবে?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে মেহমানের মেহমানদারী করা সুন্নত। এবং মাকারিমে আখলাক তথা চারিত্রিক বদান্যতার অন্তর্ভুক্ত। একজন প্রাণের শত্রু কিংবা কাফেরও যদি কারো বাড়িতে মেহমান হয়ে আসে তবুও তার যথাযথ অতিথিয়তা ও সমাদর করা ঈমানের দাবি। এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ। সে হিসেবে

মেজবানের উচিত হলো দ্বিতীয় বারও মেহমানের সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং সাধ্যমত মেহমানদারী করা।–সূরা বাকারা ১৭৭, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম ইবনে কাসীর ১/৩৬৩, ৪৪৪, সহীহ বুখারী হাদীস নং ৬১৩৫, উমদাতুল কারী ৩২/৩৩২, সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ১৮১৯, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা২৮/৩১৬, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৭/১৩২।

প্রশ্ন ৪৮২ : জনৈক মহিলা দুই মাস যাবৎ অন্তঃসত্তা ছিল। দুই মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর সে চিকিৎসার মাধ্যমে এম আর করিয়ে ফেলে। প্রশ্ন হলো, অকাল গর্ভপাত করানোর পর যে রক্ত দেখা যায় তার বিধান কি?

উত্তর : যদি গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত হয়ে যায় এবং চিকিৎসার মাধ্যমে গর্ভপাত করানো হয় তাহলে তদপরবর্তী নির্গত রক্ত নেফাস হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি কোনো কিছু প্রকাশিত না হয় বরং শুধু জমাট রক্তের রূপ লাভ করে এবং তৎপরবর্তী রক্ত অন্তত তিন দিন স্থায়ী হয় এবং পরিপূর্ণ এক তুহুর তথা বিরতি সময়ের পর এরক্ত দেখা দেয় তাহলে তা হায়জ বা ঋতুস্রাব বলে গণ্য হবে। অন্যথায় ইস্তেহায বলে বিবেচিত হবে। আর সাধারণত দুই মাসে সন্তানের গঠনাকৃতি প্রকাশিত হয় না; বরং চার মাস পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত হতে শুরু করে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত মহিলার যে রক্ত আসবে তা নিফাস বলে গণ্য হবে না।–রদ্দুল মুহতার ১/৫০০, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৫৫৮, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৮/২১৩।

প্রশ্ন ৪৮৩ : কোনো হিন্দু ব্যক্তির সাথে দেখা হলে নমস্কার বা আদাব বলে সম্ভাষণ করা যাবে কি না?

উত্তর : নমস্কার শব্দটি হিন্দুদের বিশেষ সম্ভাষণবাচক শব্দ। সুতরাং এশব্দ বলে কোনো হিন্দুকে সম্ভাষণ করা যাবে না। এবং কোনো মুসলমানের জন্য তা বৈধও নয়। তবে প্রয়োজনে আদাব বলা যেতে পারে।–রদ্দুল মুহতার ৯/৫৫৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৮/৩২৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ১০/১২৬, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ১/৫৪।

প্রশ্ন ৪৮৪ : আমি জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে গেলে সে আমাকে ভাত খাওয়ার জন্য জোরজারি করে। আমি তার বাড়িতে ভাত খাবো না। এজন্য মিথ্যা কসম করে বলি আমি ভাত খেয়ে এসেছি। এতে আমার উপর কাফফারা ওয়াজিব হয়েছে কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে মিথ্যা কসমের কারণে আপনার কবিরা গুনাহ হয়েছে। তাই তওবা করা আবশ্যক। তবে আপনার উপর শরীয়ত নির্ধারিত কাফফারা ওয়াজিব হবে না।–সূরা বাকারা ২২৫, সহীহ বুখারী হাদীস নং ৬৬৭৫, রদ্দুল মুহতার ৫/৪৭৬, বাদাইউস সানায়ি ৩/২৭, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/২৩।

প্রশ্ন ৪৮৫ : শিশুদের খাতনা করানোর বিধান কি? যদি কোনো শিশুর খাতনা না করা হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ক্ষতি আছে কি না?

উত্তর : শিশুদের খাতনা করানো সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তাছাড়া খাতনা করানো ইসলামের একটি অন্যতম শিয়ার বা নিদর্শন। কোনো শিশুকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো শরঈ ইজর

ছাড়া খাতনা না করানো হলে অবশ্যই গুনাহগার হতে হবে। তবে শরঈ উজর থাকলে ভিন্ন কথা। সুন্নত খাতনার সর্বোচ্চ বয়স হলো বার বছর। আর মুস্তাহাব সময় হলো সাত বছর। সুতরাং সাত বছর থেকে বার বছরের মধ্যেই খাতনার কাজ সম্পন্ন করবে। তবে কোনো উজরের কারণে আগে পরে হলে কোনো সমস্যা নেই। বরং শিশুদের শারীরিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে সুবিধামত সময়ে খাতনা করানোর অবকাশ রয়েছে।– সূরাতুল হজ্জ ৩২, সহীহ বুখারী হাদীস নং ৫৮৮৯, রদ্দুল মুহতার ৬/৮৫১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৭, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/২০৬, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৮/১৭৩।

প্রশ্ন ৪৮৬ : কোনো মুসলিমের জন্য হিন্দুদের সাথে মুসাফাহা করা জায়েজ আছে কি না?

উত্তর : মুসাফাহা এটা মুসলিমদেও বিশেষ একটা শুভেচ্ছা রীতি। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নতও বটে। যাতে উভয়ের জন্য মার্জনার দু'আ পাঠ করা হয়। সুতরাং একমাত্র মুসলমান ব্যতীত অন্য কারো সাথে মুসাফাহা করার অবকাশ নেই। মুসাফাহার জন্য উভয়ের মুসলমান হওয়া আবশ্যক। তবে সামাজিক রীতি মতে বিধর্মীদেও সাথে করমর্দন, হ্যান্ডশেক করা যেতে পারে। সে হিসেবে হিন্দুদেও সাথেও করমর্দন করা যেতে পারে। কারণ আভিধানিক অর্থে মুসাফাহা আর করমর্দন এক হলেও পারিভাষিক অর্থে দুটি আলাদা জিনিস।–রদ্দুল মুহতার ৯/৫৯০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৮, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২৮/২০৮।

প্রশ্ন ৪৮৭ : দাড়ি কাটা বা মুণ্ডানোর হুকুম কি?

উত্তর : দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা হওয়ার পূর্বে দাড়ি ছাটা বা মুণ্ডানো জায়েয নেই। তবে যদি একমুষ্টি থেকে লম্বা হয়ে যায় তাহেল লম্বা অংশটুকু ছেটে ফেলা জায়েয আছে। – সহীহুল বুখারী; হাদীস ৫৮৮৫, কিতাবুল আছার ২/৮৫৭, আদদুররুল মুখতার ৩/৩৯৮, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩৫৮, আল মাউসু'আতুল ফিকহিয়্যা ৩৫/২২৫, আলমু'জামুল ওয়াসিত; পৃষ্ঠা ৮৩০, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ২৭/৪৮৮-৪৮৯।

প্রশ্ন ৪৮৮ : কোন পশমকে দাড়ি বলা হয়? গালের পশম কি দাড়ি? এ পশম কাটার হুকুম কি?

উত্তর : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে দাড়ি রাখার নির্দেশ সম্বলিত যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সে সব হাদীসে لحى বা لحية শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আর আরবি ভাষায় لحى বলা হয় ঐ হাড়কে যার উপর দাঁত উঠে। আর এই হাড় বরাবর চামড়ার উপরে যে কেশ গজায় তাকে দাড়ি বা لحية বলা হয়। সুতরাং দাড়ির সীমানার বাহিরে চেহারার উপর যে কেশ গজায় তা মুণ্ডানো জায়েয আছে, তবে অনুচিৎ।– সহীহুল বুখারী; হাদীস ৫৮৮৫, কিতাবুল আছার ২/৮৫৭, আদদুররুল মুখতার ৩/৩৯৮, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩৫৮, আল মাউসু'আতুল ফিকহিয়্যা

৩৫/২২৫, আলমু'জামুল ওয়াসিত; পৃষ্ঠা ৮৩০, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ২৭/৪৮৮-৪৮৯।

প্রশ্ন ৪৮৯ : শিশুদেরকে কত বছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করাতে পারবে? এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মত কোনটি?

উত্তর : শিশুদেরকে সর্বোচ্চ দু'বছর দুধ পান করাতে পারবে। গ্রহণযোগ্য মত এটিই। সূরা বাকারা; আয়াত ২৩৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৪২, ফাতাওয়া খানিয়া ১/৪১৮, ফাতহুল কাদীর ৩/৪২৫, আদদুররুল মুখতার ৩/২১০, ফাতওয়া রহীমিয়া ৮/২৪৯।

প্রশ্ন ৪৯০ : দুগ্ধ পান করার বয়স অতিক্রম করার পরও যদি কোনো শিশু দুধ পান করে কিংবা কোনো মা পান করায় তবে কাজটি কি হারাম হবে?

উত্তর : দুগ্ধ পান করার বয়স অতিক্রম করার পর দুধ পান করানো জায়েয নেই।– সূরা বাকারা; আয়াত ২৩৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৪২, ফাতাওয়া খানিয়া ১/৪১৮, ফাতহুল কাদীর ৩/৪২৫, আদদুররুল মুখতার ৩/২১০, ফাতওয়া রহীমিয়া ৮/২৪৯।

প্রশ্ন ৪৯১ : আমাদের দেশে টাকা নিয়ে জমি বন্ধক রাখা হয় এবং যার কাছে বন্ধক রাখা হয় সে ঐ জমি থেকে ফসল ভোগ করে থাকে। তো এ পদ্ধতিতে জমি বন্ধক রাখা জায়েয আছে কি না? অনেকে এ পদ্ধতিকে বৈধ করার জন্য মাসে কিংবা বছরে কর্তন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এর কর্তন পদ্ধতির হুকুম কি?

উত্তর : বন্ধক গ্রহীতার জন্য বন্ধকী জমি হতে ফসল ভোগ করা ইসলামী শরীয়াহ মতে জায়েয নেই। উপরন্তু বন্ধক পদ্ধতিকে বৈধ করার জন্য মাসিক কিংবা বাৎসরিক কর্তনের যে ব্যবস্থা চালু আছে তাও জায়েয নেই। তবে যদি ইজারার সমস্ত শর্ত পাওয়া যায় এবং উক্ত জমির প্রকৃত ভাড়া নির্ধারণ করা হয় তাহলে জায়েয হবে। উক্ত জমি তখন আর বন্ধক থাকবে না; বরং ইজারা ব্যবস্থাভুক্ত হয়ে যাবে।– সূরা বাক্বারা; আয়াত ২৭৫, রদ্দুল মুহতার ৬/৪৮২, ৫১১, ৭/৩৯৫, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলাদ্দুর্ ৪/২৩৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪৬৫, ফাতাওয়া উসমানী ৩/৪২২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/২২৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/১৬৯, ৩৮৬, কিফায়াতুল মুফতী ৮/১৪৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৪৯৫, ইমদাদুল আহকাম ৩/৫১৩।

প্রশ্ন ৪৯২ : জনৈক ব্যক্তি এক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এক লক্ষ টাকা মূল্যের একটি জমি বন্ধক রেখে দুই লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিল। এখন সে জমিটি বিক্রি করতে চাচ্ছে এবং তার পরিবর্তে এক লক্ষ টাকার স্বর্ণালংকার বন্ধক রাখতে চাচ্ছে। তার জন্য শরীয়তে এ সুযোগ আছে কি না?

উত্তর : বন্ধক রাখা জিনিসকে বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি ছাড়া মালিক বিক্রি করতে পারবে না। বিক্রি করলেও তা কার্যকর হবে না। বন্ধক গ্রহীতা তথা ঋণদাতা অনুমতি দিলেই কেবল তা কার্যকর হবে। অতএব বর্ণিত ক্ষেত্রে ঋণদাতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিয়ে বন্ধক রাখা জমি বিক্রি করা জায়েয হবে। ঋণদাতা জমির পরিবর্তে স্বর্ণালংকার গ্রহণ করে নিলেও তাতে কোনো সমস্যা নেই।– রদ্দুল মুহতার ১০/১২৫,

বাদায়িউস সানায়ে' ৫/২১১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪৬২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/২৩০।

প্রশ্ন ৪৯৩ : মহিলাদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মহিলাদের জন্য ঘরোয়া পরিবেশে সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয আছে। সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে বের হওয়া জায়েয নেই।– মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ১৯৭২৬, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ২১৭৬, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ১২/১৭৪, ১৮৪।

প্রশ্ন ৪৯৪ : অবৈধ উপায়ে উপার্জিত টাকা-পয়সা মসজিদ মাদরাসায়া দান করা যাবে কি না?

উত্তর : অবৈধ উপায়ে উপার্জিত টাকা-পয়সা মসজিদ মাদরাসায় দান করা জায়েয নেই। প্রকৃত মালিককে এ টাকা পৌঁছিয়ে দিতে হবে। মালিককে না পাওয়া গেলে তার ওয়ারিসদের হাতে পৌঁছাতে হবে। মালিক বা ওয়ারিস কারো হাতে যদি পৌঁছানো সম্ভব না হয় তাহলে এদের পক্ষ থেকে গরিব-মিসকীনদেরকে সদকা করে দেবে। এরা মাদরাসার গরিব তালিবে ইলমও হতে পারে। কিন্তু সরাসরি মসজিদ বা মাদরাসার কোনো ফান্ডে এ টাকা খরচ করা যাবে না।– সূরা বাকারা; আয়াত ২৬৭, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১০১৫, রদ্দুল মুহতার ২/৪৩১, ৭/৩০১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/১০০।

প্রশ্ন ৪৯৫ : হাঁচির জবাব প্রদান করা কি ওয়াজিব? এ জবাব নিম্নস্বরে দিলেও কি যথেষ্ট হবে না শুনিয়ে দিতে হবে?

উত্তর : কোনো মুসলমান হাঁচি দিয়ে الحمد لله বললে তার জবাবে শ্রোতার উপর يرحمك الله বলা ওয়াজিব। এটা এক মুসমানের উপর অন্য মুসলমানের হক এবং অধিকার। আর হাঁচির জবাব শুনিয়ে দেওয়া কর্তব্য। নীরবে দিলে এ অধিকার আদায় হবে না।– সহীহ বুখারী; হাদীস ১২৪০, ৫৯৮৩, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৩০, ৫০৩৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৮/৮৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৩৪, ফাতাওয়া খানিয়া ৪/৪২৪, আলবাহরুর রায়েক ৯/৩৮১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩২৬, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৯৩, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩/১৮১, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪৫৬।

প্রশ্ন ৪৯৬ : সেন্ট বা পারফিউম পাক না নাপাক? এগুলো কাপড়ে ব্যবহার করে নামায আদায় করা যাবে কি না?

উত্তর : যে সকল সেন্ট বা পারফিউম আঙ্গুর অথবা খেজুর থেকে তৈরী এ্যালকোহলের সংমিশ্রণ রয়েছে তা নাপাক। এগুলোর ব্যবহার জায়েয নেই। তবে আমাদের জানা মতে বর্তমানে অধিকাংশ সেন্ট বা পারফিউমে ব্যবহৃত এ্যালকোহল আঙ্গুর বা খেজুর থেকে তৈরী নয়। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এসব জিনিস নাপাক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা বা প্রবল ধারণা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ব্যবহার করা জায়েয হবে এবং এগুলো ব্যবহার করে নামাযও আদায় করা যাবে। তবে এসব সন্দেহপূর্ণ সুগন্ধি ব্যবহার না

করাই উত্তম।– রদ্দুল মুহতার ১/২৮৩, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/২৬৯, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৩/৬০৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৮/৬১।

প্রশ্ন ৪৯৭ : ইসলামে দত্তক নেয়ার বিধান কি?

উত্তর : ইসলামে দত্তক নেয়া সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয। এর দ্বারা দত্তক গ্রহণকারী দত্তক নেয়া শিশুর পিতা-মাতা হিসেবে গণ্য হবে না। এবং ঐ শিশু তাদের ওয়ারিস হবে না। তবে কোনো ব্যক্তি যদি এতিম-অসহায় বা নিঃস্ব শিশুদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাহলে এটা অনেক বড়ো সওয়াবের কাজ হবে।– সূরা আহযাব; আয়াত ৫, ৬, সহীহ বুখারী; হাদীস ৪৭৮২, ৬০০৫, আলমাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ১০/১২১, আলহালাল ওয়াল হারাম; পৃষ্ঠা ১৯৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/৫৩৬।

প্রশ্ন ৪৯৮ : বর্তমানে দেখা যায়, মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানগণ বিভিন্ন দেশ সফরের সময় বিধর্মীদের সাথে মুসাফাহা করে থাকে। প্রশ্ন হলো, ইসলামী শরীয়তে বিধর্মীদের সাথে মুসাফাহা করার কোনো অবকাশ আছে কি?

উত্তর : বিধর্মীদের সম্মানার্থে তাদের সাথে মুসাফাহা করা ঈমানের মর্যাদার বিপরীত। তবে যদি রাষ্ট্রের স্বার্থে অথবা ইসলামের দিকে আকর্ষণের উদ্দেশে হাত মিলায় তাহলে এতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে হাত মিলানোর সময় 'আস্সালামু আলাইকুম' বলবে না।– সূরা মায়েদা; আয়াত ৫১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৩৪, আদদুররুল মুখতার ৬/৪১২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪৮, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ২/৪৫৩।

প্রশ্ন ৪৯৯ : মরদেহের উপর ফুল দেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মরদেহের উপর ফুল ছিটানো বা ফুল দেয়া ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয নেই। তবে মৃতব্যক্তির দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয আছে; বরং উত্তম।– সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৯৯১, সুনানে নাসাঈ; হাদীস ১৯০৫, সারাখসী কৃত আলমাবসূত ১/২৮৭, ২/৫৫, রদ্দুল মুহতার ৩/৮৯, হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৫৭০, আলবাহরুর রায়েক ২/১৭৭, ফয়যুল বারী ১/৪৫৮, ইমদাদুল আহকাম ২/৪৩০, ফাতাওয়া রশীদিয়া ১/৩৯৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১২৩।

প্রশ্ন ৫০০ : কাঁচা মাছ খাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের বিধান কি?

উত্তর : হালাল বস্তু যেভাবেই আহার করা হোক, তা যদি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয় তাহলে তা আহার করা জায়েয আছে। তাই কেউ যদি কাঁচা মাছ খেতে সক্ষম হয় এবং সেটা তার স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর না হয়, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।– ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৪০, খানে পীনে কী হালাল আওর হালাল চীযেঁ; পৃষ্ঠা ৩৬, ফাতাওয়া রাহমানিয়া ২/৪২৪।